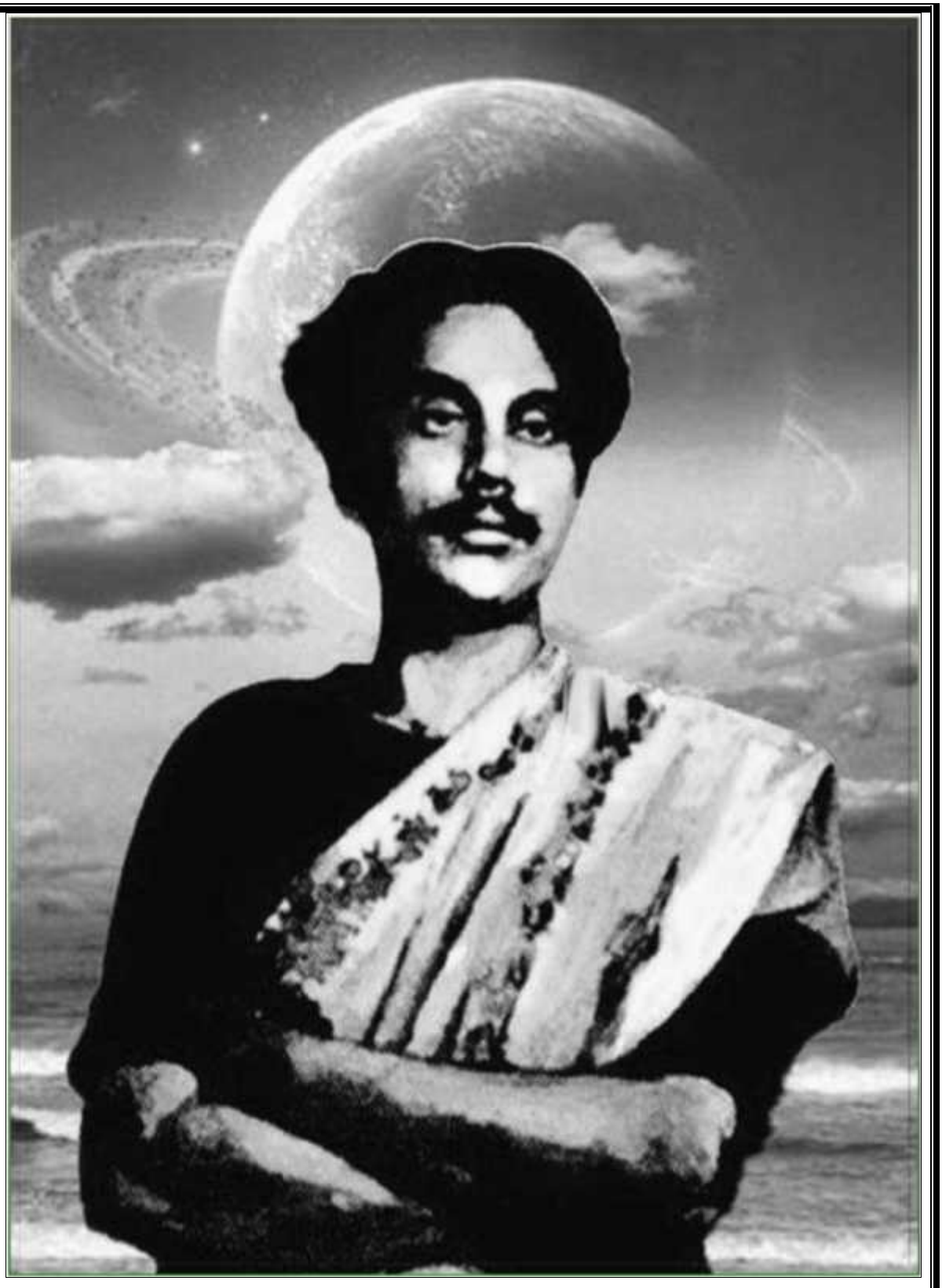

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

জন্ম : ২৫ মে ১৮৯৯/১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬, মৃত্যু : ২৯ আগস্ট ১৯৭৬/১২ ভাদ্র ১৩৮৩

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের গানে
স্বদেশপ্রেম, উদ্দীপনা ও সাম্যবাদের প্রভাব

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের গানে স্বদেশপ্রেম, উদ্দীপনা ও সাম্যবাদের প্রভাব

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মহসিনা আক্তার খানম(লীনা তাপসী)
সহকারী অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম. ফিল. গবেষক
ছন্দা চক্রবর্ত্তী
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩০
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গিকার করছি যে, ‘কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানে স্বদেশপ্রেম, উদ্দীপনা ও সাম্যবাদের প্রভাব’ শীর্ষক বিষয়ের উপর অভিসন্দর্ভ-পত্র প্রণয়নে আমার জানামতে পূর্বে কোন গবেষক কোন গবেষণা-কর্ম সম্পাদন করেন নাই। দেশের বা আন্তর্জাতিক কোন পত্র-পত্রিকা বা জার্নালে আমি আমার এই গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভের কোন অংশ বা কিয়দংশও প্রকাশ করি নাই। আমার এই অভিসন্দর্ভ-পত্র একটি সম্পূর্ণ মৌলিক বিষযের উপর প্রণয়ন করা হয়েছে।

[ড. মহসিনা আক্তার খানম](লীনা তাপসী)
সহকারী অধ্যাপক
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[ছন্দা চক্রবর্ত্তী]
এম. ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ৩০
শিক্ষাবর্ষ : ২০০৮-২০০৯
নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলাভাষায় অনেক কবিই একাধারে সুরস্রষ্টা ও সঙ্গীতজ্ঞ, বলা যায় গীতিকবি। এ হয়ত আবহমান বাংলার মাটি, মানুষ ও আবহাওয়ার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ রামপ্রসাদ সেন, নিধুবাবু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেন ও নজরুল ইসলামের মতো গীতিকবিদের নাম করা যেতে পারে। এঁরা একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকার।

ঊনবিংশ শতকে বাংলাদেশের গান সর্বজনীনভাবে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত ও মার্গসঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কাব্য সম্বলিত লঘুসঙ্গীত যদিও এ সময় অনুপস্থিত ছিলা না, তবু যেন ততখানি আভিজাত্য লাভ করতে পারেনি। তাই একদিকে কথায় কাব্যভিত্তিক লঘুসঙ্গীতের ধারা এবং অপরদিকে দেশী ও বিদেশী সুরের উদার অভ্যর্থনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাগানের ক্ষেত্রে এক ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যমণ্ডিত দিগন্তকে মেলে ধরেন। কাজী নজরুল ইসলাম এসে বাংলাগানের সেই ধারাকে আরও নতুনত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে আলোকিত ক'রে অনেক দূরে ও বিচিত্র পথে টেনে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে নজরুল এলেন বিদ্রোহীর বেশ ধ'রে কিন্তু বাংলাগানের ক্ষেত্রে তিনি যেন মধ্যপ্রাচ্যের সুর-সুধা ও সাকী, খেঁজুরগাছ, প্রখর রৌদ্রতাপ আর ওয়েসিসের শ্যামলীয়া নিয়ে হাজির হন। বাঙ্গালীর কাছে এর স্বাদ নতুন আর সুর নতুনতর।

কাব্যজগতে নজরুলের আবির্ভাবের মত সঙ্গীত জগতেও নজরুলের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঐতিহাসিক ঘটনা। শিল্পকলা চিরকালই সৃষ্টিশীল। ভারতীয় সঙ্গীত কলাও তাই সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে বিচিত্ররূপে বিভিন্ন ধারায় বিকাশলাভ করেছে। ভারতীয় সঙ্গীতে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রতিভাধর শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। সেই ধারাবাহিকতারই এক অগ্রনায়ক কাজী নজরুল ইসলাম অনন্য ও অসাধারণ।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নজরুল ছিলেন এক যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী। তার অসামান্য সঙ্গীত প্রতিভার কিয়দংশের বর্ণনা করা যেমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ, তেমনি দুরূহ বিষয়।

বাংলাগানকে জনশোচিত করণের রূপকার হিসাবে দেখতে গেলে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম স্থান দিতে হয়। কিন্তু তাঁর অনেকগানই প্রথমে কবিতা হিসাবে রচিত হয়। পরে সেগুলো অন্যের দ্বারা বা তার নিজের দ্বারাই সুরে গাঁথা হয়, রবীন্দ্রনাথের সেইসব গান বাণীপ্রধান অর্থ্যাৎ সুরের চেয়ে ভাবের আকর্ষণই তাতে বেশী প্রবল।

নজরুলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রথমে তাঁর মনে সুর খেলতো তারপর সুরানুগত বিষয় এবং বাণীর আবির্ভাব হ'ত। এ ক্রিয়াটি এত শীঘ্র ঘটত যে, তাকে আবির্ভাব না ব'লে উপায় নেই। নজরুল বরাবর বাণীর চেয়ে সুরের প্রাধান্য বেশী দিয়েছেন। তিনি তাঁর সঙ্গীত ভান্ডারকে নানারকম বিশ্লেষণধর্মী সুর-বৈচিত্র্যে ভরপুর ক'রে রেখেছেন। নজরুল তাঁর সঙ্গীত ভান্ডারকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখেননি। তিনি বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং এইসব সঙ্গীতের সুরের মধ্যে কীর্ত্তনীয় ঢঙ, লোকগীতির ঢঙ, বিদেশী সুরের খেলা– এ রকম আরো অনেক রসদের খোঁজ পাওয়া যায়। তাই নজরুলের গানে গজলের আবহ থেকে আরম্ভ ক'রে ইসলামিক, শ্যামাসঙ্গীত, রাগপ্রধান, হাসিরগান, দেশ উদ্দীপক সঙ্গীত, কৃষানকৃষানীর গান, মানবতার গান, সব মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। নজরুল শুধু বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য গান বা কবিতা লিখেননি, তিনি সকল শ্রেণীর মানুয়ের জন্য তাঁর সঙ্গীতভান্ডার ও কবিতা ভান্ডার উম্মুক্ত ক'রে রেখেছেন। এ বিষয়টি বোধহয় তাঁর স্বাভাবিক সুর সঙ্গীত বোধ। নজরুলের জাতীয় সঙ্গীতগুলো এত বিখ্যাত যে, সে সম্মন্ধে কিছু না বললেও চলে। এর ভিতর দিয়ে দৃঢ় সংকল্প আর জাগরনীর বাণী ধ্বনিত হয়েছে। সুরের ভিতর দিয়ে যুদ্ধের পদক্ষেপ আর কাড়া, না কাড়ার ধ্বনি শোনা যায়।

বাঙালি মণীষার সার্বিক চেতনায় এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির মননশীল ভাবনায় আমাদের জাতীয় কবি, আমাদের জাতীয় চেতনার কবি, বিশ্ব মানবতা ও সাম্যের কবি, বিশ্ব শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কবি কাজী নজরুল ইসলামের অবদান বহুগুণে সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত। নজরুলের সৃষ্টির বিভিন্ন দিক আলোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের জীবনের প্রত্যেক সংকটময় মূহুর্তে তিনি আবির্ভুত হয়েছেন ধূমকেতু আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্বরূপে। নজরুলের বিদ্রোহ ছিল সর্বজনীন ও সর্বাত্মক অন্তঃকরণে।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সঙ্গীত বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা হলেও তাঁর দেশাত্ববোধক গান, স্বদেশী চেতনামূলক গান, স্বদেশপ্রেমভিত্তিক গান, জাগরণী ও উদ্দীপনা মূলক গান, ইসলামী জাগরণীমূলক গান প্রভৃতি বিষয়ের উপর তেমন গবেষণা বা আলোচনা হয়নি। অথচ এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট রসদ থাকা সত্বেও আমাদের সঙ্গীতে যথাযথভাবে নজরুলের স্বাধীনতার গান, উদ্দীপনার গান ও সাম্যের গানগুলি সেভাবে সকলের সামনে প্রতিভাত হয়নি। হয়ত অনেকেই নজরুলের সাম্যবাদ, স্বদেশপ্রীতি, উদ্দীপনা ও মানবপ্রেমের কথা বলেছেন এবং সেসব বিষয়ের উপর গবেষণাও করেছেন। কিন্তু নজরুলের গানের মধ্যে এর যে কত ব্যাপকতা– তা গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণ ব্যতীত পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। এ কারণেই নজরুলের দেশাত্ববোধক গান, স্বদেশী চেতনামূলক গান, স্বদেশপ্রেমভিত্তিক গান, জাগরণী ও উদ্দীপনা মূলক গান, ইসলামী জাগরণীমূলক প্রভৃতি বিষয়ভিত্তিক গানগুলির কাব্যিকসহ সাঙ্গীতিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রসুত গবেষণা কার্য পরিচালনা, রূপায়ণ ও প্রকাশ করলে তা নজরুল-গবেষণার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন হিসাবে গণ্য হবে বিধায় বিষয়টিকে আমি সানন্দে গ্রহণ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশপ্রীতি, উদ্দীপনা ও সাম্যের গানগুলো আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এ বিষয়ে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত পরিসরে গবেষণা হয়েছে। আমি আমার এই গবেষণার মাধ্যমে নজরুলের এই উল্লেখিত বিষয়ে বা অঙ্গনে কিছুটা প্রবেশ করতে চেয়েছি মাত্র।

এই গবেষণা-পত্রে ছয়টি অধ্যায়ে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী, স্বদেশী আন্দোলনে কবির অংশগ্রহণ এবং সেই সময় কবির অসাধারণ কিছু সৃষ্টি আর কবির কারাগারের সেই দিনগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। কবির গানে দেশপ্রেম, উদ্দীপনা, সাম্যবাদ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিভিন্ন দিক আলোচিত হবে। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কবির সোচ্চার কণ্ঠ, নারীর অধিকারের পক্ষে কবির পৌরুষবোধের বিভিন্ন দিক, সমাজের ধনী-গরীবের বিভেদ নিয়ে যে ক্ষোভ-এর বিপরীতে কবির সোচ্চার কণ্ঠ প্রভৃতি বিষয়ের উপর এ গবেষণা-পত্রে আলোচনা করা হয়েছে।

যে কোন গবেষণা কার্যে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা, ব্যক্তিক সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থের সহযোগিতা ছাড়া কখনও পরিপূর্ণরূপে বা আদর্শিক মানে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমার এ গবেষণা কার্যেও তার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

নজরুলকেন্দ্রিক একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান নজরুল ইন্সটিটিউট লাইব্রেরী, দেশের ঐতিহ্যবাহী বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী ও নজরুলকেন্দ্রিক একমাত্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নজরুল একাডেমী লাইব্রেরীর সহযোগিতা গ্রহণ আমি এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। এই প্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতা ব্যতীত, আমার ধারণা, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক কোন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা বা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

ব্যক্তিক সহযোগিতা হিসাবে বিশিষ্ট নজরুল-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ, শিল্পী ও প্রশিক্ষক এবং স্বরলিপিকার আমার সঙ্গীতগুরু শ্রী সুধীন দাশ উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণা কাজে শক্তি, সাহস ও ইন্ধন জুগিয়েছেন। এছাড়া এ দেশের প্রথিতযশা নজরুল সঙ্গীতশিল্পী জনাব খালিদ হোসেন ও জনাব ফেরদৌস আরা এবং কবি-নাত্নী খিলখিল কাজীর নিকট আমি যথেষ্ট ঋণী। বিশেষ ক'রে এ গবেষণা-পত্রে সংযোজিত উপরোক্ত তিনজনের মূল্যবান সাক্ষাৎকার আমাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণীত করেছে। আমি এঁদেরকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

বিশিষ্ট নজরুল গবেষক, নজরুল সঙ্গীতশিল্পী ও প্রশিক্ষক এবং স্বরলিপিকার ও গ্রন্থকার জনাব ইদ্‌রিস আলী বিশেষ সহযোগিতা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও গবেষণালব্ধ পরামর্শ না পেলে আমার এ গবেষণা কার্য হয়ত সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রখ্যাত নজরুল গবেষক ও নজরুল জীবনীকার প্রফেসর এমিরিটাস ড. রফিকুল ইসলাম এই গবেষণা কাজে আমাকে মাঝে মাঝে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

দেশের বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীতশিল্পী, গবেষক, প্রশিক্ষক ও গ্রন্থকার এবং আমার এ গবেষণা কার্যক্রমের মূল পরিচালনা শক্তি তথা এ গবেষণায় আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের সঙ্গীত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মহসিনা আক্তার খানম-এর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার কোন অন্ত নেই। বিশেষ ক'রে এ গবেষণা-পত্রের সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সার্বিক সহযোগিতায় তাঁর আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। একটি মানসম্পন্ন গবেষণালব্ধ অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে সঠিক প্রক্রিয়াসিদ্ধ গবেষণা-কার্যক্রম পরিচালনায় তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন সময়ে তাঁর মূল্যবান দিক-নির্দেশনা আমার স্পৃহাকে অনেকখানি আশান্বিত ও কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ইরশাদ আহমেদ শাহীন প্রয়োজনে মূল্যবান মতামত ও বইপত্র দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁর প্রতি রইলো কৃতজ্ঞতা। সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার বাবা ময়মনসিংহ সরকারী আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সহযোগী অধ্যাপক(অবঃ) মৃণালকান্তি চক্রবর্ত্তী ও স্নেহময়ী মা জয়ন্তী চক্রবর্ত্তীকে– যাঁদের সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমার এ গবেষণা কার্যক্রমকে বহুলাংশে ত্বরান্বিত করেছে। সবশেষে আমার এ গবেষণার সকল পাণ্ডলিপি কম্পিউটার কম্পোজ, প্রুফ সংশোধন ও ছাপানোর বিষয়ে সার্বিকভাবে যিনি সহযোগিতা করেছেন তিনি আমার স্বামী প্রভাস চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ছন্দা চক্রবর্ত্তী

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

বাংলাগানে কাজী নজরুল ইসলামের অভ্যুদয় ১

বাংলাগানের সূচনা ২

কাজী নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৪

জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি ৪

কিশোর নজরুল ৫

শৈশবে নজরুলের শিক্ষাজীবন ৬

লেটোদলে নজরুল ৯

নজরুলের সৈনিক জীবন ১২

নজরুলের সাহিত্য জীবন ১৪

নজরুলের সঙ্গীতশিক্ষা জীবন ২০

নজরুলের কারাগার জীবন ২১

যুদ্ধফেরত নজরুল ২৯

সাংবাদিক নজরুল ২৯

সংবর্ধনা ও পুরস্কার ৩৪

নজরুলের অসুস্থতা ও চিকিৎসা ৩৫

নজরুলের মৃত্যু ৩৬

সংক্ষেপে নজরুল-জীবনপঞ্জি ৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুলের গানে দেশপ্রেম ও উদ্দীপনা ৪৬

দেশপ্রেমমূলক গান ৪৯

উদ্দীপনামূলক গান ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুলের রাজনৈতিক চেতনার পটভূমি ও উন্মেষ ৬৮

নজরুলের চেতনায় সাম্যবাদ ও মানবতাবাদ ৭৫

নজরুলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবোধ ৭৭

নজরুলের চেতনায় সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ৮২

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান ৮৪

চতুর্থ অধ্যায়

নারী অধিকারে নজরুলের সচেতনতা ৮৯

নারী জাগরণমূলক গান ৯১

পঞ্চম অধ্যায়

তরুণ যুবা-ছাত্রদলের গান[বর্ণনা] ৯৫

ইসলামী জাগরণমূলক গান[বর্ণনা] ৯৬

নিঃসর্গ বন্দনামূলক গান[বর্ণনা] ৯৭

ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সমৃদ্ধ দেশাত্ববোধক গান ৯৯

কোরাস্ ও মার্চের গানে দেশাত্ববোধ ১০১

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জাতীয় উন্নতি মূলক গান ১০৩

বিদ্রোহী চেতনামূলক গান ১০৪

তরুণ যুবা ছাত্রদলের গান ১০৬

ইসলামী জাগরণমূলক গান ১০৭

নিঃসর্গ বন্দনামূলক গান ১০৯

ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সমৃদ্ধ দেশাত্ববোধক গান ১১০

কোরাস্ ও মার্চ সঙ্গীত ১১১

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জাতীয় উন্নতিমূলক গান ১১২

বিদ্রোহী চেতনামূলক গান ১১৩

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নজরুলের স্বদেশ চেতনামূলক গানের তালিকা ১১৭

উপসংহার ১২৭

শিল্পী, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাতকার ১৩১

পরিশিষ্ট

বাণী বিশ্লেষণকৃত নজরুল-সঙ্গীতের তালিকা ১৪১

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাংলাগানে কাজী নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়

বাংলাগানে কাজী নজরুল ইসলামের অভ্যুদয় বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে নজরুলের জীবনীর বিষদ আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে বাংলাগানের জগতে নজরুলের অনুপ্রবেশ বা আবির্ভাব সম্পর্কে পূর্বাহ্নে একটু আলোকপাত করা দরকার। এই ক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয়, নজরুলের আবির্ভাব যে সময়টা ঘটেছিল সে-সময় বাংলাগানের অবস্থা কিরূপ ছিল। পারিপ্বার্শিক অবস্থা কিরূপ ছিল, সামাজিক, রাজনৈতিক সর্বোপরি দেশের তথা অখন্ড পাক-ভারত উপমহাদেশের অবস্থাই বা কেমন ছিল– সবই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

বাংলাগানের সূচনা

'বাংলাগানের সূচনা ঘটেছিল প্রবন্ধসঙ্গীতের আদর্শে। চর্যাগীতিই বাংলাসাহিত্য তথা বাংলাগানের আদি নির্দশন। চর্যা একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধসঙ্গীত। নেপালে আবিস্কৃত ও সাঙ্কেতিক ভাষায় রচিত এই আদি বাংলাগান চর্যায় সর্বভারতীয় প্রবন্ধ সাংগীতিক আদর্শ রূপায়িত হয়েছিল, তেমনিভাবে জয়দেবের গীত গোবিন্দও পদসঙ্গীত-প্রবন্ধগীতির আদর্শে রচিত। জয়দেব নিজেই তার রচনাকে প্রথমে প্রবন্ধ সঙ্গীতরূপে উল্লেখ করেছেন। চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ঝোমড়া শ্রেণীর প্রবন্ধসঙ্গীতের আদর্শে রচিত'।[১] তবে এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মাঝে নানা ধরনের প্রবন্ধের সমাবেশ দেখা যায়। আর এর মধ্যে কিছু সর্বভারতীয় বাংলার আঞ্চলিক প্রবন্ধও রয়েছে।

বৈষ্ণব পদাবলীতে বাংলার আঞ্চলিক লৌকিক সঙ্গীতের, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ব্যাপক মিশ্রণের ফলে সেখানে এক নতুন ধরনের সঙ্গীত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়েছিল। মূল বিষয় ছিল হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক সংগীত রীতির মিশ্রণ। এর ফলে সেদিন কাব্যে সুর খুঁজতে লাগলো যাহা হৃদয়ের ভাবাবেগগুলোকে প্রকাশ করে, রাগ-রাগিণীর সাধারণ রূপগুলোকে নয়।

'এভাবে সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস কণ্ঠে মেলাবার একটা প্রশস্ত জায়গা হলো। এভাবে কীর্ত্তনের উদ্ভব হলো। পদাবলী কীর্ত্তনের গায়ন কলায় যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে হিন্দুস্থানে উদ্ভাবিত ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরির সম্পর্ক রয়েছে। কবি রঞ্জন প্রসাদ সেন কর্তৃক শাক্ত পদাবলী যখন প্রবর্তিত হয়, তখনই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধারায় ধ্রুপদের পর খেয়ালের উদ্ভব ঘটে। রামপ্রসাদের সমসাময়িক কবি ভারতচন্দ্র রায়[১৭১২-১৭৬০] রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সঙ্গীত সভার উচ্চ রাগ সাঙ্গীতিক আবহ তাকে বিশেষভাবে উপকৃত

করেছিল। বাংলাগানের ধারায় রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভারত চন্দ্রের পরে যে নামটি উচ্চারিত হয় সেটি রামনিধিগুপ্ত। সংক্ষেপে বহুল পরিচিত নিধুবাবু। এই নিধুবাবুই হচ্ছেন টপ্পার জনক। এর সাথে কালী মির্জার নামটিও চ'লে আসে। এঁরা দুজনই ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় সঙ্গীত কেন্দ্রে টপ্পায় প্রগাঢ় শিক্ষা লাভ করে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। টপ্পা প্রচলনের সম সাময়িককালেই বাংলায় ধ্রুপদ ও খেয়াল শ্রেণীর গীত রচনার সূত্রপাত ঘটে। দেওয়ান রঘুনাথ রায় প্রচলন করেন বাংলা খেয়াল।

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলে কৃষ্ণনগর থেকে বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী [১৮০৪-১৯০০] এসে সমাজে সঙ্গীতাচার্য্যরূপে যোগ দেন। এই বিষ্ণু চক্রবর্ত্তীই প্রথম বাঙ্গালী ধ্রুপদীয়া যিনি বাংলা সংগীতে একটি বিশিষ্টধারা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া তিনি কালী মির্জার শিষ্য হওয়াতে টপ্পাঙ্গ সঙ্গীতের উপরও তার পরিচয় ছিল। পরবর্তীতে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সঙ্গীতের ধারাতেও কিছুটা পরিবর্তন আসে। তবে রামমোহন প্রবর্তিত সঙ্গীত ঐতিহ্য থেকে সমাজ কখনো বিচ্যুৎ হয়নি।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে কেশবচন্দ্র সেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলে সেখানে ধ্রুপদীয় সংগীতের পরিবর্তে বৈষ্ণবীয় কীর্ত্তন সংগীতের প্রচলন ঘটে। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজে বিষ্ণুর ধ্রুপদীয় সঙগীতাদর্শ অব্যাহতভাবে অনুসৃত হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর পৃষ্টপোষকতায় এই সংগীতধারাই পরিপুষ্ট লাভ করে এবং পরবর্তীতে তাই রবীন্দ্রনাথের অত্যুজ্জ্বল আবির্ভাবের ফলে ধ্রুপদীয় সংগীতাদর্শ সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিক থেকে মুঘল সাম্রাজ্যে দুর্দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে। দিল্লী অঞ্চলের কলাবতজন তখন ভারতের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। অনেকেই তখন বাংলায় আসেন। কলকাতা সেইসময় বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংগীত সংস্কৃতি কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে'।[২]

সেই সময় লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত হয়ে নবাব ওয়াজেদ আলী কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে মেটিয়াবুরুজে আগমন করেন। ওয়াজিদ আলী শাহ ছিলেন সঙ্গীত কলার উদার পৃষ্টপোষক। লক্ষ্ণৌ কত্থক নৃত্যঘরানার ও লক্ষ্ণৌ ঠুমরীর প্রচলনকারীরূপে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক রাগ সংগীতের যে যে তরঙ্গই বাংলা কাব্য সংগীতে এসে পৌঁছেছে তা শীঘ্রই বালার নিজস্ব সংগীত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আত্মীকৃত হয়ে গেছে।

নিধুবাবু ও কালী মির্জা দ্বারা শোরীর আদর্শে বাংলা টপ্পা প্রবর্তনের ভিতর দিয়েই আধুনিক হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের কেন্দ্রীয় রূপের সঙ্গে বাংলাগানের গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তবে নিধূবাবুর টপ্পা ও রাম শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের ধ্রুপদ ও রঘূনাথ রায়ের খেয়াল প্রবর্তনের ভেতর দিয়ে বাংলার হিন্দুস্থানী সংগীত প্রবাহের ধারা হিন্দুস্থানের নানা অঞ্চলে পল্লবিত বহু ঘরানার মিলনক্ষেতে পরিণত হয়।

বাংলার চার বিখ্যাত কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত রায় ও অতুলপ্রসাদ সেন, এঁরা সকলেই হিন্দুস্থানী গানের পথ ধরেই বাংলা কাব্য সংগীতের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। আবার লক্ষ্ণৌ প্রবাসী অতুলপ্রসাদ মজেছিলেন ঠুম্‌রীর কোমল মিহি জালে।

রবীন্দ্রনাথ-কাব্য সঙ্গীতের একটি উচ্চ আদর্শকে তার গানে রূপায়িত করলেও বাঙ্গালীর সাঙ্গীতিক আকাঙ্খাকে সামগ্রিকভাবে রূপায়িত করেননি। রবীন্দ্রনাথের গানে অতি নির্দিষ্ট ও অমোঘরূপের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁর গানে শিল্পীর রূপায়নগত স্বাধীনতা অর্থ্যাৎ সৃজনশীলতা অল্পবিস্তর নিজের মত করে প্রকাশ করবার কোন সুযোগ নেই। এর প্রকাশ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ-দিলীপকুমার আলাপ-আলোচনায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যের গভীরে সুরকে টানছিলেন হিন্দুস্থানী সংগীত তখন সুরের গভীরে মন টেনে নিচ্ছিল। তবে অল্পবিস্তর ব্যবধান আছে ডি..এল. রায়, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গানে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে বাংলাগানের জগতে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। সাধারণতঃ দু'টি ধারা কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত রচনার প্রেক্ষাপট হিসাবে ধরা যায়। এক. বাণীপ্রধান বাংলা আধুনিক সংগীতধারা এবং দুই. বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতচর্চা ও হিন্দুস্থানী প্রভাবিত বাংলাগানের ধারা।

গীতিকার নজরুলের জীবন হচ্ছে যেন একটা বহু রাগিণী বিশিষ্ট যন্ত্র বিশেষ। তিনি বাংলাগানে বিভিন্ন শ্রেণীর গান যেমন– কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী, জারি-সারী, মুর্শিদী, বাউল, রামপ্রসাদী, ঠুম্‌রী, গজল, ধ্রুপদ, হোরী প্রভৃতি রচনা করেছেন; তেমনিভাবে সেসব শ্রেণীর গানের সুরায়নে বিভিন্ন রাগিনীর সংযোগ ঘটিয়েছেন নিপুণ ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির আদলে। আর কালোয়াতি গানের ব্যাকরণবদ্ধ অলংকারিক আতিশয্য ত্যাগ ক'রে বাংলাগানের বাণীরূপের সংগে সর্বভারতীয় সুরের পরিনয় সাধন করেছেন নজরুল।

নজরুলের সংগীত রচনাকালকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। পর্বগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :–

প্রথমতঃ ১৯২০ সালের মার্চের পর থেকে ১৯২৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার স্বরূপ উদ্দীপনাময় দেশাত্মবোধক গান রচনাকাল।

দ্বিতীয়তঃ ১৯২৬ সালের নভেম্বরের পর থেকে ১৯২৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত পারস্য গজলের অনুপ্রেরণায় বাংলাগজল রচনাকাল।

তৃতীয়তঃ ১৯২৮ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত গ্রামোফোন কোম্পানী, মঞ্চ ও চলচ্চিত্র কেন্দ্রিক বিভিন্ন আঙ্গিকের গান রচনাকাল।

চতুর্থতঃ ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বেতার কেন্দ্রিক গান ও রাগসংগীত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক বিবিধগান রচনাকাল হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

এ উপমহাদেশের বাংলাসঙ্গীতে তিনি একটি নতুন ও স্বকীয়ধারা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি সাংবাদিকতা এবং পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। এমনকি অনুবাদ সাহিত্যেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন

একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, নাট্যকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, অভিনেতা, শিল্পী, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক ও অনুবাদক। অন্য দিকে বড় গুণের অধিকারী হিসাবে ছিলেন সার্থক গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালক।

নজরুল বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন শ্রেণীর গান রচনা করেছেন। এই বিভিন্ন শ্রেণীর গান হিসাবে বৈচিত্র্যময় সব সংযোজনও লক্ষ্য করার মত। দেশাত্মবোধক, আধুনিক, গজল, শাস্ত্রীয়রীতির গান, রাগপ্রধান, ইসলামিক, ভক্তিমূলক, হাসিরগান, ঋতুসংগীত, জাগরণীমূলক, মার্চসংগীত, শ্যামাসংগীত, কীর্ত্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, গ্রাম্যসুর, নৃত্যসম্বলিত, পালাগান, কবিগান, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, সাঁওতালী, লাউনী, কাজরী, মুর্শিদী, মর্সিয়া, ধীবরের গান, ছাদপেটানোর গান, ফরমায়েশী গান, গীতিনাট্যের গান, গীতি আলেখ্য, চলচ্চিত্র ইত্যাদি। সংগীতের এতগুলি পর্যায়ে নজরুল যেভাবে বৈচিত্র্যময় সুর সংযোজন করেছেন– বাংলাগানের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত জীবন বহু বৈচিত্র্যময় অধ্যায় দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁর সঙ্গীতময় জীবন ও সাঙ্গীতিক গুনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে জন্ম থেকে শুরু ক'রে পারিবারিক জীবনধারা, কিশোরকাল, যৌবনকাল, তাঁর শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর বিষদ আলোচনা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রনয়ণ করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে নজরুলের জীবন প্রবাহ এখানে সন্নিবেশ করা হলো।

কাজী নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ও পারিবারিক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বপুরুষগণ পাটনার অন্তর্গত হাজীপুরে বসবাস করতেন। পরবর্তীতে তারা হাজীপুর থেকে বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়ায় এসে বসবাস স্থাপন করেন। এই চুরুলিয়াকে বাংলার অস্ত্রাদি নির্মাণের প্রাণকেন্দ্র বলা হ'ত। রাজা নরোত্তম সিংহের রাজধানী ছিল এই চুরুলিয়ায়। এই চুরুলিয়াতে আমাদের সকলের প্রাণপ্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জৈষ্ঠ্য, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ মে বুধবার এক দরিদ্র কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ, মাতার নাম জাহেদা খাতুন, পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ, মাতামহ মুন্সী তোফায়েল আলি। কবি কাজী নজরুল ইসলামেরা ছিলেন সহোদর তিন ভাই এবং এক বোন। সবার বড় ছিলেন কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠ কাজী আলী হোসেন ও বোন উম্মে কুলসুম। নজরুলের ডাক নাম ছিল দুখু মিয়া।

নজরুলের পিতা ফকির আহমেদ ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন যখন নজরুলের বয়স ছিল ৮ বছর। দশ বছর বয়সে নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সে সময় থেকেই তাকে জীবিকা নির্বাহের চিন্তা করতে হয়। এ কারনে তাঁকে মক্তবের শিক্ষকতা, মাজারে খাদেমগিরি এবং মসজিদে

মুয়াজ্জিনের কাজ করতে হয়। পরিবারের অর্থনৈতিক কষ্ট লাঘব করতেই এত অল্প বয়সে নজরুলকে এই সকল কাজের শরনাপন্ন হতে হয়। পরিশেষে এইটুকু বলা যায় যে, ৯-১০ বছর বয়সে কারো পিতৃবিয়োগ ঘটলে একটি দরিদ্র পরিবারে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় কাজী নজরুলের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পিতার মৃত্যুর পর নজরুলের পরিবারে আরো দরিদ্রতা নেমে আসে, যার সকল ধকল নজরুলকেই সামলাতে হয়েছিল।

কিশোর নজরুল

কাজী নজরুল পুরোপুরি গ্রামের সোদামাটির গন্ধ, এবড়ো-থেবড়ো রাস্তা, কাঁকর বালি মেশানো কালচে রং এর মাটি, ঝোঁপঝাড়, বনজঙ্গল, চোখজুড়ানো সবুজ শ্যামলিমা– যেখানে খুব একটা চোখে পড়ে না, সেখানে সূর্য্যের প্রখর তেজ, এ রকম প্রত্যন্ত অঞ্চলবেষ্টিত ভারতের এক রাঢ়ভূমিতে তাঁর শৈশব ও কৈশোরের কিছুসময় কেটেছে। ছোটবেলা থেকেই নজরুল দেখে আসছে তাদের গাঁয়ে হিন্দু ও মুসলমানের সহাবস্থান। নাই কোন জাতি ভেদাভেদ। হিংসা বিদ্বেষ বলতে কিছুই ছিল না মানুষগুলোর মাঝে। সকলের মাঝে একটিই বিষয় ছিল আমরা মানুষ। আমরা এক জাতি এবং এই সামাজিক অবস্থাটা নজরুলের জীবনে যে কতটা প্রভাব ফেলেছিল সেটা নজরুলকে একটু পড়লে অর্থ্যাৎ নজরুলের সৃষ্টিকর্মের সাথে পরিচিত হলেই বুঝা যায়। গ্রামে বেশিরভাগ মানুষই ছিল গরীব কিন্তু একেবারেই অক্ষরজ্ঞানহীন নয়। সকলের বাড়ীতে কিছু কিছু লেখাপড়া হতো। বিশেষ করে ফার্সী, আরবী পড়বার চলটা অনেক ঘরেই ছিল।

চুরুলিয়া হয়তো কোন বিত্তশালী গ্রাম ছিলা না কিন্তু সেখানে ছিল মার্জিত রুচি শিক্ষিত একটি ভদ্রসমাজ। ছোট গ্রাম অথচ মক্তব আছে যেখানে ছেলেমেয়েরা শিক্ষগ্রহণ করতে পারে। শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে সদা প্রস্তুত। এদের মাঝে বজলে করিম অন্যতম যার শিক্ষার আলোর ছটায় নজরুল সেই শৈশবেই নিজের জীবনকে আলোকিত করতে পেরেছিলেন। এছাড়া নজরুলের পিতাও তাকে শিক্ষার পথ দেখিয়েছিলেন। তবে নজরুলের পিতার চাচাতো ভাই বজলে করিমের প্রভাব নজরুলের জীবনে অনেকটা জায়গাজুড়ে। নজরুলের শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ অতি অল্প বয়সে আরবী, উর্দু ও বাংলাভাষা সমন্ধে জ্ঞান আহরণের সব কিছুই হয়েছিল চাচা বজলে করিমের শিক্ষায়।

‘কিশোর নজরুলের মনে ভাষার প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে দিয়েছিলেন এই পিতৃব্য। তবে নজরুলের জীবনী থেকে যেটুকু জানা যায় এই বজলে করিম ছিলেন রসিক মানুষ। তিনি কবিতা লেখার চেষ্টা করতেন মাতৃভাষা বাংলায়। তার লেটোর একটি দলও ছিল। কাব্যরসিক এই ব্যক্তি বালক ভ্রাতষ্পুত্রটির মনে নিজের অজান্তেই স্বপ্নের বীজ বুনে দিতে লাগলেন। তাই বলা যায় পদ্য রচনায় দুখু মিয়ার হাতেখড়ি হয়েছিল এই মানুষটার কাছেই’।[৩]

আগেও বলা হয়েছে চুরুলিয়া কোন বিত্তশালী গ্রাম নয়, তবু সেখানে ছিল মার্জিত রুচি সম্পন্ন একটি ভদ্রসমাজ। ছোট্ট গ্রাম তবু মক্তব আছে, মক্তব বসছে গাঁয়ের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য, শিক্ষিত মৌলবী আছেন, শিক্ষিত লোকদের আনাগোনা চলছে। শিক্ষা ও এর আলো গ্রামের মানুষদের মধ্যে অল্পবিস্তর ছিল তাই এর প্রভাবও নজরুল অর্থ্যাৎ দুখু মিয়ার হৃদয়ে পৌছেছিল। এর থেকে বলা যায়-কিশোর বয়স অর্থ্যাৎ নজরুল যখন কিছুটা বুঝতে পারছিল তখনই সে অনুভব করেছিল, শিক্ষিত ও মার্জিত মনের মানুষ হলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব।

শৈশবে নজরুলের শিক্ষাজীবন

কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা অক্ষর পরিচয় ঘটেছিল তার পিতার কাছেই। কিন্তু অসময়ে অর্থ্যাৎ নজরুলের বয়স যখন মাত্র আট বছর ঠিক সেই সময় [১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দ] তার পিতৃবিয়োগ ঘটে। পরিবারের দারিদ্রের কারণে নজরুলের বিদ্যা শিক্ষার তেমন সুব্যবস্থা হয়নি।

কাজী নজরুল ইসলাম দশ বছর বয়সে [১৯১৬-১৯০৯] গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন এবং মক্তবে পড়াকালীন সময়ই পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর নজরুল এ মক্তবেই এক বছর শিক্ষকতা ক'রে সংসার চালান। এ ছাড়া মোল্লাগিরি করেও দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা করেন। সেই দশ বছর বয়সেই নজরুল বিভিন্ন আউল-বাউল, সুফী-দরবেশ, সাধু-সন্যাসীদের জীবন ধারণ পদ্ধতি লক্ষ্য করতেন। তাদের আস্তানায় ঘুরে বেড়াতেন এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য ধ্যান করতেন। আর এ বয়সেই রামায়ন, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত তম্ময়চিত্তে পড়তেন। তখন থেকেই তার চরিত্রে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে গ্রামের মানুষ তাকে তারাক্ষ্যাপা এবং মাঝে মাঝে নজরুল আলী ব'লে ডাকত। পরবর্তীতে নজরুল যে এত সুন্দর সাবলীল ভক্তিমূলক ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন তার ভীত হয়ত সেই দশ বছর বয়সেই তৈরী হয়েছিল।

নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ নজরুল বেশ কিছু দিন স্কুল জীবন থেকে দূরে ছিলেন। স্কুলের নিয়ম তান্ত্রিক লেখাপড়া হয়তো তাকে সেভাবে টানতো না। ১১/১২ বছর বয়সেই লেটো দলে তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং লেটো দলেই তিন-চার বছর কাটিয়েছিলেন। পরবর্তীতে গ্রামের মানুষদের সহায়তায় রাণীগঞ্জের রাজ স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা হয়। তাকে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। এই স্কুলে নজরুল মন দিয়ে পড়াশুনা করতে থাকে এবং বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেন। কিন্তু এই জীবনও তার বেশী দিন ভালো লাগেনি। স্কুলের বোর্ডিং সুপারিন্‌টেন্ডেন্টের সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হয় বোর্ডিং এর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নিয়ে। এর ফলশ্রুতিতে তাঁকে সিয়ারসোল স্কুল ছাড়তে হয়।

স্কুল ছাড়ার পর নজরুল ইসলাম আবার যোগ দেন লেটো দলে। এখানে শুরু হয় আবারো গান লিখা। কিন্তু খুব বেশীদিন তার এই কাজ ভালো লাগেনি। সে আবার শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করেন এবং ভর্তি হন

বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অজয়নদীর তীরে মাথরুন গ্রামে কাশিম বাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী স্থাপিত নবীন চন্দ্র ইনস্টিটিউটে। এটা ১৯১১ সালের কথা। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। এই কুমুদ রঞ্জনের ভুমিকাও নজরুলের জীবনে অনেক প্রভাব ফেলেছিল।

বাঁধাধরা ছকে লেখাপড়া ক'রে যাওয়ার ছেলে নজরুল ছিলেন না। তাই তো নিয়মমাফিক পড়াশুনা, স্কুলে যাওয়া এগুলো তার কখনো ভালো লাগেনি। নজরুল স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সে দু'বছর নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে পড়াশুনা শেষ করে আবারো গ্রামে ফিরে বাসুদেবের লেটো দলে যোগ দেন। কিছু গ্রামে সে সময় ছিল ধানের আকাল। ঘরে ঘরে চলছিল হাহাকার। তাইতো জীবিকার তাগিদে নজরুলকে লেটোর দলের সাথে শহরে পা বাড়াতে হয়। শহরে থাকাকালীন রেলওয়ের একজন খ্রীশ্চান গার্ডসাহেব নজরুলের গানে মুগ্ধ হয়ে তাকে তার বাড়ী নিয়ে যান। সেখানে কিছুদিন কাটানোর পর নজরুল আবার ফিরে আসেন আসানসোল। এটা ১৯১৩ সালের কথা। আসানসোলে নজরুল এসে হুগলী নিবাসী মহম্মদ বখসের রুটির দোকানে কিছুদিন কাজ করেন। সেখানে সে বেচাকেনার ফাঁকে ফাঁকে বাশী বাজিয়ে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে খদ্দেরদের খুশী করতেন।

নজরুলের এরকম ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা তাকে অনেক গান ও কবিতা লিখতে সাহায্য করেছে। পরবর্তীতে নজরুলের সাথে পরিচয় ঘটে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহ ও তার পত্নী শামসুন নাহারের সাথে। এই দম্পতি নজরুলকে তাদের বাসায় নিয়ে যান এবং এখানে নজরুল তাদের সংস্পর্শে থাকেন আর তাদের সংসারের টুকিটাকি কাজ কর্ম করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তারা এই বালকের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি দেখে ও গান শুনে বুঝতে পারেন, এই বালক কোন সাধারণ মানুষ নয়। এই বালকের মাঝে সাহিত্য-সংস্কৃতির বীজ সুপ্ত অবস্থায় আছে। পরে তাদের ইচ্ছায় এবং নজরুলের আগ্রহে সাব ইন্সপেক্টর রফিজউল্লাহ সাহেব ট্রেন ভাড়া দিয়ে নজরুলকে তার দেশের বাড়িতে বড় ভাই সাফায়াতউল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং নজরুলের ময়মনসিংহ দরিরামপুর স্কুলে ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা করেন।

দরিরামপুর স্কুলে নজরুল [১৯১৪ জানুয়ারী] সপ্তম শ্রেণীতে ফ্রি ছাত্ররূপে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলেন। স্কুল আর রফিজউল্লাহ সাহেবদের বাড়ীর দূরত্ব বেশী হওয়ায় দরিরামপুরের কাছাকাছি নজরুলের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থাও রফিজউল্লাহ সাহেবের পরিবার করেন। কিন্তু মুশকিল হয় এবারও স্কুলের নিয়মবদ্ধ আবেষ্টনী নজরুলকে বেঁধে রাখতে পারেননি। বাড়ীর জন্য মন কেমন করত। খেয়াল বশে চ'লে এসেছেন এতদূর। এভাবেই চ'লে গেল প্রায় এক বছর, আর বার্ষিক পরীক্ষার সময়ও চলে আসে এবং পরীক্ষা শেষে অষ্টম শ্রেণীতে প্রমোশন পেয়ে নিজের দেশে অর্থ্যাৎ ডিসেম্বর, ১৯১৪-এ আবার সে চুরুলিয়ায় ফিরে আসে। আবারো সেই লেটোদলে যথারীতি যোগ দেন।

কিছুদিন ঘোরাঘুরির পর নজরুলের বোধদয় হয় যে, লেখাপড়া করা উচিত। কিন্তু রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল স্কুলে তিনি যখন ভর্তি হবে বলে মনস্থির করেন, ঠিক তখন বাধ সাধে সে স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সে কিছুতেই

নজরুলকে ভর্তি করে নিতে চাচ্ছিলেন না। নজরুল তার এই মনের দুঃখ তার এক বন্ধুকে কবিতাকারে পত্র লিখে জানান। সেই বন্ধু পরে তার লেখা এই পত্র সেই প্রধান শিক্ষককে দেখান। এই পত্র দেখে প্রধান শিক্ষক এতই বিমোহিত হয়ে গেলেন যে, সে নজরুলকে স্কুলে তো ভর্তি করে নিলেনই, এবং বিনা বিতনে পড়বার ব্যবস্থাও ক'রে দেন। আর সাত টাকা করে রাজবাড়ী থেকে পাওয়ার ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন। এই স্কুলে নজরুল দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন [১৯১৫-১৯১৭]।

সিয়ারসোল স্কুলে থাকাকালীন সময়েই নজরুল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। রচনা প্রতিযোগিতা অংশগ্রহন-স্কুলের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ। এছাড়া বিভিন্ন অভিনন্দন পত্র লিখেও নজরুল সেই বয়সেই তার প্রতিভার সাক্ষর রেখেছিলেন।

এই স্কুল নজরুলের ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। তার মাঝে বিপ্লবী চিন্তাধারাও সঞ্চারিত হয়েছিল এই স্কুলের শিক্ষক বিপ্লবী যুগান্তর দলের নিবারন চন্দ্র ঘটক দ্বারা। দেশ পরাধীন, দেশের মানুষ-শৃঙ্খলের বেড়াজালে আবদ্ধ। দেশকে মুক্ত করতে হবে, দেশের মানুষকে পরাধীনতার শিকল থেকে বের ক'রে আনতে হবে– এই সকল চিন্তাধারা সবই নজরুলের মাঝে সঞ্চারিত হয়েছিল তারই শিক্ষক এই নিবারন চন্দ্রের দ্বারা।

এছাড়া সিয়ারসোল স্কুলের আরো দুই একজন শিক্ষকের প্রভাব ছিল নজরুলের উপর। এদের মধ্যে আছেন মৌলবী হাফিজ নুরুন্নবী। আমরা জানি নজরুলের বাল্য রচনায় আরবী এবং ফারসী শব্দের ব্যবহার তার পিতৃব্য বজলে করিমের কাছে হয়েছিল। কিন্তু প্রথাগতভাবে ফারসী শেখার সুযোগ হয়েছিল এই নুরুন্নবীর কাছেই। নুরুন্নবী অতি যত্নসহকারে নজরুলকে ফারসী ভাষার সাথে পরিচয় করিয়েছিলেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল সংস্কৃত বাদ দিয়ে ফারসী দ্বিতীয় ভাষারূপে নিয়েছিলেন। ফারসী সে খুব ভালভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিল বলেই করাচির সেনানিবাসে মৌলবী সাহেবের কাছে পারস্যের মরমী কবি হাফিজের রুবাইয়াৎ পড়া তার সহজ হয়ে গিয়েছিল।

নজরুলের শিয়ারসোল স্কুলজীবনের শেষ বছর গুলোতে তিনি স্কুলের চারজন শিক্ষক দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়। তাঁরা হলেন– উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল, বিপ্লবী ভাবধারায় নিবারন চন্দ্র ঘটক, ফারসী ভাষায় ফারসী শিক্ষক হাফিজ নুরুন্নবী এবং সাহিত্য চর্চায় প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ বন্ধ্যোপাধ্যায়।

নজরুল যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দেন তখন সময়টা ছিল ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাস। অর্থ্যাৎ তখন প্রিটেষ্ট পরীক্ষা চলছিল। সেই সময়টা শহরে গ্রামে চলছিল সৈন্য যোগাড়ের তোড়জোড়। এই ঘটনা সম্পর্কে নজরুলের কাছের বন্ধু শৈলজানন্দ লিখেছেন– 'আমরা পরীক্ষা দিয়েই চুপিচুপি পালিয়ে গেলাম আসানসোল। আমি যেতে পারলাম না। কিন্তু নজরুল ঠিকই চলে গেলো, সাথী হারা হয়ে গেলাম'।[৪] ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নজরুল

৪৯নং বাঙ্গালী পল্টনের সৈনিকরূপে লাহোরের নৌশেরাতে যান। সেখানে তিনমাসের ট্রেনিং সম্পন্ন ক'রে চ'লে যান করাচী সেনানিবাসে এবং এখান থেকে নজরুলের জীবনে আরেকটি অধ্যায়ের শুভ সূচনা ঘটে।

লেটোদলে নজরুল

নজরুলের সংগীত জীবন শুরু লেটোর দলে যোগদানের মাধ্যমে। চুরুলিয়ার দিকে সেসময় লেটো গানের খুব জনপ্রিয়তা ছিলো। গ্রামে গ্রামে যাত্রা ও কবিগানের মাধ্যমে গড়ে উঠেছিলো লেটোগান। লেটো প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম স্মরণ করতে হয় যার কথা তিনি হলেন নজরুলের পিতৃব্য কাজী বজলে করিমকে। কবি বাল্যকালেই বজলে করিম সাহেবের রচনায় অনুপ্রাণিত হন এবং তার কাছেই লেটোগান রচনা করার উৎসাহ পান। নজরুল ছিলেন স্বভাব চঞ্চল। এটা লক্ষ্য করেই বজলে করিম সাহেব তাকে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষকপদে এবং মসজিদের কাজে নিযুক্ত করেন। আসলে নজরুলের সঙ্গীতের ভীত গড়ে উঠেছিল লেটো দলে এবং লেটোর দলে ওস্তাদ চকোর গোদার কাছেই তার সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণের সূত্রপাত ঘটে। এই সময় তিনি তবলা, বাঁশী, হারমোনিয়াম প্রভৃতি বাজানো শিক্ষালাভ করেন। এছাড়া মোহনবাঁশী ও আড়বাঁশী নজরুল ভালো বাজাতে পারতেন।

এই লেটো গানের জন্য কবিকে পড়তে হয়েছে কোরান, পুরাণ, গীতা, রামায়ন, মহাভারত, সারাবলী, ইসলামী পুথিপত্র সবই। লেটোর দলের সুবাদেই হিন্দু মুসলিম উভয় সংস্কৃতির চর্চা করেছিলেন ব'লে তার সাহিত্য খাঁটি ভারতীয় ঐতিহ্যের সাহিত্য হয়ে উঠেছিল। লেটো গানে গ্রাম বাংলার সহজ সরল অর্থ্যাৎ সাদামাটা ভাষা গ্রহণ করেছিলেন বলেই তার সাহিত্য হয়েছে সর্বজন গ্রাহী এবং আপামর জনগনের মনের ভাষা, মনের সাহিত্যে। মূলতঃ নজরুলের সাঙ্গীতিক জীবনের ভিত্তিই রচিত হয়েছিল লেটো গানকে ভিত্তি ক'রে। লেটো জীবনকে বাদ দিয়ে তাই নজরুলের সাঙ্গীতিক জীবনের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

এখানেই তিনি জনচিত্ত শতদল থেকে তিলে তিলে মধু সংগ্রহ করেছেন এবং গ্রাম্য মানুষ ও গ্রামীণ সংস্কৃতি তথা লোক সংস্কৃতির অন্তর স্পর্শ করেছেন। নজরুলের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য বাণীই তার সাহিত্য ও সঙ্গীতকে এমন জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করেছে। কীর্ত্তন অথবা বাউল যেমন খাঁটি লোক সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়েনা তেমনি শহরে সভ্যতার ধারক ও বাহক কবিগানকেও বলা যায় না। কারণ, কবিগান মূলতঃ শহর থেকে উদ্ভুত, শহরে গীত এবং শহরের লোকের মনোরঞ্জনের জন্য রচিত। অপরপক্ষে লেটোর উৎপত্তি গ্রামে। গ্রামের মানুষের আটপৌড়ে ভাষা নিয়ে রচিত। এ গান ছিল মানুষের প্রাণস্বরূপ, লেটোর মধ্যে নানা পর্যায়ের গান আছে যেমন–

১. আসর বন্দনার গান,

২. পাঁচমিশালী বা হাস্যরসাত্মক গান,

৩. রঙ্গ-ব্যঙ্গ বিষয়ক গান,

৪. কৌতুক উদ্দীপক বিষয়ক গান ইত্যাদি।

এককালে চুরুলিয়া, মদনপুর, নিমশা, খুশনগর, মৌজুড়ী, মোহনা, লালবাজার, হিজলগলা ইত্যাদি গ্রামে লেটোগানের প্রচলন ছিল জোয়ারের মত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জারিগান, মুর্শিদী, বাউল, ঝুমুর, টুসু, ভাদু ইত্যাদি গান লোকসংস্কৃতি হিসাবে সমাদৃত হলেও লেটোগান প্রায় বিস্তৃত অর্থ্যাৎ সংগৃহীত নয়। হয়তো এগুলোর মধ্যে কোন লিখিতরূপ নাই বলেই সেইভাবে সমাদৃত হয়নি। লেটো গানে মূলতঃ বর্ণিত থাকে সংসারের সুখ-দুঃখ ও দাম্পত্য জীবনের হাসি-কান্না। এছাড়া থাকে পৌরাণিক কাল্পনিক লোকগাঁথা ইত্যাদি ছোট ছোট কাহিনী।

নজরুলের লেটোগানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শকুনিবধ, চাষার সঙ, রাজপুত্র, আকবর বাদশা, মেঘনাথবধ, কবি কালিদাস, কবির লড়াই, দাতা কর্ণ, কংসবধ, কুশ ও লব, যজ্ঞের ঘোড়া, সুদখোর ব্রজেন মুখার্জী, দেবযানী শর্মিষ্ঠা, ভক্ত মুচি, রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা, রাধাবিনোদ, বনের মেয়ে পাখি, বৌ এর বিয়ে, আজব বিয়ে, জেলে-জেলেনী ইত্যাদি। নিম্নে নজরুলের রচিত কয়েকটি লেটোগানের বিবরণ দেওয়া হলো :–

এক

‘চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে।
নামাজে জমি ‘উগালে’
রোজাতে জমি ‘সামালে’,
কলেমায় জমিতে মই দিলে চিন্তা কি হে এই ভবেতে’ ॥[৫]

দুই

‘কেমন ওস্তাদ হে তুমি, দেখবো আজ সভাস্থলে।
ভীত হবে, তোর ঐ দম্ভে, যে হবে কচি ছেলে ॥
ক্ষুধার্ত সিংহ এসেছে
মৃগদের কি রক্ষা আছে,
সাধের সামগ্রী পেয়েছে, আজিকে সে অবহেলে’ ॥[৬]

Dhaka University Institutional Repository

তিন

‘আসর বন্দি আগে নামেতে তোমার।
তোমার শত পাক নামেতে রাখি চারিধার ॥
আখেরি রসুলের তরে
পোস্তদান এই আসরে
দাও গো আমারে দুশমনের দাগার পরে হই না গেরেপ্তার’ ॥[৭]

চার

‘শিবা হয়ে পরাজিতে পশুরাজে সাধ।
জ্ঞান নাই কি তোর কান্ডাকান্ড হয়েছিল উম্মাদ ॥
অজা হয়ে কোন্ সাহসেতে ভেক হয়ে ফণীর সাথে বাধ
বাধ্ সাধিস্ মহাবলী বাঘের সাথে তুমি বাধ’ ॥[৮]

পাঁচ

‘বিজয়ের মালা পর গলে হে, ওহে বীরচূড়ামণি।
তুমি রণে গেলে, বসিয়ে বিরলে, গেঁথেছি এ মালাখানি ॥
না ঘুমায়ে নিশি আছি জাগরণে
আসিবে কখন ভাবি মনে মনে,
আসিলে হে বীর তুমি এক্ষণে, আমি আছি মালাপাণি’ ॥[৯]

ছয়

‘কি দেখিলাম সামসেতে, ও বাবা পিলে চমকে যায়।
বিরাট হাতী দাঁড়িয়ে আছে, জোড়া শিং মাথায় ॥
জোড়া শিং এর উপরেতে
বিরাট কি ভাই ধরা তাতে,
আর যাব না হাতীর কাছে, ও বাবা সে যদি গুঁতায়’ ॥[১০]

সাত

‘যাও যাও ছুটে যাও, ও কর্মবীর।
আমি আছি পশ্চাতে ধরিয়া নিশান, মুছাতে অশ্রুনীর ॥
ভয় করো না সে রাক্ষসীরে
বন্দিনী হবে সে কারাগারে,
এবার রূপে তার ধরবে অনল, ঝরিবে অশ্রুনীর’ ॥[১১]

নজরুলের লেটোগান নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। উপসংহারে বলতে হয়, কাজী বজলে করিমের অকাল মৃত্যুর কারণে নজরুলও লেটোর মঞ্চ ভেঙ্গে যোগ দিলেন বাঙ্গালী পল্টনে। এখানে উল্লেখ্য যে, নজরুলের সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্টকাল পল্টন জীবন। ফলে লেটোর দল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় দুই সুর-সেনাপতির আকস্মিক অভাবে। এভাবেই কাজী নজরুল ইসলামের সাঙ্গীতিক জীবনে লেটো সঙ্গীতের বিলুপ্তি ঘটে।

নজরুলের সৈনিক জীবন

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের শেষে ময়মনসিংহ থেকে কাজী নজরুল ইসলাম ফিরে আসেন বর্ধমানে। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে ভর্তি হলেন সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে। রাণীগঞ্জের স্কুল জীবনে নজরুলের দুজন সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। একজনের নাম ছিল শৈলজানন্দ আর অপরজন ছিলেন শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ। শৈলজানন্দ হিন্দু ব্রাহ্মণ, শৈলেন্দ্র ছিলেন খ্রিষ্টান। নজরুল-শৈলজা-শৈলেন তথা মুসলমান-ব্রাহ্মণ-খ্রিষ্টানের– এই সংস্কারমুক্ত প্রীতিসখ্য নজরুলের উদার মনের অনুকূল হয়েছিল।

সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র ঘটক ছিলেন যুগান্তর দলের সদস্য। তিনিই ছিলেন নজরুলের জীবনে বিপ্লবী চিন্তাধারার সঞ্চারক। এ প্রসঙ্গে মুজাফফর আহমদ লিখেছেন, পল্টন হতে ফেরার পরে নজরুল নিজেই আমার নিকট স্বীকার করেছিল যে, সে শ্রী ঘটকের দ্বারা তার মতবাদের দিকে আকর্ষিত হয়েছিলেন।

সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুল ছিল নজরুলের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই স্কুল থেকেই তিনি প্রিটেস্ট পরীক্ষা দেন। সেই সময় শহরে চলছিল ব্রিটিশ আর্মিতে সৈন্য ভর্তি। নজরুল ভীষণভাবে চাইছিল যেন সে সৈন্যদলে যোগ দিতে পারে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে তার উড়ার পালা শুরু হ'ল।

হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা হওয়ার তারিখ জানা য়ায়নি। তবে ১৯১৭-এর সেপ্টেম্বরে নজরুল এক বড় বাহিনীর সাথে লাহোর যাত্রা করেন। সৈনিকে যোগদানের পর কিছুদিন নৌশেরা [পেশোয়ারের ৪০কি.মি. পূর্বে] শিক্ষানবীশ হিসাবে কাটান। প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা দেবার পর তাকে নেওয়া হয় করাচিতে। সেনাবাহিনীটি মুখ্যত কয়েক হাজার বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান তরুণ দিয়ে গড়া ছিল ব'লে '৪৯ নম্বর বাঙ্গালী রেজিমেন্ট' বলেই পরিচিত ছিল। নৌশেরায় নজরুলকে তিনমাসের শিক্ষনবীশ কাল কাটাতে হয়। সেনা মহড়ার সেসব স্মৃতি নজরুল তার জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২/৩ বছর পরের সৃষ্টি তার কবিতা 'অগ্নিবীণা' ও 'কামাল পাশা'য় এই সেনা জীবনের ঘটনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

নজরুল যুদ্ধজীবনের প্রায় পুরো সময়টাই করাচিতে কাটান এবং এখানে কর্মরত অবস্থাতেই তিনি ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টারের মাস্টার হাবিলদার হন। এখানে বাঙ্গালী পল্টনের কয়েকশো তরুণের প্রাণচাঞ্চল্য ও

উত্তেজনার অন্ত ছিল না। পরবর্তীতে নজরুলের সৃষ্টি 'বাঁধনহারা' উপন্যাসেও করাচি যুদ্ধজীবনের প্রতিচ্ছবি 'কাটখোট্টা লড়িয়ে দোস্ত' নুরুল হুদা চরিত্রেও নজরুল সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

নজরুলের সৈনিক জীবন করাচি যাওয়া বা যুদ্ধ করার জন্য ফলপ্রসু হয়নি। বরং তা গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল সাহিত্যে সাধনার জন্য। এই সৈনিক জীবনই নজরুলকে স্থিরভাবে কাব্য ও জ্ঞান চর্চার সুযোগ এনে দেয়। অনুবাদ কাব্য রুবাইয়াৎ হাফিজের মুখবন্ধে কবি নজরুল লিখেছেন, 'আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি সে আজ ১৯১৭ সালের কথা-সেইখানেই আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙ্গালী পল্টনে একজন পানহারী মৌলবী থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। শুনে এমন মুগ্ধ হয়ে যাই যে- সেইদিন থেকে তার কাছে ফার্সি শিখতে আরম্ভ করি। তারই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত কাব্যই পড়ে ফেলি'।[১২]

করাচির সেনানিবাসে নজরুলের সাহিত্য চর্চা কেবলমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্য সম্বলিত সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা, কলকাতার সাহিত্য জগতের সাথেও ছিল তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। 'সওগাত' পত্রিকার প্রকাশলগ্ন থেকে নজরুল তার গ্রাহক ছিলেন এবং সেনানিবাসের অনেকেই সে এই পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন।

করাচিতেই নজরুল প্রথম সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং কলকাতার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তা প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন। করাচিতে লিখা এবং করাচি থেকে পাঠানো নজরুলে নিম্ন লিখিত রচনাবলী কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়।

'১.	বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী	:	[গল্প], সওগাত	জ্যৈষ্ঠ-১৩২৬
২.	মুক্তি	:	[কবিতা], বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা	শ্রাবণ-১৩২৬
৩.	স্বামীহারা	:	[গল্প], সওগাত	ভাদ্র-১৩২৬
৪.	কবিতা সমাধি	:	[হাসির কবিতা], সওগাত	ভাদ্র-১৩২৬
৫.	তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা	:	[প্রবন্ধ], সওগাত	আশ্বিন-১৩২৬
৬.	হেনা	:	[গল্প], বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা	১৩২৬
৭.	আশায়	:	[হাফিজের গজল], প্রবাসীপৌষ,	১৩২৬
৮.	ব্যাথার দান	:	[গল্প], বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা	মাঘ-১৩২৬
৯.	মেহের নেগার	:	[গল্প], নুর	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩২৬
১০.	ঘুমের ঘোরে	:	[গল্প], নুর	ফাল্গুন১৩২৬'।[১৩]

নজরুলের সামরিক জীবনে যুদ্ধের নৃশংসতা ও হতাশা বা ক্ষোভ নেই বটে, তবুও জীবনের শিক্ষা যে তার অভিজ্ঞতাকে সম্প্রসারিত, দৃষ্টিকে উদার সর্বোপরি কবি হওয়ার প্রস্তুতিকে পূর্ণতা দান করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই যুদ্ধক্ষেত্রেই নজরুলের সাথে পরিচয় ঘটেছিল একজন পাঞ্জাবী মৌলবীর। যার কাছ থেকেই প্রথম নজরুলের দীওয়ান-ই-হাফিজ এর সাথে পরিচয় ঘটেছিল এবং তিনিই নজরুলের মনে বপন করেছিলেন মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত সব কবিদের রচনা। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ফারসী ভাষা শিখতে আরম্ভ করেন। যা নাকি পরবর্তীতে নজরুলকে বাংলা সঙ্গীতে গজলের প্রবর্তক হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা সাহায্য করেছিল। যুদ্ধ জীবনেরই নজরুল তাঁর অন্যতম বন্ধু অর্গ্যান মাস্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে-র কাছে অর্গ্যান বাজানো শিখেছিল। তাই বলা যায়, সৈনিক জীবনই নজরুলের কবি হয়ে উঠার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছিল।

ড. রফিকুল ইসলামের উদ্ধৃতি থেকে বলা যায়, 'সৈনিক জীবনই নজরুলকে দিয়েছিল স্থিতিশীল জীবন। এখানেই তিনি জীবনবোধের নতুন শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছতা আসে সৈনিক জীবনেই। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে সেনাবাহিনীতে যোগদান এবং ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষত করাচির সেনানিবাসে অবস্থান নজরুলের জন্য ছিল প্রকৃত শিক্ষাজীবন'।[১৪]

নজরুলের সাহিত্য জীবন

'সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ, আমি সাহিত্যে কি করেছি তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর'। 'সাহিত্য হইতেছে প্রাণের অভিব্যক্তি। অন্যের ঠিক প্রাণে গিয়া আঘাত করিবার মত শক্তি পাইতে নিজের প্রাণ থাকা চাই'। কাজী নজরুল ইসলামের এই ভাষ্য থেকে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বিষয়টি সহজে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর কবিতা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের একটা নতুন ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ দ্বারা বাংলা সাহিত্যের নতুন ভাবধারা আনয়ন করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর সাহিত্যের তিনটি যুগ আছে। যেমন–

প্রথমতঃ জাতীয়তাপূর্ণ সাহিত্য যুগ।

দ্বিতীয়তঃ সাম্যবাদীর সাহিত্য যুগ

তৃতীয়তঃ তৎপরবর্তীকালের সাহিত্য যুগ যাহা গজল গান প্রধান সাহিত্য।

সাহিত্য জীবনে নজরুলের আত্মপ্রকাশ 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' দিয়ে– যা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের সম্পাদনায় 'সওগাত' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর ভাদ্র সংখ্যায় 'স্বামীহারা' নামে গল্প, আশ্বিন সংখ্যায় 'কবিতার সমাধি' নামে একটি লঘু কবিতা ও 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার ১৩২৬ শ্রাবন-আশ্বিন সংখ্যায় নজরুলের

প্রথম কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয়। এরপর কার্ত্তিক-পৌষ সংখ্যায় 'হেনা' গল্প ও মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় 'ব্যাথার দান' গল্প প্রকাশিত হয়।

এছাড়া সেই সময়কার আরেকটি পত্রিকা 'নূর'-এ নজরুলের 'মেহের-নেগার' নামে গল্প ও 'ঘুমের ঘোরে' নামে কবিতা প্রকাশিত হয়।

নজরুল ইসলামের এই লেখাগুলি মূলতঃ করাচির নৌশেরার সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন রচিত। করাচি থেকেই নজরুল এই লেখাগুলি তখনকার বিখ্যাত সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য ও নূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যা নজরুলের জীবনের আশীর্বাদক, অভিভাবক, দিক নির্দেশক জনাব মুজাফ্ফর আহমদের হাতে পড়েছিল। আর মুজাফ্ফর আহমদই নজরুলকে সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। নজরুলের কলকাতা শহরে থাকার ব্যবস্থাও তিনি ক'রে দিয়েছিলেন। এতে ক'রে বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলামের কবি হয়ে উঠার পিছনে এই মহান ব্যক্তিটির অবদান অনস্বীকার্য।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির প্রতি নজরুলের কৃতজ্ঞতা চিরকালই জাগরুক ছিল। দুই দশক পরে ১৯৪১ এর পাঁচই এপ্রিল উক্ত সমিতির রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে নজরুল বলেছিলেন, 'সেদিন যদি সাহিত্য সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত তবে হয়তো কোথায় ভেসে যেতাম তা আমি জানি না। এই ভালোবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম নীড় বেঁধেছিলাম, এ আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হত কিনা আমার জানা নেই'।[১৫]

পরবর্তীতে হাফিজের অনুবাদ ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দের পৌষমাসে 'সবুজপত্র' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মুজাফ্ফর আহমদের ভাষায়, নজরুলের 'হেনা' এবং 'ব্যাথার দান' গল্প দু'টি যদিও প্রেমের গল্প কিন্তু এর ভিতর দিয়েই অদ্ভুত দেশপ্রেম ফুটে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম কাজী নজরুল ইসলামই সোভিয়েত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের নেপথ্য ইতিহাসের সামান্য স্পর্শ লাগিয়েছেন। নজরুলের 'লাল নিশান' সত্যাসত্যই লালদেরই নিশান। শুধু ব্যাথার দান গল্পে নয় তাঁর রচনায় যেখানেই সে 'লাল নিশান' কথার উল্লেখ করেছে সেখানেই সে লালদের লাল নিশানকেই মনে করেছেন।

'ব্যাথার দান' গল্পে কাজী নজরুল ইসলাম সরাসরি 'লালফৌজ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইংরেজ সরকারের চোখে পড়লে পাছে পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় সেই আশংকায় সতর্ক ও বিচক্ষণ মুজাফ্ফর আহমদ লালফৌজ বদল ক'রে সেখানে দিলেন মুক্তি সেবকদল।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থ্যাৎ বাংলা ১৩২৬ বঙ্গাব্দে কলকাতায় ফেরার পর এবং করাচির নৌশেরা থাকাকালীন সময়ে যেসব সাহিত্য রচনা করেছিলেন তার বেশীরভাগ রচনাতেই ছিল দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্ছার এক কণ্ঠ। নজরুল ইসলাম যতদিন সুস্থ ছিলেন ততদিন সে তাঁর সাহিত্য

রচনা ক'রে গেছেন। কখনো কবিতা, কখনো প্রবন্ধ, কখনো উপন্যাস, নাটক আবার কখনো তার অতুলনীয় সঙ্গীত সম্ভার। সৃষ্টির মধ্যে ছিল তাঁর আনন্দ। শৃংখলার কোন বাঁধনেই তাকে বাঁধা যায়নি কখনো। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মতো তিনি একের পর এক সৃষ্টি ক'রে গেছেন তাঁর অসাধারণ সব সাহিত্য-সম্ভার।

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন বা সৃষ্টির পরিধি অনেক ব্যাপক। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বর্তমান গবেষণার প্রতিপাদ্য হলো, 'কাজী নজরুল ইসলামের গানে স্বদেশপ্রেম, উদ্দীপনা ও সাম্যবাদের প্রভাব'। ফলে তাঁর সাহিত্য জীবন সম্পর্কে মূলতঃ সংক্ষেপে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। তবে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ধারাবাহিকতার একটি ছক নিম্নে প্রদান করা হলো যেখান থেকে নজরুলের সাহিত্য জীবন ও সৃষ্টির একটি রূপরেখা পাওয়া যেতে পারে।

০১.	ব্যাথার দান	:	গল্প	ফাল্গুন-১৩২৮
০২.	অগ্নিবীণা	:	কবিতা	কার্ত্তিক-১৩২৯/২৫ অক্টোবর-১৯২২
০৩.	যুগবাণী	:	প্রবন্ধ	কার্ত্তিক-১৩২৯/২৬ অক্টোবর-১৯২২
	[বাজেয়াপ্ত ২৩ নভেম্বর, দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ-১৩৫৬]			
০৪.	রাজবন্দীর জবানবন্দী	:	ভাষণ	১৩২৯ সাল/১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ। পুস্তক আকারে প্রকাশিত
০৫.	দোলন চাঁপা	:	কবিতা ও গান	আশ্বিন-১৩৩০/অক্টোবর-১৯২৩
০৬.	বিষের বাঁশী	:	কবিতা ও গান	শ্রাবণ-১৩৩১/১০ আগস্ট-১৯২৪
০৭.	ভাঙার গান	:	কবিতা ও গান	শ্রাবণ-১৩৩১/আগস্ট-১৯২৪
০৮.	রিক্তের বেদন	:	গল্প	পৌষ-১৩৩১/১২ই জানুয়ারী-১৯২৫
০৯.	চিত্তনামা	:	কবিতা ও গান	শ্রাবণ-১৩৩২/আগস্ট-১৯২৫
১০.	ছায়ানট	:	কবিতা ও গান	আশ্বিন-১৩৩২/২১ সেপ্টেম্বর-১৯২৫
১১.	সাম্যবাদী	:	কবিতা	পৌষ-১৩৩২/২০ ডিসেম্বর-১৯২৫
১২.	পুবের হাওয়া	:	কবিতা ও গান	মাঘ-১৩৩২/৩০ জানুয়ারী-১৯২৬
১৩.	ঝিঙে ফুল	:	ছোটদের কবিতা	চৈত্র-১৩৩২/১৪ এপ্রিল-১৯২৬
১৪.	দুর্দিনের যাত্রী	:	প্রবন্ধ	আশ্বিন-১৩৩৩/অক্টোবর-১৯২৬
১৫.	সর্বহারা	:	কবিতা ও গান	আশ্বিন-১৩৩৩/২৫ অক্টোবর-১৯২৬
১৬.	রুদ্রমঙ্গল	:	প্রবন্ধ	১৯২৭
১৭.	ফণি-মনসা	:	কবিতা ও গান	শ্রাবণ-১৩৩৪/২৯ জুলাই-১৯২৭
১৮.	বাঁধনহারা	:	উপন্যাস	শ্রাবণ-১৩৩৪/আগস্ট-১৯২৭

Dhaka University Institutional Repository

১৯.	সিন্ধু-হিল্লোল	:	কবিতা	১৯২৮
২০.	সঞ্চিতা	:	কবিতা ও গান	আশ্বিন-১৩৩৫/২ অক্টোবর-১৯২৮
২১.	সঞ্চিতা	:	কবিতা ও গান	আশ্বিন-১৩৩৫/১৪ অক্টোবর-১৯২৮
২২.	বুলবুল	:	গান	কার্ত্তিক-১৩৩৫/১৫ নভেম্বর-১৯২৮
২৩.	জিঞ্জীর	:	কবিতা ও গান	কার্ত্তিক-১৩৩৫/১৫ নভেম্বর-১৯২৮
২৪.	চক্রবাক	:	কবিতা	ভাদ্র-১৩৩৬/১২ আগস্ট-১৯২৯
২৫.	সন্ধ্যা	:	কবিতা ও গান	ভাদ্র-১৩৩৬/১২ আগস্ট-১৯২৮
২৬.	চোখের চাতক	:	গান	পৌষ-১৩৩৬/২১ ডিসেম্বর-১৯২৮
২৭.	মৃত্যু-ক্ষুধা	:	উপন্যাস	মাঘ-১৩৩৬/জানুয়ারী-১৯৩০
২৮.	রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ	:	অনুবাদ কবিতা	আষাঢ়-১৩৩৭/১৪ জুলাই-১৯৩০
২৯.	নজরুল গীতিকা	:	গান	ভাদ্র-১৩৩৭/২ সেপ্টেম্বর-১৯৩০
৩০.	ঝিলিমিলি	:	নাটিকা	অগ্রহায়ণ-১৩৩৭/১৫ নভেম্বর-১৯৩০
৩১.	প্রলয় শিখা	:	কবিতা ও গান	১৩৩৭/আগস্ট-১৯৩০

[গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০। কবির বিরুদ্ধে ১১ ডিসেম্বর মামলা এবং ছয় মাসের কারাদন্ড, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৩০ কবির জামিন লাভ। আপিল। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের ৪ মার্চে অনুষ্ঠিত গান্ধি-আর উইন চুক্তির ফলে সরকার পক্ষের অনুপস্থিতিতে ৩০ মার্চ ১৯৩১ কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ে কবির মামলা থেকে অব্যাহতি কিন্ত প্রলয় শিখার নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮]

৩২.	কুহেলিকা	:	উপন্যাস	শ্রাবণ-১৩৩৮/২১ জুলাই-১৯৩১
৩৩.	নজরুল স্বরলিপি	:	স্বরলিপি	ভাদ্র ১৩৩৮, ২৫ আগষ্ট ১৯৩১
৩৪.	চন্দ্রবিন্দু	:	গান	১৩৩৮/সেপ্টেম্বর-১৯৩১

[বাজেয়াপ্ত ১৪ অক্টোবর-১৯৩১। নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৩১ নভেম্বর-১৯৪৫]

৩৫.	শিউলিমালা	:	গল্প	কার্ত্তিক-১৩৩৮/১৬ অক্টোবর-১৯৩১
৩৬.	আলেয়া	:	গীতিনাট্য	১৩৩৮/১৯৩১
৩৭.	সুরসাকী	:	গান	আষাঢ়-১৩৩৯/৭ জুলাই-১৯৩২
৩৮.	বনগীতি	:	গান	আশ্বিন-১৩৩৯/১৩ অক্টোবর-১৯৩২
৩৯.	জুলফিকার	:	গান	আশ্বিন-১৩৩৯/১৩ অক্টোবর-১৯৩২
৪০.	পুতুলের বিয়ে	:	ছোটদের নাটিকা ও কবিতা	সম্ভবতঃ চৈত্র-১৩৪০/এপ্রিল-১৯৩৩
৪১.	গুলবাগিচা	:	গান	আষাঢ়-১৩৪০/২৭ জুন-১৯৩৩
৪২.	কাব্য আমপারা	:	অনুবাদ	অগ্রহায়ণ-১৩৪০/২৭ নভেম্বর-১৯৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৪৩.	গীতিশতদল	:	গান	বৈশাখ-১৩৪১/এপ্রিল-১৯৩৪
৪৪.	সুরলিপি	:	স্বরলিপি	ভাদ্র-১৩৪১/১৬ আগস্ট-১৯৩৪
৪৫.	সুর-মুকুর	:	স্বরলিপি	আশ্বিন-১৩৪১/৪ অক্টোবর-১৯৩৪
৪৬.	গানের মালা	:	গান	কার্ত্তিক-১৩৪১/২৩ অক্টোবর-১৯৩৪
৪৭.	মক্তব সাহিত্য	:	পাঠ্যপুস্তক	শ্রাবণ-১৩৪২/৩১ জুলাই-১৯৩৫
৪৮.	নির্ঝর	:	কবিতা ও গান	মাঘ-১৩৪৫/২৩ জানুয়ারী-১৯৩৯
৪৯.	নতুন চাঁদ	:	কবিতা	চৈত্র-১৩৫১/মার্চ-১৯৪৫
৫০.	মরু-ভাস্কর	:	কাব্য	১৩৫৭/১৯৫১
৫১.	বুলবুল[২য় খন্ড]	:	গান	১১ জ্যৈষ্ঠ-১৩৫৯
৫২.	সঞ্চয়ন	:	কবিতা ও গান	১৩৬২/১৯৫৫
৫৩.	শেষ সওগাত	:	কবিতা ও গান	বৈশাখ-১৩৬৫/১৯৫৯
৫৪.	রুবাইয়ৎ-ই-ওমর খৈয়াম	:	অনুবাদ	অগ্রহায়ণ-১৩৬৫/ডিসেম্বর-১৯৫৯
৫৫.	মধুমালা	:	গীতিনাট্য	মাঘ-১৩৬৫/জানুয়ারী-১৯৬০
৫৬.	ঝড়	:	কবিতা ও গান	মাঘ-১৩৬৭/জানুয়ারী-১৯৬১
৫৭.	ধূমকেতু	:	প্রবন্ধ	মাঘ-১৩৬৭/জানুয়ারী-১৯৬১
৫৮.	পিলে-পট্‌কা পুতুলের বিয়ে	:	ছোটদের কবিতা ও নাটিকা	১৩৭০/১৯৬৪
৫৯.	রাঙাজবা	:	শ্যামাসঙ্গীত	বৈশাখ-১৩৭৩/এপ্রিল-১৯৬৬
৬০.	নজরুল রচনা সম্ভার	:	আব্দুল কাদির সম্পাদিত	জ্যৈষ্ঠ-১৩৬৮/মে-১৯৬৫
৬১.	নজরুল রচনাবলী[১ম খন্ড]	:	আব্দুল কাদির সম্পাদিত	জ্যৈষ্ঠ-১৩৭৩/ডিসেম্বর-১৯৬৬, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৬২.	নজরুল রচনাবলী[২য় খন্ড]	:	আব্দুল কাদির সম্পাদিত	পৌষ-১৩৭৩/ডিসেম্বর-১৯৬৭ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৬৩.	নজরুল রচনাবলী[৩য় খন্ড]	:	আব্দুল কাদির সম্পাদিত	ফাল্গুন-১৩৭৬/ফেব্রুয়ারী-১৯৭০ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৬৪.	নজরুল রচনাবলী[৪র্থ খন্ড]	:	আব্দুল কাদির সম্পাদিত	জ্যৈষ্ঠ-১৩৮৪/মে-১৯৭৭ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৬৫.	নজরুল রচনাবলী [৫ম খন্ড-প্রথমার্ধ]	:	আব্দুল কাদির সম্পাদিত	জ্যৈষ্ঠ-১৩৯১/মে-১৯৮৪ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

৬৬.	নজরুল রচনাবলী [৫ম খন্ড-দ্বিতীয়ার্ধ]	:	আব্দুল কাদির সম্পাদিত	পৌষ-১৩৯১/ডিসেম্বর-১৯৮৪ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
৬৭.	নজরুল গীতি[অখন্ড]	:	আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত	সেপ্টেম্বর-১৯৭৮ হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
৬৮.	অপ্রকাশিত নজরুল	:	আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত	অগ্রহায়ণ-১৩৯৬/নভেম্বর-১৯৮৯ হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
৬৯.	লেখার রেখায় রইল আড়াল	:	কবিতা ও গান আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত	ভাদ্র-১৪০৫/আগস্ট-১৯৯৮ নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৭০.	জাগো সুন্দর চির-কিশোর	:	সংগ্রহ ও সম্পাদনা আসাদুল হক	২৮ আগষ্টস্ট-১৯৯১ নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৭১.	নজরুলের ধুমকেতু [নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনঃমুদ্রণ]	:	সংগ্রহ ও সম্পাদনা সেলিনা বাহার জামান	ফাল্গুন-১৪০৭/ফেব্রুয়ারী-২০০১
৭২.	নজরুলের লাঙ্গল [নজরুল সম্পাদিত পত্রিকার একত্রিত পুনঃমুদ্রণ]	:	মুহম্মদ নুরুল হুদা সম্পাদিত	জ্যৈষ্ঠ-১৪০৮/মে-২০০১
৭৩.	কাজী নজরুল ইসলাম রচনা সমগ্র	:	সম্পাদিত গ্রন্থ	প্রথম খন্ড, কলকাতা বইমেলা, ২০০১ দ্বিতীয় খন্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০১ তৃতীয় খন্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯, জুন ২০০২ চতুর্থ খন্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, জুন ২০০৩ পঞ্চম খন্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪১১, জুন ২০০৪ ষষ্ঠ খন্ড, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, জুন ২০০৫ পশ্চিম বঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কলকাতা
৭৪.	নজরুলের হারানো গানের খাতা	:	সম্পাদনা মুহম্মদ নুরুল হুদা	আষাঢ় ১৪০৪, জুন ১৯৯৭ নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
৭৫.	নজরুল গীতি[অখন্ড] প্রথম সংস্করণ	:	আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ সম্পাদক : ব্রম্মমোহন ঠাকুর	হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের সঙ্গীতশিক্ষা জীবন

কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর এই প্রতিভার সার্থক স্ফুরণ ঘটেছে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। নজরুল ছিলেন মূলতঃ স্বভাব গীতিকবি। গ্রাম্য লেটোদলের মধ্য দিয়েই সঙ্গীত জগতে তাঁর অনুপ্রবেশ ঘটে। পিতৃব্য কাজী বজলে করীমের কাছেই নজরুলের সঙ্গীতে একপ্রকার হাতেখড়ি হয়। কাজী বজলে করীম নিমশা গ্রামের সেই লেটোদলের পরিচালক ছিলেন, আর নজরুলের সঙ্গীত জীবন শুরু হয় এই লেটোদলে যোগ দিয়ে। লেটোদলে নতুন নতুন গান বেঁধে এবং তাতে সুর সংযোজন ক'রে নজরুল রাতারাতি দলের একজন প্রধান হয়ে ওঠে। কাজী বজলে করীমের মৃত্যুর পর নজরল ইসলাম এই দলের হাল ধরেন।

এই লেটোদলে থাকাকালে নজরুল অনেক পালা রচনা করেছিলেন। মূলতঃ নজরুল ইসলাম লেটোদল পরিচালনা, সঙ্গীত ও পালা রচনা এবং মঞ্চে পরিবেশনার যাবতীয় পাঠ নিয়েছিলেন তাঁর পিতৃব্য কাজী বজলে করীম ও চুরুলিয়া অঞ্চলের সে সময়কার বিখ্যাত লেটো পরিচালক শেখ চকোর গোদার কাছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই লেটোদলের কবিরূপে নজরুলের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দল থেকে গান ও পালা লিখিয়ে নেয়ার জন্য নজরুলের কাছে ভিড় জমতে থাকে। 'শেখ চকোর গোদা এবং মুন্সী বজলে করীমের প্রভাবে নজরুল লেটোর দলের জন্য গান লিখে দিতে লাগলেন। তাঁর লেখা গান দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল কিশোর কবির নাম। বিভিন্ন গ্রাম থেকে তাঁর কাছে লোক আসতে লাগল গান লিখিয়ে নেবার জন্য। আর নজরুলও মুক্তহস্ত। যে এসে গান চায়, তাকেই গান লিখে দেন। ..... পরবর্তীকালে নজরুল এক অসাধারণ সংগীতরচয়িতা ও সুরকার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। একদিনে একসঙ্গে চৌদ্দ পনেরোটি গান লিখে, তাতে সুর দিয়ে এবং তা সকলকে শেখানোর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তার মূল উৎস ছিল লেটোর দলের জন্য বিচিত্র অসংখ্য গান রচনার মধ্যে। এর মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন প্রাণের আরাম, মনের তৃপ্তি'।[১৬]

গ্রাম্য লেটোদলকে কেন্দ্র করেই নজরুলের সঙ্গীত, সংস্কৃতি ও কাব্য প্রতিভার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। লেটোদলের জন্য গান ও পালা রচনা করতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু ও মুসলিম এই উভয় জীবনধারার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে নিগূঢ় পরিচয় লাভ করেছিলেন– যা পরবর্তীকালে তাঁর সকল রচনার মধ্যে প্রভাব ফেলেছিল। এই লেটোদলে থাকাকালে নজরুল বাঁশী, পিক্‌লু, হারমোনিয়াম, তবলা, আঁড়বাঁশী ও মোহনবাঁশী বাজনো শিখেছিলেন এবং এসব বাদ্যযন্ত্র তিনি ভালো বাজাতে পারতেন।

ভারতের রাঢ় অঞ্চলখ্যাত বর্ধমান জেলায় নজরুলের জন্ম। এই রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গীতধারায় ঝুমুর গান এক বিশেষ স্থান দখল ক'রে আছে। জন্মগতভাবেই নজরুলের মধ্যে এ গানের ধারা প্রবহমান ছিল– যা পরবর্তীতে লেটোসহ তাঁর ঝুমুর ধারার একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বা ধারার গান রচনায় নজরুল বিশেষ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাঁর রচিত অনেক ঝুমুর গান সে-স্বাক্ষর বহন ক'রে চলেছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নজরুলের জীবনের অনেক চড়াই-উত্‌রাই লক্ষ্য করা যায় কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর নিষ্ঠা ও মনোনিবেশ ছিল অনেক বেশী। তারপরও বলতে হয়, তিনি সঙ্গীতশিক্ষা ও রচনার তরীটিকে কখনো একই ঘাটে বেঁধে রাখেননি। সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে থাকাকালে ঐ স্কুলের শিক্ষক শ্রী সতীশচন্দ্র কাঞ্জীলালের কাছে নজরুলের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয়। আবার তাঁর সদা ঘূর্ণয়মান জীবনের কোন একসময় যখন হুগলীতে ছিলেন, সেসময় তৎকালীন বিখ্যাত সেতারী প্রকৃতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে নজরুল কিছুদিন সেতারে তালিম নিয়েছিলেন। সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রী সতীশচন্দ্র কাঞ্জীলালের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে তালিম নেয়ার পর থেকে কাজী নজরুল ইসলাম সঙ্গীতের নতুন জগতের সন্ধান পান। পরবর্তীকালে নজরুল রাগসঙ্গীতের এক মহা ভাণ্ডারী হয়ে উঠেছিলেন– যার স্বাক্ষর তাঁর গানেই পাওয়া যায়।

কাজী নজরুল ইসলাম দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সেনাবাহিনীর ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে একজন সৈনিক হিসাবে যোগ দিয়ে করাচীর নৌশেরাতে চ'লে যান। পারিবারিক সূত্রে এবং সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে পাঠ্যবই হিসাবে নজরুল ফার্সী ভাষা শিখেছিলেন। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে করাচী এসে বাঙালি পল্টনের একজন পাঞ্জাবী মৌলবির কাছেই নজরুল ব্যাপকভাবে ফার্সী কাব্য অধ্যয়ন করেন এবং ফার্সী গজলের সাথে তাঁর নিগূঢ় পরিচয় ঘটে। ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে নজরুল বাংলা গজলের একজন বিখ্যাত সঙ্গীতকার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন। সৈনিক জীবনে করাচীতে থাকাকালে সহকর্মীদের কাছে নজরুল ইসলাম পাশ্চাত্য সঙ্গীতের উপরেও তালিম নেন। এছাড়া হাবিলদার নিত্যানন্দ দে-র কাছে অরগ্যান শিক্ষাগ্রহণ করেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টন ভেঙে দিলে নজরুল করাচী থেকে কলকাতায় চ'লে আসেন এবং এসময় তিনি সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি দেশাত্ববোধক, উদ্দীপনামূলক, জাগরণীমূলক, স্বদেশী, জাতীয় চেতনামূলক ইত্যাদি শ্রেণীর গান রচনা ক'রে সুনাম অর্জন করেন। এরপর নজরুল কিছুদিন মার্গ-সঙ্গীতে তালিম নেন মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে এবং তৎকালীন খেয়াল ও ঠুম্‌রীর প্রখ্যাত ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে। এছাড়া তাঁর সমসাময়িক ওস্তাদ দবীর খাঁ, মস্তান গামা প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞের সাহচর্যে এসে শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের অনেক বিষয়ের উপর নজরুল জ্ঞানলাভ করেছিলেন।

নজরুলের কারাগার জীবন

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব ধুমকেতুর মতো। ১৯২২ সালে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে নজরুল তার অগ্নিবীণা গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তখনই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহী কবি হিসাবে। নজরুল প্রধানতঃ কবি হলেও গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ প্রভৃতিও রচনা করেছেন। কবিতার পাশাপাশি সেখানেও তিনি স্বঅহংকারে তার স্বদেশচেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। মূলতঃ বিদেশী শাসন, সামাজিক অবিচার, ধর্মীয় গোড়ামীর বিরুদ্ধে এবং

স্বদেশের বঞ্চিত লাঞ্চিত মানুষের স্বপক্ষে তিনি তার লেখনিকে ধারণ করেছিলেন। তার এই স্বদেশ ভাবনা কখনো কখনো শিল্পের নান্দনিক রীতিকে ক্ষুন্ন করলেও বক্তব্য বা বিষয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক নজরুল আপোষ করেননি। কাজী নজরুল ইসলাম সেইসব কবি শিল্পী সাহিত্যিকদের একজন যার ব্যক্তিগত ও দেশচৈতন্যকে একই আধারে সমন্বিত করেছেন, ব্যক্তিমনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-আর্তি-আকুলতা ও নানামুখী চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে ব্যাপক অর্থে দেশ চৈতন্যকেই দেখেননি, এর মাধ্যমে সামাজিক দায়িত্বপালন এবং গণসচেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশপ্রেমের স্বাক্ষরও তিনি রেখেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে চ'লে গেলেন করাচী। প্রথম মহাযুদ্ধে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন বাঙলায়। বাঙলায় তখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তিনি নিজের লিখনীকে রাঙিয়ে দিলেন সেই রক্তে। চারদিকে অগ্নিবীণার ডঙ্কা বেজে উঠল। সময়ের প্রয়োজনকে অনুভব করে একের পর এক অগ্নিবীণা, ভাঙারগান, বিষের বাঁশী, প্রলয় শিখা প্রকাশিত হতে থাকে। কবিতার মধ্যে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কথাই তিনি বলেননি, সামাজিক কুসংস্কারকেও আঘাত করেছেন। কারণ, তিনি জানতেন দেশের আন্দোলনকে জোরদার করতে হলে নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ জ্ঞান প্রথমে বিলুপ্ত করতে হবে। মানুষকে সচেতন করার জন্য এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল সেদিন। যে ধর্ম রিজার্ভ ক'রে রাখে, যে আচার মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ জিইয়ে আচার সর্বস্ব নির্জীব হয়ে মিশে থাকে; কাজী নজরুল ইসলাম এসবকে একপাশ ক'রে ধর্মীয় চেতনায় আনেন এক জীবনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। সেজন্য সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে তাঁর দ্বিধা হয়নি। তবে এটা বলা যাবে না যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। যে সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে তাঁর নৈতিক অবস্থান ছিল, তিনি সেই সৃষ্টিকর্তার কাছেই 'ফরিয়াদ' কবিতায় নিজের নালিশ পেশ করেছেন।

একদিকে সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহ আর একদিকে সেই সৃষ্টিকর্তার প্রতি অগাধ বিশ্বাস– এই টানপোড়েনে নজরুলের কবিমানস কখনো চঞ্চল হয়নি বরং এক স্থির বিশ্বাসের দিকে তাঁকে সর্বদা চালিত করেছে। মানুষ ও ধর্মকে এক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন কাজী নজরুল ইসলাম। যেখানে জীবনের সঙ্গে ধর্মের মিল হয়ে উঠবে জীবনের অজ্ঞতায়।

তবে এত আলোচনার মূল বিষয় যা এই লেখার প্রতিপাদ্য তা হলো নজরুলের কারাজীবন। কাজী নজরুল ইসলামকে কোন কোন লেখার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়তে হয়েছিল এবং যার কারণে কবিকে অনেকবার কারাবরণ করতে হয়েছে। আলোচ্য বিষয় যেহেতু নজরুলের কারাজীবন, এই কারাজীবন আলোচনা করতে গেলে অবশ্যই কবিতা প্রবন্ধ সর্বোপরি কোন্ কোন্ রচনার কারণে নজরুলকে কারাবরণ করতে হয়েছিল– তা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরা হলো।

নজরুল ইসলাম কবি-সাহিত্যিক রূপে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন লেখার জন্য তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহের দৃষ্টিতে প'ড়ে যান, এক কথায় নজরুল পড়েন রাজরোষে। কাজী নজরুল ইসলাম

যেমন একদিকে ছিলেন অভিনন্দিত, তেমনি অন্যদিকে ব্রিটিশ রাজশক্তির দমননীতি প্রয়োগ হচ্ছিল তাঁর জীবনে। ভারত-উপমহাদেশের অন্য কোন কবি ও সাহিত্যেকের ক্ষেত্রে এত বেশী সংখ্যক বই বাজেয়াপ্ত হয়নি, যেমন নজরুলের ক্ষেত্রে হয়েছে।

সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দেওয়ার জন্য তার পাঁচটি বই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল এবং আরো পাঁচটি বইকে বাজেয়াপ্ত করবার জন্য সুপারিশ প্রদান করা হয়েছিল পুলিশ দপ্তর থেকে। কিন্তু পরে তা আর করা হয়নি। কাজী নজরুল ইসলামের পিছনে সর্বক্ষণ গোয়েন্দা নজরদারি রাখা হতো।

কাজী নজরুল ইসলাম সর্বপ্রথম ধুমকেতু পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়ে আদালতে সোপর্দ হয়েছিলেন। ফলে তাঁকে একবছর কারাভোগ করতে হয়েছিল। এছাড়া কাব্যগ্রন্থ 'প্রলয়শিখা'র বিরুদ্ধে রাজাদ্রোহমূলক অভিযোগ এনে দুই মাস কারাদন্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই দন্ডাদেশ পরবর্তীতে গান্ধী-আরউইন চুক্তির [৪ঠা মে ১৯৩১] কারণে মামলা প্রত্যাহার করা হয়। এতে নজরুল ছয় মাসের কারাবাস থেকে রেহাই পান।

বর্তমান যুগে এসে আমরা এই সত্যটুকু অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারি যে, বৃটিশ সরকারের নির্মম দমননীতি উপেক্ষা ক'রে নজরুল তার কাব্যশক্তির বিকাশ অসীম সাহস ও নির্ভয়ে চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ফলে কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের সকলকে এই সত্যটুকু বুঝাতে পেরেছিলেন যে, অন্যায় অবিচারের কাছে তাঁর শানিত লিখনি কখনোই আপোষ করেনি এবং তাঁর জীবনী শক্তি ছিল অবর্ননীয় ও অদমনীয়। এ কারণেই নেতাজী সুবাসচন্দ্র বসু বলেছেন, 'কারাগারে আমরা অনেকেই যাই কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রভাব তার লেখার অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। এতেই বুঝা যায় তিনি একজন জ্যান্ত মানুষ'।[১৭]

১৯২৩ সালে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের এক বৎসর সশ্রম কারাবাস হয়। ঐ সময়ে রাজনৈতিক কয়েদীদের কোন শ্রেনী বিভাগের নিয়ম ছিল না। যাকে পারত তাকেই ধরে নিয়ে এসে বন্দী করতো। পরে বিচার প্রহসনের দ্বারা দন্ড দিয়ে কয়েদীর ছাপ দিয়ে দিত। বিচারক সুইন হো নিজে কবি হয়েও বিদ্রোহী কবির বেলাতেও কোন শ্রেনী বিভাগ না করেই তাকে সাধারণ কয়েদীরূপে গন্য করেছিল।

কবিকে কলকাতার জেল থেকে হুগলী জেলে আনা হয়েছিল কোমরে দড়ি বেঁধে। জেল খানায় ঢুকেই উদাত্ত স্বরে 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে হাঁক ছাড়েন। রাজনৈতিক বন্দীরা সচকিত হয়ে শুনল বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম হুগলী জেলে পদার্পন করেছেন। সকলেই কবির আগমনে বন্দীদশায় একঘেয়েমী থেকে বৈচিত্র্যের আশায় উৎফুল হয়ে উঠলো।

বিভিন্ন জেলার অহিংস ও বিপ্লবী যুবসমাজ বিশেষ ক'রে হুগলীর যুব ও ছাত্র সমাজের বড় একটা অংশ তখন আন্দোলনের সৈনিকরূপে হুগলীর বিদ্যামন্দিরে স্বেচ্ছাসেবকরূপে সমবেত হয়েছিল। হুগলী জেল তখন বিভিন্ন জায়গার রাজনৈতিক বন্দীর সমাগমে গম্‌গ্‌ম করছিল। কবি নজরুলকে পেয়ে বন্দীরা গানে, আবৃত্তিতে হাসির হুল্লোড়ে খুব হৈ চৈ করে কাটাত। বাইরে থেকে ছাত্রের দল হুগলী ব্রীজের উপর উঠে জেলের কয়েদীদের দেখত এবং নানারকমে উৎসাহিত করত। যতগুলো জেল ছিল তার মধ্যে হুগলী ছিল সবচেয়ে উঁচু জেল। জেলার সাহেব ছিলেন ভীষণ বদরাগী। সে বিশিষ্ট ও সম্মানিত রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে অন্যান্য সাধারণ কয়েদীদের মত বাজে আচরণ প্রদর্শন করত। চিঠি লেখার কাগজ, খবরের কাগজ, কলম, পেন্সিল কোন কিছুই কয়েদীদের ব্যবহারের জন্য দেয়া হতো না। কবি নজরুলের এইসব ব্যাপারে মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। হুগলী জেলের সুপারিন্টেডেন্ট ছিল এক ইংরেজ ভদ্রলোক। এই ভদ্রলোক রাজনৈতিক বন্দীদের দেখলেই কারণে অকারণে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠত। কবি নজরুল এই জেল সুপার এর নাম রেখেছিল হর্সটোন [Horse Tune] মানে পিচেশ কণ্ঠী। একে নিয়ে নজরুল একটি প্যারোডি গান রচনা করেছিলেন। যা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোমারি গেহে' গানটির সুর ছিল। গানটি হলো–

'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমারি গান তোমারি ধ্যান তুমি ধন্য ধন্য হে' ॥[১৮]

নজরুলের 'ভাঙার গান' গ্রন্থে এই গানটি আছে। তার ফুটনোটে কবি লিখেছেন, 'হুগলী জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল রকম জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় জেলের মূর্তিমান জুলুম বর্ড়কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন করতাম'।

জেলজীবনে দেশভক্ত বন্দীদের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। কারণ, খবরের কাগজ সরবরাহ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া জেলের উঠোনে বন্দীদের স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। যারা ভীষণভাবে উচ্ছল, প্রানবন্ত ছিল তাদেরকে এক একটি ঘরে আটকে রেখে অধিকার হরণ করা হয়। এক বন্দীর সাথে আরেক বন্দীর কথা বলাও বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছিল। কাজী নজরুল ইসলাম গান না গেয়ে থাকতে পারতেন না। তিনি সেই সময় রচনা করেন তার বিখ্যাত গান–

'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পুজার পাষাণ বেদী।
ওরে ও-তরুন ঈশান
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ

ধ্বংস-নিশান

উড়ুক প্রাচী প্রাচীর ভেদি'।[১৯]

এই গানটি শুনে বিক্ষুব্ধ বন্দীদের শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠত। তারা জেল কর্তৃপক্ষের এই অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'ত। এরপর কবি এবং বিশিষ্ট কয়েকজন বন্দীকে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি দিয়ে সেলে বন্দী ক'রে অন্যান্য কয়েদী থেকে দুরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কবি তখন তার আরেকটি বিখ্যাত গান রচনা করেন। গানটি হলো–

'এই শিকল পরা ছল্ মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥
তোদের বন্দী কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে কর্‌ব মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙা কল' ॥[২০]

কবি বন্দী জীবনের ভয়, যন্ত্রনা, দুঃখ দশা এমনকি জেল জুলুমবাজদের অত্যাচারকে পায়ে দলিয়ে এইরূপ কালজয়ী অসাধারণ গান রচনা ক'রে গেছেন। এইসব গান শত বাধা সত্ত্বেত্ত রচনা ক'রে সুর ও দরদ দিয়ে ভাবাবেগের সঙ্গে গেয়ে বন্দীদের প্রাণে প্রাণে প্রতিকারের জন্য, প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত প্রতিবাদের আগুনকে সংক্রমিত ক'রে যেতেন। এই সময় তাঁর বিখ্যাত 'সেবক' কবিতা রচনা করেন। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি ক'রে বন্দীদের সংগ্রামী শক্তিকে বাড়িয়ে তুলেছিলেন। কবির সান্নিধ্যে এসে সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত দেশকে ভক্তি করতে শিখেছিল। তিনি লিখেছেন–

সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নাই কিরে কেউ সত্য সেবক বুকফুলে আজ গাঁড়ায় ?
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়,
বজ্রহাতে জিন্দানের (জেলখানার) এই ভিত্তিটাকে নাড়ায়?

এই কবিতাটির মাধ্যমে সকল বন্দীদের কবি উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। আর এতে অনেকটা সফলও তিনি হন। এই অবস্থায় জেলের অবস্থা অনেকটা ঘোলাটে হয়ে উঠতে থাকে। এত ক'রে জেলার ও জেল সুপার আরো বেশী বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহী কবি, রাজবন্দী ও সাধারণ কয়েদীরাও অনমনীয় হয়ে ওঠে। এরই ফলস্বরূপ প্রতিবাদের জন্য সকলে মিলিতভাবে অনশন ধর্মঘটের প্রস্তাব দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে গ্রহণ করে। এই লক্ষ্যে প্রস্তুতির জন্য সকলে একসঙ্গে এগিয়ে চলতে থাকে। এই সময় সম্ভবতঃ কবি 'মরণ বরণ' গানখানি রচনা করেন। গানটি হলো–

'এসো এসো এসো ওগো মরণ!
এই মরণ-ভীতু মানুষ-মেষের ভয় কর গো হরণ ॥
না বেরিয়েই পথে যা'রা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের 'পরে–
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন-ভরা চরণ' ॥[২১]

কাজী নজরুল ইসলাম এই সময় আরেকটি বিখ্যাত গান রচনা করেন যে-গানটি 'বন্দী-বন্দনা' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। আবার এই গানটিকে প্রভাতী সঙ্গীতও বলা হয়। কারণ, কাজী নজরুল ইসলাম এই গানটি গেয়েই সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতেন। গানটি হলো–

'আজি রক্ত-নিশি-ভোরে একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে মুক্তি-হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া-তলে ॥
.....
ওরা দু'পায়ে দ'লে গেল মরণ-শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কা রে,
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে' চলে'
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশে ছেরে উতল কলরোলে ॥
আজি কারার সারা দেহে মুক্তি-ক্রন্দন
ধ্বনিছে হাহা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন
নিখিল গেহ যেথা বন্দী-কারা, সেথা
কেন রে কারা-ত্রাসে মরিবে বীর-দলে।
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা মুক্ত নভ-তলে' ॥[২২]

এরপর শুরু হয় অনশন ধর্মঘট। বন্দীরা সাফ জানিয়ে দিল আমাদের সম্মানজনক অবস্থা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যাবো। প্রথম প্রথম এই আন্দোলনের কথা কেউ না জানলেও পরবর্তীতে এ আগুন ছড়িয়ে যায় সবখানে। বাংলাদেশ ও নিখিল ভারতের চরমপন্থী নেতারা, ছাত্র-যুবকরা এমনকি সাধারণ মানুষও ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। আরো বিস্ময়কর বিষয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরও বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। কবি একরোখা মানুষ, সে কিছুতেই অনশন ভাঙবেন না। এতে ক'রে অন্য বন্দী কয়েদীরাও পিছিয়ে আসবেন না তাদের অবস্থান থেকে। এই অবস্থায় দেশের সকল জনগনও ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন সরকারের উপর। বিশেষ ক'রে বিদ্রোহী কবির জন্য দেশবাসী উদ্বিগ্ন ও অধীর হয়ে ওঠে। এ বিষয় নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চলতে থাকে সভা সমিতি, বিভিন্ন আন্দোলন। কবি 'মরন বরণ' শিরোনামে গানটি লিখে সকলকে মৃত্যু ভয়-শূন্য হয়ে অনশনের পথে ডেকেছেন, তিনি হয় সকলকে নিয়ে মরবেন, নয় তো সকলকে নিয়েই সাফল্যের মধ্য দিয়ে অনশন ত্যাগ করবেন। এই ছিল তাঁর জিদ্।

স্বয়ং বিশ্বকবি যখন এক তার-বার্তায় জানালেন, 'Give up hunger strike, our literature claims you' তখন কবি একটু বিচলিত হলেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বসন্ত' নাট্যগ্রন্থটি কবি নজরুলকে উৎসর্গ করেন এবং নজরুল বন্ধু শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে হুগলী জেলে পাঠিয়ে দেন। পবিত্র বাবুর কাছ থেকে 'বসন্ত' নাটক গ্রন্থখানি হাতে নিয়ে নজরুল দেখলেন কবিগুরু বসন্ত নাটকের উৎসর্গ পৃষ্টায় ছাপা অক্ষরে 'শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কল্যাণীয়েষু' লিখে নীচে তাঁর নাম কালী দিয়ে সই করেছেন।

কবি নজরুল বিশ্বকবির তারবার্তা পেয়ে ও বসন্ত নাটকসহ আশীর্বাদ পেয়ে একটু চিন্তিত হলেন। এমন সময় বাইরের আন্দোলনের চাপে ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তক্ষেপে বন্দীদের দাবী মেনে নেবে ব'লে সরকার স্বীকার করে। এছাড়া একদিন কলকাতা থেকে নজরুলের প্রিয় মানুষ যাকে সে 'মা' ব'লে সম্বোধন করতেন সেই বিরজাসুন্দরী দেবী, গায়ক নলিনীকান্ত সরকার, কবি সুবোধরায় প্রমুখজন হুগলী জেল গেটে সে উপস্থিত হয়। এতে ক'রে নজরুল বিচলিত হয়ে পড়েন। কারণ, বিরজাসুন্দরী দেবী ছিল নজরুলের মায়ের থেকেও বেশী কিছু। আর এই মানুষটাকেই নজরুল 'সর্ব্বহারা' নামশ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থখানি কবি উৎসর্গ করেছিলেন। বিশ্বকবির তারবার্তায় ও বিরজাসুন্দরীর বহু সাধ্য সাধনায় এবং সরকার পক্ষের দাবী মিটাবার স্বীকৃতিতে মায়ের হাতের লেবুর রস পান ক'রে নজরুল অনশন ভঙ্গ করেন। অনশন ভঙ্গ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ বন্দীদের সমস্ত দাবীই মিটিয়ে দিয়েছিল।

এর মধ্যে নজরুলের খ্যাতি চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বসন্ত নাটকখানি উৎসর্গ করাতে খ্যাতির যেটুকু বাকী ছিল তাও পূর্ণ হয়। এতে ক'রে তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে, ছিদ্রান্বেষী সাহিত্য ব্যবসায়ীদের বুকে হিংসার আগুন উতলে ওঠে।

প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য এরা কলমকে হাতিয়ার হিসাবে দাঁড় করায়। সুবিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতাকে ব্যঙ্গ ক'রে কেউ 'কবি বিদ্রোহী' লিখলেন, কেউ আবার লিখলেন 'ব্যাঙ' নাম দিয়ে কবিতা। এদের ধারনা ছিল এভাবে নজরুলকে সাহিত্য জগৎ থেকে বিতাড়িত করা যাবে। কিন্তু উল্টো হয়ে নজরুল জনগণের মনে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এর কারণ কবি হয়ে তিনি জাতির স্বাধীনতা অভিযানের সঙ্গে পা মিলিয়ে, গলা মিলিয়ে, জান কবুল ক'রে মৃত্যুকে ভয় না ক'রে চলেছিলেন।

কবিগুরু জনগণের কবিকে চিনতে পেরেছিলেন বলেই বসন্ত নাটক উৎসর্গ করেছিলেন। নজরুল জেল খাটছেন, ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য মৃত্যু বরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে ব্রিটিশ সিংহকে পরোয়া করছেন না, জাতিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য চারণের ব্রত নিয়েছেন, এই সব দেখে, শুনে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তার আশেপাশের মানুষগুলো কোনভাবেই নজরুলকে মানতে পারছিলেন না। তাইতো হুজুগের কবি বলে ফতোয়া দিলেন। সেই কারণেই কবি তার 'আমার কৈফয়ত' কবিতায় জবাব দিলেন–

বর্তমানের কবি আমি ভাই ভবিষ্যতের নই নবী
কবি ও অ-কবি যাহা বল মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি।
কেহ বলে তুমি ভবিষ্যতের যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবির সাথে হে !
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে বাণী কই কবি?
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী?

'প্রভাতের ভৈরবী' মানে জাগরণের গান, শুধু কল্পনা বিলাসী সাহিত্যে নয়, মানুষের সুখ-দুঃখময় সংগ্রামী জীবনের গানের ব্রতই তিনি নিয়েছিলেন।

দেশের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তার সাহিত্য এগিয়ে চলছিল। তাই দেশের আন্দোলনের যখন দুঃখ বেড়েই চলছিল, তখন তিনি লিখলেন–

ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটু নুন,
বেলা বয়ে যায়, খায় নিক বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।

নজরুলকে জনগণের কবিরূপে চিনতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাইতো তিনি তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। সবটুকু দিয়ে দেয়াই যে যৌবনের ধর্ম, বসন্তের ধর্ম– এ কথাটা তিনি অনুভব করেছিলেন। ত্যাগই জীবনের সাধনা, জীবনের মূলে ত্যাগের সাধনার সুরই সবসময় ধ্বনিত হয়। এই কথাটাই নজরুলের জীবন-বাণী, এই কথাটাই নজরুলের জীবনের কাজ। সেই জন্যেই নজরুলকে মাটির কাছাকাছির কবি বলা হয়েছে। এরপর কবি নজরুল বহরমপুর জেলে বদলী হয়ে যান। উক্ত জেলে যেতেই জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট নজরুলের কাছে একটি হারমোনিয়াম পাটিয়ে দিয়েছিলেন। এই হারমোনিয়াম পেয়ে নজরুল রাত দিন গান করতেন, মনের সুখে কবিতা প্রবন্ধ লিখতেন। হুগলী জেলের সংগ্রামের পর নজরুল বহরমপুরে আনন্দেই ছিলেন।

ব্রিটিশ রাজশক্তি কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তা ও কলমের উপর বারবার হস্তক্ষেপ করতে চেষ্টা করেছে। তাঁর অভিব্যক্তিতে বাধা দিয়েছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করতে চেয়েছে। তাঁর কাব্য সাহিত্য বাজেয়াপ্ত করেছে, তাঁকে দু'দুবার কারাদন্ড দিয়েছে, জেলে সাধারণ কয়েদীর মত নিপীড়ন করেছে। তাঁর পেছনে গোয়েন্দা লেলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সরকার যতই দমন-পীড়ন করুক দেশবাসী তাঁকে অন্তরে স্থান দিয়েছিল। তাঁকে

সম্বর্ধনা জানিয়ে সম্মানিত করেছে। কলকাতায় এবং জেলায় জোলায় তাঁর সর্ম্বধনা হয়েছে, অনুষ্ঠান হয়েছে। এইভাবে সম্মান জানাবার মাধ্যমে সরকারের দমনীতির প্রতিবাদ ও তার অবদানের ঋণ স্বীকার করা হয়েছে।

যুদ্ধফেরত নজরুল

যুদ্ধ শেষে কলকাতায় এসে কাজী নজরুল ইসলাম ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর সাথে থাকতেন এই সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা কমরেড মুজফ্ফর আহমদ। এখান থেকেই নজরুলের সাহিত্য-সাংবাদিকতা জীবনের মূল কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম দিকেই মোসলেম ভারত, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, উপাসনা প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর কিছু লেখা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে উপন্যাস বাঁধনহারা এবং কবিতা বোধন, শাত-ইল-আরব, বাদল প্রাতের শরাব, আগমনী, খেয়া-পারের তরণী, কোরবানী, মোহর্‌রম, ফাতেহা-ই-দোয়াজ্‌দম্ প্রভৃতি সাহিত্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। এর প্রেক্ষিতে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার মোসলেম ভারত পত্রিকায় তাঁর খেয়া-পারের তরণী এবং বাদল প্রাতের শরাব কবিতা দু'টির প্রশংসা ক'রে একটি সমালোচনা-প্রবন্ধ লিখেন। এর পর থেকেই দেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমালোচকদের সাথে নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় শুরু হয়।

বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির অফিসে কাজী মোতাহার হোসেন, মোজাম্মেল হক, কাজী আব্দুল ওদুদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আফজালুল হক প্রমুখের সাথে পরিচয় হয়। তৎকালীন কলকাতার দু'টি জনপ্রিয় সাহিত্যিক আসর গজেনদার আড্ডা এবং ভারতীয় আড্ডায় অংশগ্রহণের সুবাদে নজরুল পরিচিত হন অতুলপ্রসাদ সেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শিশির ভাদুড়ী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ করমতুল্লাখাঁ প্রমুখের সাথে। ১৯২১ সালের অক্টোবর মাসে নজরুল শান্তি নিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল। কাজী মোতাহার হোসেনের সাথে নজরুলের বিশেষ বন্ধুত্ব গ'ড়ে ওঠে।

সাংবাদিক নজরুল

বাংলা সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও সাময়িকপত্রের ঐতিহ্যের ধারাপথে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। কেউ কেউ নজরুলকে কবি হিসাবেই দেখেছেন কিন্তু তিনি সাংবাদিক ও সম্পাদকরূপে যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক অনন্য সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। বাংলা সাংবাদিকতার জগতে নজরুলের আবির্ভাব হয় অত্যন্ত ক্রান্তিকালীন সংকটের সময়। নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা শুরু হয় ১৯২০ সালের মধ্যভাগে এবং শেষ হয় ১৯৪১ সালে নবযুগ দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পাদনার

কালে। তিনি জড়িত ছিলেন নবযুগ, ধুমকেতু, লাঙ্গল ও গণবাণী পত্রিকার সঙ্গে। তবে একটানা বিশবছর তাঁর সাংবাদিক জীবন চলেনি।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ জুলাই সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ [পরবর্তীতে অবিভক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন] এ. কে. ফজলুল হক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হলেও মূল সম্পাদক ছিলেন যুগ্ম- সম্পাদক মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম । নবযুগ-এ কাজ করার সময় নজরুলের মধ্যে কবি ও সৈনিক এই দুই সত্তার আশ্চর্য ও দুর্লভ মিলন ঘটে। মুজফ্ফর আহমদ নজরুলের সাংবাদিকতা প্রতিভা সম্বন্ধে স্পষ্টই বলেছেন– 'এ কথা মানতেই হবে যে নজরুলের জোরালো লেখার গুণেই 'নবযুগ' জনপ্রিয় হয়েছিল। শুধু জোরালো লেখা বললে সব কিছু বলা হলো না, নজরুলের লেখা হেডিংগুলো হতো অতুলনীয় । রয়াল সাইজের কাগজ কতটুকুই বা স্থান । তাই নজরুল সফলতার সহিত বড় বড় খবর গুলিকে খুব সংক্ষিপ্ত খবরে পরিণত করতো। আজ ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই কী করে নজরুল আয়ত্ত্ব করেছিল এই ক্ষমতা। তার আগে তো সে কোনদিন দৈনিক কাগজের অফিসে প্রবেশও করেনি'।[২৩]

এই সময় নজরুলের বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। আর সমগ্র বাংলাদেশে তার কবি-প্রতিভা ও সাংবাদিক প্রতিভা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আগেও আলোচনা করা হয়েছে, মুজফ্ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলাম যুগোচিত রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছিলেন। আর কৃষক মজুরের ন্যায্য দাবীর পক্ষে তারা জনসমক্ষে আন্দোলনের দাবী জানিয়েছিলেন। এ কারণে 'নবযুগ' খুব শীঘ্রই রাজরোষে পড়ে এবং বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে এ কে ফজলুল হকের সাথে নজরুল এবং মুজফ্ফর আহমদের মনোমালিন্য দেখা দেয়। আর এরা দু'জনই পত্রিকার কাজে ইস্তফা দিয়ে দেওঘরে চলে যান। আর কাগজও বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে 'নবযুগ' আবার প্রকাশিত হয়। আর এই নতুনরূপে আবির্ভুত নবযুগের সম্পাদক নজরুলই হন। নজরুল ইসলাম এই পত্রিকাতে কবিতার পাশাপাশি সম্পাদকীয় লিখতে আরম্ভ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২ জুন কাজী নজরুল ইসলাম 'নবযুগ'-এ তাঁর স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধরূপে 'আমার সুন্দর' লেখেন। এরপরই তিনি ৯ জুলাই তারিখে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধই তাঁর শেষ রচনা।

১৯২০ সালে 'নবযুগ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল– যা পরবর্তীতে ১৯৪২ সালে আবার নতুনরূপে আবির্ভুত হয়েছিল। মাঝখানে নজরুল আরো কয়েকটি পত্রিকার সাথে যুক্ত হন। সেগুলো হলো– ধুমকেতু, লাঙল, গণবাণী, সেবক ইত্যাদি।

১৯২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে কুমিল্লায় থাকাকালীন নজরুল কলকাতার দৈনিক 'সেবক'-এর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একখানা পত্র পান এবং কলকাতায় এসে 'সেবক'-এ যোগদান করার জন্য নজরুলকে বলা হয়।

দৈনিক 'সেবক' ছিল মওলানা মোহাম্মদ আকরম খানের কাগজ। সেই সময় আকরম খান কারারুদ্ধ ছিলেন। নজরুল কালকাতায় এসে কিছুদিনের জন্য দৈনিক 'সেবক'-এর সাথে যুক্ত হন।

বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় পত্রিকা 'ধূমকেতু'-র মতো এত অল্প সময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন কোন সাময়িক পত্রিকার পক্ষে সম্ভব হয়নি। 'ধূমকেতু'-র স্বত্ত্বাধিকারী ছিল কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর কর্মসচিব ছিল শ্রী শান্তিপদ সিংহ। কাগজের প্রকাশক ছিলেন আফজানুল হক সাহেব। সাত নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যের গলি থেকে 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হতো। প্রথম প্রকাশ ১২ আগস্ট ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। 'ধূমকেতু' পত্রিকার দর্শন সম্পর্কে কবি কাজী নজরুল নিজে ব'লে গেছেন, 'ধূমকেতুকে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভন্ডামী, মেকি তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মনর্জনী'।[২৪]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নজরুলের উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত পত্রিকা 'ধূমকেতু'-র আত্মপ্রকাশ ঘটে । 'ধূমকেতু' সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হ'ত। রবীন্দ্রনাথের আর্শীবাদ বাণীসহ কাজী নজরুল ইসলামের 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক একটি প্রবন্ধ রাজনৈতিক কবিতা হিসাবে প্রকাশিত হয় 'ধূমকেতু'-র ২৬ সেপ্টেম্বর-১৯২২ সংখ্যায় । এ কবিতার জন্য 'ধূমকেতু' অফিসে পুলিশ হানা দেয় ৮ নভেম্বর ১৯২২ সালে। 'ধূমকেতু' পত্রিকার মধ্য দিয়ে অসহযোগ আন্দোলন ও খেলাফতের ব্যর্থতায় হতাশ তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতিতে নজরুল ইসলাম বিপ্লব ও বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে ১৯২২-এর ২৬ সেপ্টেম্বরের 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশের জন্য তাঁকে ১৯২২-এর ২৩ নভেম্বর কুমিল্লায় গ্রেফ্তার করা হয়। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুল ইসলাম সাংবাদিকতা ও সম্পাদনায় পরিণত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে হুগলিতে প্রথম গান্ধীজির সাথে নজরুলের পরিচয় হয়। তাঁর আগমন উপলক্ষে নজরুল কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন– যা শুনে গান্ধীজি খুবই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন যে, গান্ধীজির আন্দোলনে দেশের স্বাধীনতার পথ সুগম হবে না। তাই তাঁর মন জনগণের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ বিষয় নিয়ে নজরুল তার বন্ধু কুতুবউদ্দীন আহমদ, হেমন্তকুমার সরকার ও শামসুদ্দীন হুমায়ুনের সঙ্গে আলাপ করেন। এক সময় স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তারা চারজন উদ্যোগী হয়ে একটি দল গঠন করবেন। প্রথমে দলটির নাম ঠিক হয়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত 'লেবার স্বরাজ পার্টি'। এই দলের প্রথম ইশতিহার কাজী নজরুল ইসলামের দস্তখতে প্রকাশিত হয়েছিল। পার্টি গঠন হবার প্রায় সাথে সাথেই তার মুখপত্ররূপে সাপ্তাহিক 'লাঙল' প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে 'লাঙল'-এর প্রথম খন্ড বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়। 'লাঙল'-এর প্রধান পরিচালক হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম ছাপা হতো । আর সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হতো নজরুলের বাঙালি পল্টন জীবনের বন্ধু মণিভুষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম। আর শেষের তিনটি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন গঙ্গাধর বিশ্বাস।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 'লেবার স্বরাজ পার্টি'-র মুখপাত্ররূপে সাপ্তাহিক 'লাঙল' প্রকাশিত হয়। ৩ মাস ২৯ দিনের মধ্যে ১৫টি সংখ্যা প্রকাশ হওয়ার পর 'লাঙল' বন্ধ হয়ে যায়। সুনির্দিষ্ট কোন কারণ জানা যায়নি। তবে ভিতরে কোন কারণ তো ছিলই। প্রকাশিত সংখ্যাগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজালে এক নজরে সন-তারিখ-সপ্তাহ-সংখ্যা ইত্যাদি জানা যাবে।

১. বিশেষ সংখ্যা : বুধবার, ১লা পৌষ-১৩৩২/২৩শে ডিসেম্বর-১৯২৫।

২. দ্বিতীয় সংখ্যা : বুধবার, ৮ই পৌষ-১৩৩২/২৩শে ডিসেম্বর-১৯২৫।

৩. তৃতীয় সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ২৩শে পৌষ-১৩৩২/৭ই জানুয়ারী-১৯২৬।

৪. চর্তুথ সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ৩০শে পৌষ-১৩৩২/১৪ই জানুয়ারী-১৯২৬।

৫. পঞ্চম সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ৭ই মাঘ-১৩৩২।

৬. ষষ্ঠ সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ১৪ই মাঘ-১৩৩২।

৭. সপ্তম সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ২১শে মাঘ-১৩৩২।

৮. অষ্টম সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ২৮শে মাঘ-১৩৩২/১১ই ফেব্রুয়ারী-১৯২৬।

৯. নবম সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ৬ই ফাল্গুন-১৩৩২/১৮শে ফেব্রুয়ারী-১৯২৬।

১০. দশম সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ১৩ই ফাল্গুন-১৩৩২/২৫শে ফেব্রুয়ারী-১৯২৬।

১১. একাদশ সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ২০শে ফাল্গুন-১৩৩২/৪ঠা মার্চ-১৯২৬।

১২. দ্বাদশ সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ৪ঠা চৈত্র-১৩৩২/১৮ই মার্চ-১৯২৬।

১৩. ত্রয়োদশ সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ১১ই চৈত্র-১৩৩২/২৫শে মার্চ-১৯২৬।

১৪. চতুর্দশ সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ২৫শে ফাল্গুন-১৩৩২/৮ই এপ্রিল-১৯২৬।

১৫. পঞ্চদশ সংখ্যা : বৃহস্পতিবার, ২রা বৈশাখ-১৩৩৩/১৫ই এপ্রিল-১৯২৬।

খেয়াল করলে দেখা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দু'টি বুধবার এবং অন্যান্য ১৩টি সংখ্যা সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম সংখ্যায় ইংরেজী সন-তারিখ উল্লেখিত হয়নি । সপ্তম, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ এবং শেষ পঞ্চদশ সংখ্যায় অংকে লেখা এবং বাকিগুলি বানান ক'রে লেখা হয়েছে। বর্তমান বানান পদ্ধতির সাথে তখনকার বানানের একটা অমিল লক্ষ্য করা যায়। একটি বিশেষ বিষয় হলো প্রথম সংখ্যা থেকে পঞ্চদশ সংখ্যা পর্যন্ত 'লাঙল' পত্রিকা ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠায় সংখ্যা নিয়ে প্রকাশ হতো। এর মধ্যে ১৩টি সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠার, ১টি সংখ্যা ১৮ পৃষ্ঠার এবং ১টি সংখ্যা ছিল ২৪ পৃষ্ঠার।

বলাবাহুল্য 'লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত কাজী নজরুল ইমলামের রচনা বেশী প্রাধান্য দেয়া হ'ত এবং তা গুরুত্ব সহকারে জনমনে স্থান ক'রে নিত। 'লাঙল' পত্রিকার ১৫টি সংখ্যায় নজরুলের প্রকাশিত রচনার একটি তালিকা নিম্নে সংযোজন করা হলো–

প্রথম সংখ্যা	:	সাম্যবাদী [১১টি কবিতাগুচ্ছ]
দ্বিতীয় সংখ্যা	:	কৃষানের গান [গান]
তৃতীয় সংখ্যা	:	সবসাচী [কবিতা]
চর্তুথ সংখ্যা	:	পাওয়া যায়নি
পঞ্চম সংখ্যা	:	পত্র [প্রজা ও শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে লেখা]
ষষ্ঠ সংখ্যা	:	পাওয়া যায়নি
সপ্তম সংখ্যা	:	পাওয়া যায়নি
সপ্তম সংখ্যা	:	অশ্বিনীকুমার [কবিতা]
অষ্টম সংখ্যা	:	পাওয়া যায়নি
নবম সংখ্যা	:	শ্রমিকের গান [গান]
দশম সংখ্যা	:	পাওয়া যায়নি
একাদশ সংখ্যা	:	পাওয়া যায়নি
দ্বাদশ সংখ্যা	:	জেলেদের গান [কবিতা]
ত্রয়োদশ সংখ্যা	:	সর্বহারা [কবিতা]
পঞ্চদশ সংখ্যা	:	পাওয়া যায়নি

১৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর লাঙলের নাম পরিবর্তন ক'রে সাপ্তাহিক 'গণবাণী' নামে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মুজফ্ফর আহম্মদ ও নজরুল ইসলাম সেখানে কেবলি লেখক ছিলেন।

'লাঙল' পত্রিকা নজরুল ইসলামের পরিচালনায় ১৯২৬-এর ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর ১২ই আগস্ট থেকে নাম পরিবর্তিত হয়ে 'গণবাণী' নামে প্রকাশিত হতে থাকে। 'লাঙল' পত্রিকা 'গণবাণী'-র সাথে একাত্ন হয়ে যায়। 'লাঙল' নামটির সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য 'গণবাণী' নামটি গৃহীত হয়। 'লাঙল' বললে কেবল কৃষকদের কাগজ বুঝাতো। ফলে 'গণবাণী' নামকরণের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক-কামার-কুমোর-জেলে সকলকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয় । লাঙলের মত 'গণবাণী'ও ক্ষণজীবি হয়। কয়েক মাসের জন্য 'গণবাণী'-র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তবে ১৯২৭-এর ২৭ অক্টোবরের পর আবার 'গণবাণী' প্রকাশিত হয়। ১৯২৮-এর ১৪ জুন দ্বিতীয় বর্ষে প্রথম সংখ্যারূপে আত্নপ্রকাশ করলেও পত্রিকাটির আর কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। ১৯২৭-

এর ৩০ জুন 'গণবাণী'-র ২০তম সংখ্যায় যা প্রকাশিত হয় তাকেই নজরুল ইসলামের জীবন বেদ বলা যেতে পারে।

সম্পাদক ও সাংবাদিকরূপে নজরুল ইসলামের সাফল্য প্রচলিত সাংবাদিকতা মানদন্ডে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রচলিত অর্থে পত্রিকার নিজস্ব মতবাদ তুলে ধরা ও পক্ষ-বিপক্ষের সংবাদ পরিবেশন করার অর্থই হল সাংবাদিকতা। পত্রিকার সফলতা এবং নিজস্ব মতবাদ দ্বারা পাঠককুলকে অনুপ্রাণীত করাই ছিল নজরুলের সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য। তাঁর বক্তব্য, মতামত, সংবাদ পরিবশন পদ্ধতি পাঠকদের আকুণ্ঠ সমর্থন, শ্রদ্ধা আর প্রশংসা অর্জন করেছিল। ভারতের স্বধীনতা আন্দোলনে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে, সর্বোপরি কৃষক-শ্রমিকের মিলিত অভ্যুত্থানে, গণবিপ্লবের উদ্বোধনে নজরুল ইসলাম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা এবং সংবাদ যে ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছিল- তা আজ ইতিহাসে স্বীকৃত। একজন সফল সাংবাদিক সম্পাদকের কাছে এটাই তো সকলের প্রত্যাশা। সাংবাদিকতা মানেই কর্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়নতা, নির্ভীকতা সর্বোপরি আবেগদীপ্ততা– এ সকল গুণে গুণান্বিত ও উদ্ভাসিত ছিল কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিক জীবন।

আজ যখন বিকৃত সাংবাদিকতায় দেশ ভ'রে গেছে, পত্রিকার মতামত ভোগ্যপন্যের মত অর্থমূল্যে বিক্রিত ও বিকৃত, সাংবাদিক-সম্পাদক যখন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মতামতের বিরোধিতা ক'রে থাকে, বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংবাদপত্র যখন প্রয়োজনমত মৌলবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রশ্রয় দেয় তখন নজরুল ইসলামের সাহস ও সততা, বক্তব্যের আবেগ ও উম্মাদনা, ত্যাগ ও নিষ্ঠা, আন্দোলন ও কারাবরণ আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করে। সংগ্রামী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে, সাম্যবাদের চেতনা প্রসারে, মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠায় সম্পাদক-সাংবাদিক কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের কাছে অতুলনীয়, বরণীয় ও আদর্শের মানদণ্ডে শীর্ষ স্থানীয়।

সংবর্ধনা ও পুরষ্কার

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার আলবার্ট হলে সমগ্র বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে 'জাতীয় কবি' হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এস. ওয়াজেদ আলী। আরো ছিলেন কমরেড সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক কবি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি প্রদান করা হয় এবং ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নজরুলকে ডি. লিট. উপাধি প্রদান করেন। সর্বশেষ ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কাজী নজরুল ইসলামকে 'একুশে পদক' প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের অসুস্থতা ও চিকিৎসা

নবযুগে সাংবাদিকতার পাশাপাশি নজরুল বেতারে কাজ করছিলেন। এমন সময়ই র্থাৎ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এত তিনি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তার অসুস্থতা সমন্ধে সুস্পষ্টরুপে জানা যায় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। এরপর তাকে মূলত হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করানো হয়। কিন্ত এতে তার অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। সেই সময় তাকে ইউরোপ পাঠানো সম্ভব হলে নিউরো সার্জারী করা হত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারনে তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে তিনি মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেন। এরপর নজরুল পরিবার ভারতে ণিভৃত সময় কাটাতে থাকে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তারা নিভৃতে ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে কবি ও কবিপত্নীকে রাঁচির এক মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল নজরুলের আরোগ্যের জন্য গঠিত একটি সংগঠন যার নাম ছিল নজরুল চিকিৎসা কমিটি। এছাড়া তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি সহযোগিতা করেছিলেন। কবি চার মাস রাঁচিতে ছিলেন।

এরপর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নজরুল ও প্রমীলা দেবীকে চিকিৎসার জন্য লন্ডন পাঠানো হয়। মে ১০ তারিখে লন্ডনের উদ্দ্যেশে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশন ছাড়েন। লন্ডন পৌছানোর পর বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তার রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে ছিলেন : রাসেল ব্রেইন, উইলিয়াম সেজিয়েট এবং ম্যাককিস্ক-তারা তিনবার নজরুলের সাথে দেখা করেন। প্রতিটি সেশনের সময় তারা ২৫০ পাউন্ড করে পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন। রাসেল ব্রেইনের মতে নজরুলের রোগটি ছিল দুরারোগ্য বলতে গেলে আরোগ্য করা ছিল অসম্ভব। একটি গ্রুপ নির্ণয় করেছিল যে নজরুল "ইনভল্যূশনাল সাইকোসিস" রোগে ভুগছেন। এছাড়া কলকাতায় বসবাসরত ভারতীয় চিকিৎসকরাও আলাদা একটি গ্রুপ তৈরী করেছিলেন। উভয় গ্রুপই এই ব্যাপারে একমত হয়েছিল যে, রোগের প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসা ছিল খুবই অপ্রতুল ও অপর্যাপ্ত। লন্ডনে অবস্থিত লন্ডন ক্লিনিকে কবির এয়ার এনসেফালোগ্রাফি নাম এক্স-রে করানো হয়। এতে দেখা যায় যে তার মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল লোব সংকুচিত হয়ে গেছে। ড: ম্যাককিস্কের মত বেশ কয়েকজন চিকিৎসক একটি পদ্ধতি প্রয়োগকে যথোপযুক্ত মনে করেন যার নাম ছিল ম্যাককিস্ক অপারেশন। অবশ্য ড: ব্রেইন এর বিরোধিতা করেছিলেন।

এই সময় নজরুলের মেডিক্যাল রিপোর্ট ভিয়েনার বিখ্যাত চিকিৎসকদের কাছে পাঠানো হয়। এছাড়া ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও পাঠানো হয়েছিল। জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসার্জন অধ্যাপক রোঁয়েন্টগেন ম্যাককিস্ক অপারেশনের বিরোধিতা করেন। ভিয়েনার চিকিৎসকরাও এই অপারেশনের ব্যাপারে আপত্তি জানান। তারা সবাই এক্ষেত্রে অন্য আরেকটি পরীক্ষার কথা বলেন যাতে মস্তিষ্কের রক্তবাহীগুলির মধ্যে

এক্স-রেতে দৃশ্যমান রং ভরে রক্তবাহীগুলির ছবি তোলা হয় (সেরিব্রাল অ্যানজিওগ্রাফি)। কবির শুভাকাঙ্খীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাকে ভিয়েনার চিকিৎসক ড:হ্যান্স হফের অধীনে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসক নোবেল বিজয়ী চিকিৎসক জুলিয়াস ওয়েগনার-জাউরেগের অন্যতম ছাত্র। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর কবিকে পরীক্ষা করানো হয়। এর ফলাফল থেকে ড: হফ বলেন যে, কবি নিশ্চিতভাবে পিক্স ডিজিজ নামক একটি নিউরন ঘটিত সমস্যায় ভুগছেন। এই রোগে আক্রান্তদের মস্তিষ্কের ফ্রন্টাল ও পার্শ্বীয় লোব সংকুচিত হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন বর্তমান অবস্থা থেকে কবিকে আরোগ্য করে তোলা অসম্ভব। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা ভিয়েনায় নজরুল নামে একটি প্রবন্ধ ছাপায় যার লেখক ছিলেন ড: অশোক বাগচি-তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ভিয়েনায় অবস্থান করছিলেন এবং নজরুলের চিকিৎসার সমন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞ্যান অর্জন করছিলেন। যাহোক, ব্রিটিশ চিকিৎসকরা নজরুলের চিকিৎসার জন্য বড় অংকের ফি চেয়েছিল যেখানে ইউরোপের অন্য অংশের কোন চিকিৎসকই ফি নেননি। অচিরেই নজরুল ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে আসেন। এর পরপরই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড: বিধান চন্দ্র রায় ভিয়েনা যান এবং ড: হ্যান্স হফের কাছে বিস্তারিত শোনেন। নজরুলের সাথে যারা ইউরোপ গিয়েছিলেন তারা সবাই ১৯৫৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর রোম থেকে দেশের উদ্দ্যেশে যাত্রা করেন।

নজরুলের মৃত্যু

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট মোতাবেক ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ সনে রোববার সকাল ১১টা ১০ মিনিটে ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমাদের প্রাণের কবি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনই সর্বোচ্চ রাস্ট্রীয় মর্যাদায় কবিকে তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত স্থান কোন মসজিদের পাশে অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

সংক্ষেপে নজরুল-জীবনপঞ্জি

১৮৯৯

২৫ মে ; ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ ; মঙ্গলবার জন্ম। গ্রাম ঃ চুরুলিয়া; থানা ঃ জামুরিয়া ; মহকুমা ঃ আসানসোল; জেলা ঃ বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। ডাকনাম ঃ দুখু মিয়া ও তারাখ্যাপা। পিতা ঃ কাজী ফকির আহমদ ; মাতা ঃ জাহেদা খাতুন। পিতামহ ঃ কাজী আমানুল্লাহ। মাতামহ ঃ মুনসী তোফায়েল আলী

১৯০৮

পিতার মৃত্যু।

১৯১০

গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাস। মসজিদের ইমামতি, মাজারের খাদেম ।

১৯১১

বর্ধমানের মাথরুন গ্রামের 'নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে' ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠ। স্কুলের প্রধান কিবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক(১৮৮২-১৯৭০)। স্থানীয় লেটো দলের জন্য বাংলা-উর্দু-ফারসী-ইংরেজী মেশানো ভাষায় কবিগান-পাচালী-প্রহসন নাটক ইত্যাদি রচনা। চাচা কাজী বজলে করিমের কাছে ফারসী ভাষা-সাহিত্যের পাঠ গ্রহণ।

১৯১২

আসানসোলের একটি চা-রুটির দোকানে চাকরি।

১৯১৪

ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাইস্কুলে ক্লাস সেভেনে-দরিরামপুওে বছরখানেক ছিলেন।

১৯১৫

সিয়ারসোল হাইস্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি-দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন এখানে। কবিতা চর্চা।

১৯১৭

দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে নাম লেখালেন ৪৯ নম্বর বাঙালী পল্টনে। নৌশোরের ট্রেনিং শেষে করাচিতে গেলেন। ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত।

১৯১৮

মাসিক 'সওগাত' (সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন) ও ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' (সম্পাদক ঃ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক) প্রকাশিত।

১৯১৯

সাহিত্যে প্রথম প্রবেশ। করাচি থেকে গল্প পাঠালেন, 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' 'সওগাত' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হলো। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি', 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'র শ্রাবণ ১৩২৬ সংখ্যায়।

১৯২০

দেশে ফিরে এলেন করাচি থেকে কলকাতায়। কলকাতায় অবস্থান প্রথমে বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-৭৬) সঙ্গে তাঁর মেসে, পরে কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের (১৮৮৯-১৯৭৩) সঙ্গে 'বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য-সমিতি'র অফিসের একটি ঘরে। রাজনীতিবিদ শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের (১৮৭৩-১৯৬২) অর্থানুকূল্যে নজরুল ও মুজাফ্ফর আহমদের যৌথ সম্পাদনায় সন্ধ্যা দৈনিক 'নবযুগ' -এর আত্মপ্রকাশ। মাঝে আশ্বিন মাসে দু দিনের জন্য বরিশাল থেকে বেড়িয়ে এলেন নজরুল ও মুজাফফর আহমদ। ওই বছরই নজরুল 'নবযুগ' ছেড়ে দেন। দেওঘর বেড়াতে গেলেন।

১৯২১

এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা বেড়াতে গেলেন। দৌলতপুরে আলী আকবর খানের ভাগ্নী সৈয়দা খাতুনের (নজরুল প্রদত্ত নাম-নার্গিস, পুরো নাম ঃ নার্গিস আসার খানম) সঙ্গে প্রণয়। ১৮ জুন বিয়ে। আলী আকবর খানের পরিবারের সঙ্গে নজরুলের বিরোধ এবং দৌলতপুর ত্যাগ। নার্গিসের সঙ্গে কখনো একত্রবাস করেননি, কিছু কবিতা-গানে তার স্মৃতিচিহ্ন আছে। অক্টোবরে শান্তিনিকেতনে ভ্রমণ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) সঙ্গে সাক্ষাত। নভেম্বর মাসে আবার কুমিল্লায় গমন। ভারতে প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর আগমনে প্রতিবাদ ও হরতাল। কুমিল্লায় প্রতিবাদী মিছিলে স্বরচিত গান গেয়ে নজরুলের অংশগ্রহণ। বছরের একেবারে শেষে রাত জেগে 'বিদ্রোহী' কবিতা লেখেন। প্রথম প্রবন্ধ 'তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা' 'সওগাত' পত্রিকার কার্তিক ১৩২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৯২২

বছরের প্রথমেই 'বিদ্রোহী' কবিতা ছাপার হরফে প্রকাশিত হলো সাপ্তাহিক 'বিজলী' (সম্পাদক ঃ নলিনীকান্ত সরকার) ও 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হলো। বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করণ এই কবিতা। 'বিদ্রোহী কবি' অভিধাটি নজরুলে সঙ্গে চিরকালের জন্য যুক্ত হয়ে গেল। প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ কাব্যগ্রন্থ ব্যাথ্যার দান প্রথম কবিতা গ্রন্থ অগ্নিবীণা, প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ যুগ-বাণী। ২৫ জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (জন্ম ঃ১৮৮২, মৃত্যু ঃ ১৯২২)। নজরুল কবিতা ও গান লিখলেন, শোকসভায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলেন ও গান গাইলেন। নজরুলের সম্পাদনায় অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' আত্মপ্রকাশ করণ, ১১ আগস্ট। ২৬ সেপ্টেম্বরের 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য 'ধূমকেতু' বাজেয়াপ্ত হলো এবং নজরুল গ্রেপ্তার হলেন। যুগ-বাণী বাজেয়াপ্ত। এ বছর দৈনিক 'সেবক' (সম্পাদক ঃ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ) পত্রিকায় অল্প কিছুদিনের জন্য কাজ করেছিলেন।

১৯২৩

৭ জানুয়ারী রচনা করলেন 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হলেন। অনশন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বসন্ত নাটক উৎসর্গ করলেন নজরুলকে। ডিসেম্বk মাসে নজরুল RwdÖtwxk kPdw KkËld kwRgëby Rgwdgëby„ GK gQËkk omÝi KwkwbË¡ bx¡Z pËld„ Admd„ kgyëbÝdwa Z^wk goìæ dwUK DuoMê KkËld dRkØlËK„ xWËo¹k iwËo dRkØl iÖ£ß pËld„ KwkwiÖx£ßk eËk ÌixbdyeÖËk ovgcêdw„ KlKwZw ÌaËK 'KËÁwl' (oóewbK : byËdmk™d bwm) eÞKwxmZ dRkØl ¢ßwxìæKwky iwxoK owxpZøeË¢k xdtxiZ ÌlLK„

১৯২৪

KlKwZwt AwmwlZw Ìod†®(dRkØl eÞb£ dwi 'eÞiylw')-k oËŠ dRkØËlk xgËt, 25 GxeÞl„ pwlrwt gogwo„ eÞai eÖ¢ AwRwb KwiwËlk Rdô- ÑmmËgB AKwliÙZÖø„ xgËnk g^wmy I hwOwk Mwd eÞKwËmk eËk-eËkB okKwk KZÚêK gwËRtw®„

১৯২৫

Ìbmg¬Ö xP£k™d bwËmk(Rdô 1870) iÖZÖø, 16 RÖd„ xP£dwiw eÞKwxmZ„ Kxg-k exkPwldwt ow®wxpK 'lwOl' ex¢Kwk eÞKwm, 16 xWËo¹k (15 GxeÞl 1926 ejêìæ ex¢Kw oPl)„

1926

1926 - 28 : GB xZd gQk KÚnä dMËk Agþÿwd„ 12 AwMýU ÌaËK 'lwOl' ex¢Kw 'MYgwYy' dwËi eÞKwxmZ pËZ awËK„ P›MÞwi, xoËlU, jËmwk I LÖldw ofk„ x§Zyt eÖ¢ gÖlgÖl (Axkëbi LwËlb)-Gk Rdô„ MRl kPdwk oÔ¢ewZ„ eÞai MRl 'gwxMPwt gÖlgÖxl ZÖB'„ 'Kwxl-Kli' (oóewbK : ÑmlRwdëb iÖËLwewcøwt, ÌeÞËiëbÝ xi¢ I iÖklyck goÖ) eÞKwxmZ„ dgejêwt iwxoK 'oIMwZ' (oóewbK : Ìiwpwiôb dwxokD¥yd) eÞKwxmZ„

1927

'iÖoxli-owxpZø-oiwR'-Gk gwxnêK AxcËgmËd AwixìèZ pËt XwKw ofk (ÌfgÞØtwxk)„ XwKw ÌaËK 'iÖoxli-owxpZø-oiwR'-Gk gwxnêK iÖLe¢ 'xmLw' (oóewbK : AwgÖl ÉËod) eÞKwxmZ„ XwKw ÌaËK 'eÞMxZ' (oóewbK : gÖ¦Ëbg goÖ) eÞKwxmZ„ KlKwZw ÌaËK Kxg ÌgdRyk AwpiËbk (1903-83) AaêwdÖKÔËlø iwxoK 'dIËkwR' (oóewbK : AwfRwl-Dl pK) eÞKwxmZ„ iwxoK 'Ìiwpwiôby' (oóewbK iIlwdw Ìiwpwiôb AwKkwi L^w) eÞKwxmZ„ dRkØl Gog ex¢Kwk xdtxiZ ÌlLK„

1928

'iÖoxli-owxpZø-oiwR'-Gk x§Zyt gwxnêK oËiôlËd XwKwt AwMid (ÌfgÞØtwxk)„ xioz fxRlwZÖËdíow (1899-1977), Diw Ñi¢ I kwdÖ ÌowËik (eÞxZhw goÖ) oËŠ exkPt„ MÞwËiwËfwd ÌKwóewdyk oËŠ jÖ£ß pËld„ ÌgZwkËKËëbÝk oËŠ jÖ£ß pd I ÌeÞwMÞwi KkËZ awËKd„ iwËtk iÙZÖø„ kveÖk I kwRmwpy ofk„ giêY ewgxxlxmv pwDo I xW· Gi· lwBËgÞky ÌaËK Kxgk ÌmÝÅ KxgZwovMÞp oxéZw-k bÖxU ÈZìè ovÆkY eÞKwxmZ - eÞaixU DuoMê Kkw pt xioz fxRlZÖËdíowËK„ gÖlgÖl MyxZMÞìÿ eÞKwxmZ Ggv Zwk MRlMwd†Ëlw ÌlwËKk iÖËL iÖËL xfkËZ awËK„

1929

xbdwReÖk ofk (RwdÖtwxk)„ gQËkk eÞaixbËK 'gÖlgÖl ÌowowBxU'k eqÌaËK iwde¢ eÞbwd Ggv Zwk Rgwxg বক্তৃতা „ P›MÞwi GWÖËKmd ÌowowBxUk eÞxZÅwgwxnêKyËZ ohwexZk AxhhwnY„ P›MÞwi ÌaËK oë§ye ofk„ KlKwZwk AwlgwUê pËl oiMÞ gwOwxl RwxZk eq ÌaËK 'RwZyt Kxg' kÕËe ovgcêdw„ ohwexZ : AwPwjê eÞfÖÁPëbÝ kwt (1861-1944)„ Ahøaêdw oxixZk ohwexZ : Go ItwËRb Awly (1879-1954)„ Kxgk ZÙZyt eÖ¢ KwRy ogøowPyk Rdô (iÙZÖø 1979)„ mPyëbÝdwwa Ìod†Ë®k k£ßKil dwUËKk Mwd kPdw I eÞhÔZ RdxeÞtZw„ dwUKxU dRkØlËKB

DuoMê Kkw pt„ idËiwpd xaËtUwËk AxhdyZ ixYlwl gËëbøwewcøwËtk RwpwŠyk dwUËKk GKxU Mwd dRkØËlk idôa kwËtk iÉtw dwUËKk Mwd kPdw I gøweK ÌlwKxeÞtZw„

1930

gÖlgÖËlk iÙZÖø (7/8 Ìi)„ eÞlt-xmLw I PëbÝxgëbÖ KxgZwMÞìÿ eÞKwxmZ I gwËRtw®„ iwxoK 'RtZy' (oóewbK : AwgbÖl Kwxbk) eÞKwxmZ„ idôa kwËtk KwkwMwk dwUËKkI GK†âQ oŠyZ kPdw KËkd„ ÈxdgêwxPZ oŠyZovMÞp dRkØl-MyxZKw eÞKwxmZ„

1931

21 ÌfgÞØtwxk 'iøwWwd xaËtUwoê xlxiËUW'-G 'oÖkhw¡wky' xdjÖ£ß„ dRkØËlk Qt iwËok Kwkwb¡wËbm, Ìmn ejêìæ GB Kwkwb¡wËbm KwjêKk ptxd„ KxdÅ eÖ¢ KwRy AxdkØË¦k Rdô (iÙZÖø 1974)„ 'dwUøxdËKZd'-Gk oËŠ jÖ£ß xQËld„ 'cÔeQwtw' dwËik GKxU PlxâP¢ exkPwldw (?) bwxRêxlv ¸iY„ Rwpwdwkw ÌgMi ÌP#cÖkyk oËŠ owqwu„ oblgËl bwxRêxlvËt kgyëbÝdwËak oËŠ owqwu„ ÈkxPZ AwËltw dwUK iéþÿ pËlw dwUøxdËKZËd„ cykwR h›wPwjê, dypwkgwlw eÞiÖL Axhdt KkËld„ dwUøxdËKZËd idôa kwËtk owxg¢y dwUËKk MyxZKwk I oÖkKwk xQËld dRkØl„ dwUøxdËKZËd AxhdyZ mPyëbÝdwa Ìod†Ë®k SËrk kwËZ dwUËK dRkØl AËdøk ÌlLw MwËd oÖkwËkwe KËkd„

1932

xokwRMË™ gŠyt iÖoxli ZkØY oËiôlËd ohwexZZò„

1933

3 xWËo¹k ewBIxdtwk ÌKwóewxdk xflô xWËk*ƒ*k xpËoËg PÖx£ßg¦„ GBP Gi xh ÌkKWê ÌKwóewxd ÌaËK eÖZÖËlk xgËt dwxUKw eÞKwxmZ„ iÖpiôb pwgygÖÁwp [pwgygÖÁwp gwpwk] I mwioÖd dwpwk [mwioÖd dwpwk iwpiÖb]- oóewxbZ 'gÖlgÖl' ex¢Kw eÞKwxmZ„ ÌjwËMm ÌP#cÖkyk 'iykwgwC' ÌkKWêdwËUø dRkØl-kxPZ Mwd„

1934

1 RwdÖtwxk dRkØl I oËZøëbÝdwa Ìb-exkPwxlZ 'cÝØg' QwtwQxg KlKwZwk '¢ßwDd UxK pwDËo' iÖx£ßeÞw®„ GB PlxâPË¢ Kxg dwkËbk Axhdt KËkd„ iÔlZ xQËld oŠyZ-exkPwlK„ MÞwËiwËfwd ÌkKËWêk ÌbwKwd 'Kl-MyxZ' þÿwed„ ÌjwËMmPëbÝ ÌP#cÖkyk eÞZwewxbZø ÌkKWê dwxUKwk 10xU MwËdk iËcø 5xU Mwd dRkØl kPdw KkËld„ ÌjwËMm ÌP#cÖkykB KÚnäoLw oÖbwiw ÌkKWê-dwxUKwt bÖxU Mwd„

1935

xeÞtdwa gËëbøwewcøwt-exkPwxlZ ‘ewZwleÖky’ QwtwQxgËZ MyZ kPdw I oŠyZ exkPwldw„ Kwxpdy : ÑmlRwdëb iÖËLwewcøwt„ dRkØl kxPZ xgËt gwxr ÌkKWê-dwxUKw eÞKwxmZ„ cyËkd bwo, xio gyYwewxY eÞiÖËLk Axhdt„ GB ÌkKWê-dwËUø AwúPjêityk oËŠ dRkØl xdËR GKxU Mwd ÌMËtxQËld„idôa kwËtk lwBly iRdÖ ÌkKWê-dwxUKwk oŠyZ kPdw„ eËkm iÖËLwewcøwËtk P¡ybwo ÌkKWê-dwUËK dRkØËlk xZdxU Mwd, gkbweÞodí bwm†Ë®k oÖhbÝw dwxUKwk QtxU Mwd dRkØËlk„ ÌkKËWê dRkØËlk dKmw ‘høwgwKwìæ’„

1936

fxkbeÖk ÌRlw iÖoxli Qw¢ oËiôlËd ohwexZZò„ GBP Gi xh ÌaËK ‘xgbøwexZ’ ÌkKWê-dwxUKw eÞKwxmZ„ GBP Gi xh ÌaËK idôa kwt-kxPZ oÖka-D¦wk ÌkKWê-dwxUKwt oŠyZkPxtZw I oÖk ovËjwRK„ idôa kwËtk dkËic ËkKWê-dwxUKwk e^wPxU Mwd dRkØËlk GBP Gi xh ÌaËK dRkØl-kxPZ CbÖl xfZk ÌkKWê-dwxUKw eÞKwxmZ„ kOipËl AxhdyZ oÖcyëbÝdwa kwpwk ogêpwkw dwUËK dRkØl-kxPZ owZxU Mwd„ kOipËl AxhdyZ ÌjwËMmPëbÝ ÌP#cÖkyk dëbkwdyk ovowk-G dwUøKwk-kxPZ MwËd oÖk xbËtxQËld dRkØl„

1937

PwkØ kwt-exkPwxlZ MÞËpk Ìfk QwtwQxgËZ ARt h›wPwËjêk (1906-43) MwËd oÖkwËkwe I oŠyZ exkPwldw„ KlKwZw ÌgZwkËKËëbÝ jÖ£ß pËld Kxg - AoÖþÿZwk AwËM ejêìæ jÖ£ß awËKd„ dwUøxdËKZËd AxhdyZ idôa kwËtk oZy dwUËK dRkØËlk bmxU Mwd„ xMxkmPëbÝ ÌNwËnk xglòiŠl ÌkKWê-dwUËKk oŠyZ kPxtZw I oÖkKwk dRkØl„

1938

dRkØl-kxPZ ÌbgyþçxZ ÌgZwËk oóeÞPwk„ ÌbgKyK×iwk goÖ (1898-1971)-exkPwxlZ ‘xgbøwexZ’ 2 GxeÞl KlKwZwk ‘xP¢w’ ËeÞqwMÙËp iÖx£ßlwh KËk„ Kwxpdy dRkØËlk„ ÌbgKyK×iwk goÖ-exkPwxlZ xpxëb ‘xgbøwexZ’ iÖ¹wB I KkwxPËZ xWËo¹Ëk eÞbxmêZ„ GBP Gi xh ÌaËK ÌkKWê-dwxUKw ‘RdôwÄiy’ eÞKwxmZ„ Ìbgb£ xflô eÞËjwxRZ MÞËpk Ìfk QwtwQxgËZ oŠyZ exkPwldw„ Kwxpdy : dËkmPëbÝ Ìod†®„ dËkmPëbÝ xi¢ (1888-1971)-exkPwxlZ kgyëbÝdwËak ÌMwkw QwtwQxgËZ oŠyZ exkPwldw„ dwUøxdËKZd AxhdyZ mPyëbÝdwa Ìod†Ë®k xokwRDË¥#lw dwUËKk Mwd kPdw I oÖk ÌjwRdw„ ÌkKWê-dwxUKwk oŠyZ I oÖk kPdw„ eÞYg kwËtk gYêËPwkw VwK×k ÌgZwk-dwxUKwt dRkØËlk GKxU Mwd„ xgkRwoÖëbky Ìbgyk iÙZÖø„ mkuPëbÝ PË›wewcøwËtk iÙZÖø„

1939

eÞiylw dRkØl eqwNwËZ Aw¢ßwìæ„ Iþæwb RxikØ¥yd Lw^k iÙZÖø DelËq AwËtwxRZ ÌmwKohwt ohwexZZò„ ÌbgKyK×iwk goÖ-exkPwxlZ oweÖËr QwtwQxgk Kwxpdy kPdw- 27 Ìi KlKwZwk 'eÔYê' ËeÞqwMÙËp iÖx£ß„ MyxZKwk dRkØl I ARt h›wPwjê„ Gk xpxëb owËerw QwtwxP¢l ÑZxk pËtxQl„ ÈkxPZ icÖgwlw dwUK dwUøhwkayËZ iéþÿ pt„ kwcwkwdy, pxkixZ, Rpk MwŠÖxl, kgyd gËëbwewcøwt eÞiÖL Axhdt KËkd„ GBP Gi xh ÌaËK dRkØl-kxPZ eÖkËdw glb dZÖd gD Ggv AwÁwk kpi dwUK bÖxU eÞKwxmZ„ Kxg-kxPZ xgRtw I pkxeÞtw ÌgZwËk oóeÞPwk„ ÌgZwËk RMu NUËKkB SÖld dwxUKwt e^wPxU Mwd dRkØËlk„ eÞYg kwËtk ÌgZwk-dwUK Rgw I Pëbd-G dRkØËlk owZxU Mwd„ xidwhêw xaËtUwËk AxhdyZ iËpëbÝ †Ë®k kx…dyxild ÌkKWê-dwUËKk Mwd†Ëlw xQl dRkØËlk ÌlLw„

1940

KlKwZwt Ñotb BoiwBl ÌpwËod xmkwRy (1880-1931)-k dwËi eÞxZxÅZ 'xmkwRy ewgxlK lwBËgÞky I xfÝ xkxWv kØi'-Gk §wËkwbzNwUd„ G gQk ÌgZwËk dRkØËlk kPdw I eÞËjwRdwt 'dgkwMiwxlKw' dwËi dRkØl-oÙÄ dZÖd kwM-kwxMYy ovgxlZ AdÖÅwd oóeÞPwk„ iÖoxli BëoxUxUDU pËl বক্তৃতা„ ÑmlRwdëb iÖËLwewcøwt (1901-76)- exkPwxlZ 'dxëbdy' QwtwQxgk MyZ kPdw- GB QwtwQxg 8 dËh¹k KlKwZwk 'eÔYê' ËeÞqwMÙËp iÖx£ßeÞw®„ ÑmlRwdëb iÖËLwewcøwt (1901-76)-exkPwxlZ Axhdt dt PlxâPË¢k AdøZi MyxZKwk„ ÌgZwËk dRkØl-kxPZ KwËgky-ZyËk MyxZdwUø oóeÞPwk„ AwKwmgwYy ÌaËK ÌQwUËbk RwËMw oÖëbk xPk xKËmwk dwUK oóeÞPwxkZ„ GBP Gi xh ÌaËK gËdk ÌgËb ÌkKWê-dwxUKw eÞKwxmZ- MyxZKwk I oÖkKwk dRkØl„ idôa kwËtk Kwfd-ËPwkw ÌkKWê-dwËUøk Mwd†Ëlw dRkØËlk„ ÌgZwËkk ¢Ëtwbm eÞxZÅwgwxnêKyËZ eÞPwxkZ pt dRkØl-kxPZ MyxZxP¢ AwKwmgwYy„ oÖkwËkwxeZ 'owkŠ-kŠ' ÌgZwËk oóeÞowxkZ„ gkbwPkY iRÖibwËkk iÙZÖø„ xidwhêw xaËtUwËk AxhdyZ ixYlwl gËëbøwewcøwËtk AdíeÔYêw dwUËK 14xU Mwd dRkØËlk„ xidwhêwt AxhdyZ AwmÖËZwn oøwdøwËlk gxëbdy dwUËKk oÖkKwk dRkØl Ggv GKxU MwËdk kPxtZw„ xidwhÌê AxhdyZ mPyëbÝdwa Ìod†Ë®k pkewgêZy dwUËKk MyxZKwk I oÖkKwk dRkØl„ ÌbËgëbÝdwza gwpwk ARêÖd xgRt dwUËKk MyxZKwk I oÖkKwk„

1941

ÌmËk-gwvlw G ÌK fRlÖl pËKk DËbøwËM eÖd:eÞKwxmZ ÑbxdK 'dgjÖM'-Gk eÞcwd oóewbK xpowËg ÌjwMbwd„ 16 iwPê gdM^wk owxpZøohwt ohwexZZò„ 5 I 6 GxeÞl 'iÖoxli BëoxUxUDU pËl' 'gŠyt-iÖoliwd-owxpZø-oxixZk kRZRtìæy AdÖÅwËd ohwexZZò „ 25 Ìi Kxg jZyëbÝËiwpd gwMPyk (1878-1948) ohwexZËZò dRkØËlk

RËdôwuog„ 12 RÖlwB Zwkwm‰k gËëbøwewcøwËtk (1898-1971) Kwxlëby DedøwËok ÈKÚZ dwUøkÕe Kwxlëby AxhdyZ pËlw dwUøxdËKZËd- GB dwUËKk Mwd†Ëlw kPdw KkËld dRkØl„ GBP Gi xh ÌaËK dRkØl-kxPZ xglwZy ÌNwrwk gwâPw I gwOwxlk NËk xpxëb Mwd ÌK#Z×K-dwxUKw§t eÞKwxmZ„ ÌgZwËk oóeÞPwxkZ mPyëbÝdwa Ìod†Ë®k pkewgêZy dwUËKk MyxZ†ËâQk kPxtZw I oÖkKwk dRkØl„ 7 AwMýU kgyëbÝdwa VwK×Ëkk ipweÞtwY„ G DelËq ÌmwKoìæ® dRkØËlk KxgZw I Mwd kPdw, AwKwmgwYy ÌaËK ÈKËŸ KxgZw I oŠyZ oóeÞPwk„ dRkØl-kxPZ ‘mwkbmÝy’ ÌgZwk oóeÞPwk„ xidwhêwt AxhdyZ gyËkëbÝKÚnä hËbÝk göøwKAwDU eÞpoËdk bÖxU Mwd dRkØËlk „ ÑmlRwdëb iÖËLwewcøwt-exkPwxlZ dxëbdy QwtwQxgËZ dRkØËlk GKxU Mwd„

1942

xpxëb ÌP#kŠy QwtwQxgËZ MyZ kPdw- 4 RÖlwB iÖx£ßeÞw®„ gwvlw ÌP#kŠy QwtwQxgËZ oŠyZ exkPwlK-12 ÌoËïU¹k iÖx£ßeÞw®„ AoÖþÿ I ¢ßim gwKmx£ßkxpZ„ lÖx¹dy ewKê I k^wxPk iwdxoK pwoewZwËl gøaê xPxKuow„

1943

ËeÞiw‰Ök AwZayê exkPwxlZ ‘xbKmÔl’ QwtwQxgËZ dRkØËlk bÖxU Mwd„ Kwxpdy : DËeëbÝdwa MËŠwewcøwt„

1944

gÖ¦Ëbg goÖ (1908-74)-oóewxbZ ‘KxgZw’ ex¢Kwk ‘dRkØl-ovLøw’ (KwxZêK-Ëe#n 1651)„ 10 : 2 eÞKwxmZ„

1945

KlKwZw xgmòxgbøwlt-KZÚêK ‘RM£wxkYy ÈYêebK’ eÞbwd„ ÑmlRwdëb iÖËLwewcøwt exkPwxlZ Axhdt dt QwtwQxgËZ dRkØËlk GKxU Mwd„

1946

dRkØËlk exkgwËkk oboøw Z^wk mwmÖry xMxkgwlw Ìbgy xdkØË¥m„

1949

Kxg-oóexKêZ eÞai MÞìÿ KwRy AwgbÖl IbÖb (1884-1970)-Gk dRkØl-eÞxZhw (giêY ewgxlxmv pwDo, KlKwZw) eÞKwxmZ„

1953

Bvløw« I RwiêwxdËZ gøa ê xPxKuow 10 Ìi xgËbËm xMËtxQËld, 15 xWËo¹k ÌbËm xfkËld„

1960

hwkZ okKwk-KZÚêK ‘ebôhÔnY’ Dewxc bwd„

1966

dRkØl-kPdwgly eÞai L¡ eÞKwxmZ pËlw„ Kxgk iÙZÖøk ek 1984 owËl (eéi L¡, x§Zytwcê) eÞwaxiKhwËg oiMÞ dRkØl-kPdw ovKld oóeÔYê pt „ GB kPdwglyk oóewbK AwgbÖl Kwxbk (1906-84)„ bm gQk ek (1993) dRkØl-kPdwgly dZÖdhwËg Pwk LË¡ eÖd:oóewxbZ pt dtËdk GKxU oóewbdw-exknb-KZÚêK- GB oóewbKi¡lyk ohwexZ AwxdoÖŒwiwd„

1969

kgyëbÝhwkZy xgmòxgbøwlt-KZÚêK oiôwdoÔPK xW·xlU· Dewxc bwd„

1972

24 Ìi gwvlwËbm okKwËkk AwiìèËY ÌRøÅ eÖ¢gcÔ Diw KwRy I AdøwdøÈRdoËiZ gwvlwËbËm AwdyZ„

1974

XwKw xgmòxgbøwlt KZÚêK xW·xlU· Dewxc eÞbwd„

1976

gwvlwËbm okKwk-KZÚêK 'GK×Ëm ÌfgÞØtwxk ÈYêebK' bwd„ iÖZÖø Ìglw 11Uw, 29 AwMýU, 12 hwbÝ 1383, Ìkwggwk„ xe·xR· pwoewZwl, XwKw„ ÌoxbdB oËgêwâP kwÄÝyt oiôwËdk oËŠ XwKw xgmòxgbøwlt ioxRb ovlMí ÌMwkþÿwËd oiwxpZ Kkw pt„

তথ্য-নির্দেশ

১. নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পূনর্মুদ্রন : ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-২০৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৯-২১২।

৩. নজরুল ইসলাম কিশোর জীবনী, হায়াদ মামুদ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, পৃষ্ঠা-৮।

৪. নজরুল চরিত মানস, ড.সুশীল কুমার গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল-২০০৭, পৃষ্ঠা-৩৮।

৫ নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, চাষার সঙ, সংগ্রহ ও সম্পদনা : রশিদুন্ নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর-২০০৬, পৃষ্ঠা-৩৯১।

৬. প্রাগুক্ত, কবির লড়াই, পৃষ্ঠা-৮৯৭।

৭. প্রাগুক্ত, আসর বন্দনা, পৃষ্ঠা-৯১২।

৮. প্রাগুক্ত, শকুনি বধ, পৃষ্ঠা-৭৭৬।

৯. প্রাগুক্ত, মেঘনাদ বধ, পৃষ্ঠা-৯১৪।

১০. প্রাগুক্ত, যজ্ঞের ঘোড়া, পৃষ্ঠা-৯১৫।

১১. প্রাগুক্ত, রাজা জয়চাঁদের ধর্ম পরীক্ষা, পৃষ্ঠা-৯১৪।

১২. কাজী নজরুল ইসলাম, জীবন ও সৃজন, রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইনস্টিটিউট, ফেব্রুয়ারী-২০১২, পৃষ্ঠা-৩৪।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫।

১৪. নজরুলের জীবনবোধ ও চিন্তাধারা, তাহা ইয়াসিন, নজরুল ইন্সটিটিউট, মে-২০১৩, পৃষ্ঠা-৮৩।

১৫. নজরুল জীবনী, অরুণ কুমার বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী-২০০০, পৃষ্ঠা-৩০।

১৬. নজরুল জীবনচরিত, ড. মিলন দত্ত, প্রসাদ লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭৬. পৃষ্ঠা-২২।

১৭. জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কল্পতরু সেনগুপ্ত, প্রকাশকাল : জানুয়ারী-১৯৯২, পৃষ্ঠা-১১৮।

১৮. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৩৭।

১৯. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২২১।

২০. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬৮।

২১. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, মরণ-বরণ, পৃষ্ঠা-৬৯০।

২২. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮৪।

২৩. নজরুল-চরিতমানস, ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং. কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৯৩। [সূত্র : কবি নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আমার স্মৃতিকথা, মুজফফর আহমদ, শারদীয় বিংশ শতাব্দী, আশ্বিন-১৩৮০, পৃষ্ঠা-৩১৪।]

২৪. নজরুল ইসলাম সম্পাদক-সাংবাদিক এবং পত্র পত্রিকায়, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক : অনুরূপ কানুনগো, দম্‌দম্‌, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুন-১৯৯৯, পৃষ্ঠ-৯।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুলের গানে দেশপ্রেম ও উদ্দীপনা

বাংলাগানের ইতিহাসে কাজী নজরুল ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাগানের গবেষকদের ধারণা, কবি নজরুলের চেয়েও গীতিকার ও সুরকার নজরুল অনেক বড়। অর্থ্যাৎ নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতিভা সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যতটা রেখেছেন, অন্য কোন ক্ষেত্রে ততটা নয়। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সভার অভিভাষণে নজরুল নিজেই বলেছেন, 'কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল সহজভাবে বলেছি। আমি যা অনুভব করেছি তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্তিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন। এ বিশ্বাস আমার আছে'।[১] নিঃসন্দেহে নজরুলের সচেতনতার প্রমাণ এ কথাগুলো।

বাংলাগানের ধারায় দেশপ্রেমমূলক ও উদ্দীপনামূলক বা স্বদেশচেতনামূলক গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাগানের বহুমূখী প্রতিভার ধারক নজরুল ইসলাম দেশাত্ববোধক গানের ধারাতেও রেখেছেন অবিস্মরণীয় অবদান। দেশবোধের নানা উপধারায় তিনি যেমন অসংখ্য গান লিখেছেন, তেমনি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় এ ধরনের গানের বাণী ও সুরের ক্ষেত্রে। তবে দেশপ্রেম, দেশবন্দনা, উদ্দীপনা, স্বদেশী প্রভৃতি ধারার গান বাংলাগানের ইতিহাসখ্যাত পঞ্চগীতিকবিদের মধ্যে রবীন্দ্র পরবর্তী দ্বীজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেন কিছু কিছু অবদান রেখেছেন। তবে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা ভাষার আর কোন সঙ্গীতকার দেশপ্রেমমূলক, স্বদেশচেতনামূলক, উদ্দীপনামূলক গানে এই সাফল্য দেখাতে পারেননি।

অভিসন্দর্ভের বর্তমান অধ্যায়ে নজরুলের দেশপ্রেম বা দেশবন্দনামূলক গানগুলি এবং উদ্দীপনামূলক বা আত্মশক্তিমূলক গানগুলিকে বিভিন্ন উপ-বিভাগে ভাগ ক'রে সেগুলির বিষয়, বাণী, সুর ও সুর-উৎস সম্পর্কে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে তার পূর্বে নজরুলের এই শ্রেণীর গান সম্পর্কে সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

কাজী নজরুল ইসলাম ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে কখনো মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর চেতনায় ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ হঠাও– এই মন্ত্র সর্বদা সক্রিয় ছিল। কারণ, 'পরাধীন ভারতবাসীর প্রতিরোধ অতি উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে যার মধ্যে তাঁর নাম কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গীতের প্রকৃতি আলাদা। তাঁর অনুভূতির পরিমন্ডল অনেক ব্যাপক। জাতীয় জীবনের নানা স্তরে পুঞ্জীভূত পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের

আগুন জ্বলেছে সে পরিমন্ডলে। ভারত-মনের ব্যাথ্যা বেদনার উগ্ররসে তাঁর হৃদয় পাত্রটি হয়ে উঠেছে ভরপুর'।[২]

মূলতঃ কাজী নজরুল ইসলাম দেশ ও দেশের মানুষকে বেশী ভালবাসতেন। দেশের সেই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার হাতিয়ার হিসাবে নজরুল ইসলাম গানকে মাধ্যম করেছিলেন অতি দক্ষতার সাথে। বাংলাগানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, 'বাংলা দেশাত্ববোধক গানের ধারায় স্বর্ণোজ্জ্বল অবদানের জন্য কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর গান-বিপুলতা, বৈচিত্র্য ও গভীরতার জন্য সমসাময়িক কালে যেমন অভিনন্দিত হয়েছে, পরবর্তী কালেও তা বাঙালি দেশাত্ববোধকগীত রচয়িতাদের অনুপ্রানিত করেছে। ভাষার সুরে ও ছন্দে কাজী নজরুল ইসলাম তার দেশাত্ববোধক গীতমালাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন যে, তা শুধু সমকালীন আকাঙ্খাকেই পরিতৃপ্ত করেনি, দেশচেতনার স্থায়ী অনুভবকেও ধারন করতে সক্ষম হয়েছে'।[৩]

'নজরুলের মৌলিক সঙ্গীত প্রতিভার স্ফুরন ঘটে ১৯২১ থেকে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। এ সময়টা ছিল ইংরেজ বিরোধী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন এবং সন্ত্রাসবাদের যুগ। নজরুল এ সময় কলকাতার বাইরে কুমিল্লায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আলোচ্য সময়ে রচিত গানগুলির মধ্যে 'ঘোর রে ঘোর আমার সাধের চরকা ঘোর', 'এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল', 'আজি রক্ত নিশি ভোরে একি এ শুনি ওরে', 'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ নবযুগ ঐ এলো ঐ', 'জাতের নামে বজ্জাতি জাত জালিয়াত খেলছো জুয়া', 'কারার ঐ লোহ কপাট' প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ সঙ্গীতে নজরুলের মৌলিক বৈশিষ্ট্য প্রথম ফুটে ওঠে ঐ সময় রচিত স্বদেশী ও উদ্দীপনামূলক গানের মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গক্রমে উপরে উল্লেখিত গানগুলির বাণী, বক্তব্য, সুর ও আবেগের বলিষ্ঠতা লক্ষণীয়। যদিও প্রচলিত স্বদেশী গানের ভাব ও সুরের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি ক'রে গানগুলি রচিত'।[৪] কিন্তু নজরুল এ গানগুলিতে যে পৌরুষ, যে বলিষ্ঠ আবেগ সঞ্চার করেছেন বাংলা দেশাত্ববোধক বা উদ্দীপনামূলক বা জাগরনী গানের তা এক অভিনব সংযোজন।

'নজরুল ইসলাম ভাবোদ্দীপক ও দেশপ্রেম মূলক গানও বিস্তর লিখেছেন। তাঁর ভিতর একক ও সম্মেলক [কোরাস্] এই দুই বর্গের গানই আছে। এই পর্যায়ের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গান হলো– 'কারার ঐ লৌহ-কপাট, ভেঙে ফেল্ কর্ রে লোপাট', 'এই শিকল-পরা ছল', 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর', 'আজি রক্তনিশি ভোরে', 'দূর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে' ইত্যাদির মধ্যে শেষের কোরাস্ গানটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম। এমন কোরাস্ গান লাখে না মিলায় এক'।[৫]

'নজরুলের স্বদেশী গানের ছত্রে ছত্রে যে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়েছে, পরাধীনতার নাগপাশে বাধা নির্জীব দেশবাসীকে উদ্দীপিত তথা উজ্জীবিত করার আহবান শোনা গেছে, তা পৃথকভাবে

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। তাঁর চল্-চল্-চল্ উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল, দর্গম-গিরি কান্ডার মরু, আমরা শক্তি আমরা বল্, মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম প্রভৃতি উদ্দীপক গানগুলির ভাব, ভাষা ও সুর শুনলে রক্ত টগবগ ক'রে ওঠে'।[৬]

'নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের কবি, আবার সুরেরও কবি। বিদ্রোহের গানে তাই তাঁর ফুটে উঠেছে ভাঙ্গার আবেগ। তাই বাঁধন ছেঁড়ার প্রবণতা, আবার সুরের কবি নজরুলের সৃষ্টিতে পরিস্ফুটিত হয়েছে সৌন্দর্য্যময় পৃথিবী ও ঐক্যের পৃথিবীর আর একটি চিত্র। দারিদ্রের কবি নজরুলের বিদ্রোহমূলক গানের পশ্চাতে ছিলো তার সাম্যের বাণী, ঐক্যের ধ্যান, শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন ক'রে সমাজ গড়ার স্বপ্ন। তাই তার বিদ্রোহমূলক এবং স্বদেশী চেতনার গানগুলিতে ফুটে উঠেছে বিদ্রোহের সুর এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার হুংকার'।[৭]

সমালোচকগণের উল্লেখিত আলোচনা থেকে তিনটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট। আর তা হলো–

১. বাংলা দেশাত্ববোধক গানের ধারায় নজরুল-প্রতিভা অনন্য অসাধারণ।

২. নজরুল বৈচিত্র্যধর্মী অনেক দেশাত্ববোধক গান রচনা করেছেন।

৩. তাঁর দেশাত্ববোধক গান পরাধীন ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করেছে স্বাধীনতার স্বপ্নে।

ষোল শতকের শুরুতে শ্রীচৈতন্যদেব [১৪৮৬-১৫৩৩] বাংলায় যেমন প্রেমধর্মের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন এবং এ জোয়ারে ভ'রে গিয়েছিল বৈষ্ণব গীতিকবিতা ও পদাবলী কীর্ত্তন। নজরুল তেমনি বিশ শতকের স্বদেশপ্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বাংলা সঙ্গীত। তিনি শুধু নিজেই স্বদেশ চেতনামূলক সঙ্গীত রচনা করেননি, অন্যদেরকে অনুপ্রাণীতও করেছেন। যার ফলে পরবর্তীকালে বাংলা গণসংগীত ধারার সূচনা সম্ভব হয়েছিল। তবে শ্রীচৈতন্য দেবের সঙ্গে নজরুলের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আর তা হল চৈতন্যদেব নিজে এক লাইন না লিখেও উজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন। আর নজরুল লিখে, গেয়ে, পত্রিকা প্রকাশ করে, বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে শৃঙ্খল ও শোষণ মুক্তির আহবান জানিয়েছেন। নজরুল ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রচনা করেছেন দেশাত্ববোধক গান। অর্থ্যাৎ মাত্র এক যুগ বা তার বেশি তিনি নিয়োজিত ছিলেন এই ধারার সঙ্গীত সাধনায়। কোন কোন গবেষক এই সময়কালটিকে আরও সংক্ষিপ্ত ক'রে ১৯২০-১৯২৬ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন যৌক্তিক কারণেই। কিন্তু ১৯৪২ সালে চীনা নেতার আগমন উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম 'চীন ও ভারতে মিলেছে আবার' গানটি রচনা করেছেন। নজরুলের দেশপ্রেম, উদ্দীপনা, জাগরণী ও সাম্যবাদমূলক গান প্রায় দুইশতাধিক।

নজরুল চিরটাকালই ছিলেন উদাসীন। তাঁর লেখা সংরক্ষণ ক'রে রাখার ব্যাপারে সর্বত্রই তার উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। কালের বিবর্তনে তাঁর অনেক সৃষ্টিই খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনও দেখা গেছে যে, রিহার্সাল রুম থেকে তাঁর গানের খাতার হদিস্ আর মেলেনি। অনেকেই চুরি ক'রে নজরুলের লেখাকে নিজে লেখা ব'লে

চালিয়ে দিয়েছেন। এ কারণে সঠিক হিসাব জানা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। যদিও 'নজরুল গীতি' অখন্ড গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এই সংখ্যা ১১৫টি ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবে আরো অনেক বেশী হবে ব'লে গবেষণায় মনে হয়েছে।

মোটামুটি এই অভিসন্দর্ভে ১৩৫টি গানের তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে এটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়। নিখুঁত গবেষণার মাধ্যমে এই তালিকা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। এখানে নজরুলের দেশপ্রেমমূলক আর উদ্দীপনামূলক গানগুলিকে শ্রেণীকরণ, ভাবাবেগ, উৎস, রচনাকাল প্রভৃতি এ ধরনের কিছু বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে গানগুলি সাজানো হয়েছে।

দেশপ্রেমমূলক গান

সোজা কথায় দেশের প্রশস্তিমূলক গানই দেশপ্রেমমূলক গান বা দেশবন্দনামূলক গান। নজরুল ইসলাম তাঁর মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে প্রচন্ড ভালবাসতেন, তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই ধারার সব গান। এখানে দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা, আবেগ, উৎকণ্ঠা আভাসিত হয়েছে বন্দনার মাধ্যমে। মানুষ যেমন ঈশ্বর বা গুরুবন্দনা করে, নজরুল তেমনি গানের মধ্যদিয়ে মাতৃসম মাতৃভূমির বন্দনা করেছেন। তার পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ডিএল রায় প্রমুখ এই ধারায় সঙ্গীত রচনা করেছেন। মূল বিষয় দেশ বন্দনা হলেও এর মধ্যে দেশের গৌরববোধ, জন্মভূমির ঋণস্বীকার, শ্রদ্ধাপ্রকাশ, মাটির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা প্রভৃতি ফুটে উঠেছে। নজরুল এই দেশ বন্দনামূলক গানগুলি যখন রচনা করেন প্রায় একই সময়ে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানও রচনা করেছেন। কিন্তু কী আশ্চর্য যে, উভয় ধারার গানের বাণী ও সুরের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। প্রথমটিতে শান্ত-স্নিগ্ধ প্রশান্তি বাণী ও সুর। দ্বিতীয়টিতে উচ্চগ্রামের সুরের পাশাপাশি বাণীর তেজোদ্দীপ্ত ভাব। শুধু বিদ্রোহী বা বিপ্লবী সত্তাই নজরুলের এ ধরনের গানে যে প্রধান বিষয়, তা কিন্তু নয়। এর বাইরেও শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের সোনার ছেলে, কার অপরূপ রূপে যে মুগ্ধ তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

'নজরুল রচিত দেশবন্দনামূলক গানের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এ গানের বাণীর অংশটি যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। এখানে বাণীর প্রমিত গীতচিত্র দৈর্ঘ্য রক্ষা পেয়েছে। অনেক সংগ্রামী গানের ক্ষেত্রে নজরুল বাণীর প্রমিত দৈর্ঘ্য রক্ষা করতে পারেননি। তবে সুর রচনায় রসসম্মত ভাব এখানে কোমল ও মধুর। 'আমার দেশের মাটি' গানটিতে বাউল সুরের ব্যবহার যেমন প্রাণ মাতানো, তেমনি 'উদার ভারত সকল মানবে' গানটিতে মিশ্র কানাড়ার প্রয়োগ অত্যন্ত মধুর, গভীর ও মর্মস্পর্শী'।[৮]

প্রাক বঙ্গভঙ্গ যুগে দেশ বন্দনামূলক বাংলাগানের ধারায় বিশিষ্ট সংগীতরূপে পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বন্দেমাতরম্ গানটিকে। এছাড়া দেশপ্রেমমূলক গানের অসামান্য ধারা, অসামান্য বিশিষ্টতা, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন ও কালী প্রসন্ন কাব্য বিশারদদের রচনায় আরো দেখতে পাওয়া যায়। দেশপ্রেমমূলক গান সেই সময়ের সমসাময়িকতাকে অতিক্রম ক'রে

দেশবোধের চিরকালীন সংগীতে পরিণত হয়। দেশকে মায়ের আসনে বসিয়ে দেশের বন্দনা, দেশের দুঃখে দুখী হওয়া, দেশের সৌন্দর্যে বিমোহিত হওয়া, দেশের দূর্দশায় আতংকিত হয়ে পড়া, দেশের সীমানাকে রক্ষা করবার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা, দেশকে ঈশ্বরের আসনে বসানো– এর সবকিছুই দেশপ্রেমমূলক গানের মূল উপজীব্য বিষয়। অনেক সময় একটি গানে একাধিক বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটেছে। যদিও দেশাত্মবোধক সংগীত রচয়িতারূপে নজরুলের প্রতিভার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে তার সংগ্রামী গানে। তবে দেশপ্রীতির মাধুর্যমন্ডিত সংগীত রচনায়ও তিনি উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করেছিলেন। আলোচ্য ধারায় নজরুলের বেশকিছু কালজয়ী দেশ প্রেমমূলক গানের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনাসহ নিম্নে প্রদান করা হলো –

১. শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয় রে আয় ঃ গ্রন্থ : সুরসাকী, রাগ : খাম্বাজ মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭০২৩, রেকর্ড প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৩২, শিল্পী : ধীরেন দাস, স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল সংগীত স্বরলিপি, তৃতীয় খন্ড, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

২. নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম ঃ গ্রন্থ : বনগীতি, প্রকৃতি : স্বদেশী গান, রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-২৩১৯, রেকর্ড প্রকাশকাল : ডিসেম্বর-১৯৩২, শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন, স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, সপ্তদশ খন্ড, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

৩. একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী ঃ গ্রন্থ : গানের মালা, রাগ : বেহাগ মিশ্র, তাল : কাহার্‌বা। [এক] রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-২৮২১, রেকর্ড প্রকাশকাল : জুলাই-১৯৩৩, শিল্পী : মাস্টার কমল, শ্রেণী : আগমনী, স্বরলিপি-গ্রন্থ : সুরলিপি, প্রকাশক : ডিএম লাইব্রেরী, কলকাতা, ভারত। সূত্র : রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে কবির ১২.১২.১৯৩৫ তারিখের চুক্তিপত্র। [দুই] রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-৪২১২, রেকর্ড প্রকাশকাল : জানুয়ারী-১৯৩৬, শিল্পী : রেনু বসু। স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল সুরলিপি, নবম খন্ড, ঢাকা।

৪. ও-ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি, আমার দেশের মাটি ঃ গ্রন্থ : গুলবাগিচা, শ্রেণী : দেশাত্ববোধক বাউল, তাল : লোফা। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭০৯৭, রেকর্ড প্রকাশকাল : এপ্রিল-১৯৩৩, শিল্পী : গোপাল সেন। স্বরলিপি-গ্রন্থ : সুরলিপি, ডিএম লাইব্রেরী, কলকাতা, ভারত।

৫. গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ঐ ঃ গ্রন্থ : গুলবাগিচা, শ্রেণী : দেশাত্ববোধক, রাগ : খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা, শিরোনাম : কই সে আগের মানুষ কই। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭০৯৭, রেকর্ড প্রকাশকাল : এপ্রিল-১৯৩৩, শিল্পী : গোপাল সেন, স্বরলিপি-গ্রন্থ : সুরলিপি, ডিএম লাইব্রেরী, কলকাতা, ভারত।

৬. আমার সোনার হিন্দুস্থান! দেশে দেশে নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ ঃ গ্রন্থ : সুরসাকী, রাগ : পাহাড়ী মিশ্র, তাল : কার্ফা [কাহার্‌বা], রেকর্ড প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর-১৯৩৩, রেকর্ড নম্বর : মেগাফোন, জেএনজি-৬৫, শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ।

৭. উদার ভারত! সকল মানবে দিয়াছ তোমার কোলে স্থান ঃ গ্রন্থ : সুরসাকী, রাগ : কানাড়া মিশ্র, তাল : একতাল। রেকর্ড নম্বর : মেগাফোন, জেএনজি-৬৫, রেকর্ড প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল স্বরলিপি, দশম খন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত।রেকর্ড বুলেটিনে মন্তব্য, 'শরতে কার কথা বাঙালীর মনে প্রথম জাগে ? জগত জননী জীবধাত্রী মা। আমাদের সকলের মা– এই তেত্রিশ কোটি জীবের ধাত্রী আমাদের দেশ হিন্দুস্থান, সোনার হিন্দুস্থান। শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ লাহিড়ীর এই দুইটি অপূর্ব সঙ্গীতে মার সেই অপরূপ স্নেহময় রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দুইটি সঙ্গীত অর্থ্যাৎ আলোচ্য গান ও 'আমার সোনার হিন্দুস্থান' গান।

৮. এই আমাদের বাংলাদেশ, এই আমাদের বাংলাদেশ ঃ গ্রন্থ : বাংলা নাটকে নজরুল ও তার গান, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, কলকাতা, ভারত। সূত্র : রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে কবির সম্পাদিত ২৪.১.১৯৩৫ তারিখের চুক্তিপত্র। রেকর্ড-নাটিকা : প্রতাপাদিত্য, নাট্যকার : যোগেশ চৌধুরী, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭২৭৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর-১৯৩৪, তাল : দাদ্‌রা, শিল্পী : একদল তরুণ, স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, আটাশতম খন্ড, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

৯. এসো মা ভারত-জননী আবার জগৎ-তারিণী সাজে ঃ গ্রন্থ : সুরসাকী, রাগ : জৌনপুরী, তাল : একতাল, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি পি-১১৭৫৫,রেকর্ড প্রকাশকাল : অক্টোবর-১৯৩২, শিল্পী : কে. মল্লিক

১০. জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা ঃ গ্রন্থ : গানের মালা, রাগ : মিশ্রসুর, তাল : একতাল, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭৩৭১, রেকর্ড প্রকাশকাল : জুন-১৯৩৫, শিল্পী : দেববালা দাসী।

১১. ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায় টেনে নে না তারে কোলে ঃ গ্রন্থ : নজরুল গীতি-অখন্ড, রেকর্ড প্রকাশকাল : জুন-১৯৩১, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৩৫০৮, শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, স্বরলিপি-গ্রন্থ : [এক] নজরুল স্বরলিপি, দশম খন্ড, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত।, [দুই] নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, নবম খন্ড, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

১২. ভারত-লক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে ঃ গীতি-সূত্র : [১] নজরুল সঙ্গীত সম্ভার, ঢাকা; [২] সুরকার, ডিএম, লাইব্রেরী ও [৩] রেকর্ড বুলেটিন। স্বরলিপি : সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা পত্রিকা, আশ্বিন-১৩৪০ সংখ্যা, রাগ ঃ সুঘরাই-কানাড়া, তাল : কাওয়ালী, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭১৫৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৩৩, শিল্পী : কে. মল্লিক, বিষয় : আগমনী, স্বরলিপি-গ্রন্থ : সুরমুকুর, ডিএম লাইব্রেরী, কলকাতা, ভারত। গ্রন্থ-সূত্র : [১] নজরুল গীতি-অখন্ড,হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত এবং [২] নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। উল্লেখ্য যে, গানটি নজরুলের সুস্থাবস্থায় কোন গীতি-গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি।

১৩. ভারত-লক্ষ্মী আয় মা ফিরে দুঃখ রাতের তিমির হরি ঃ গীতি-সূত্র : রেকর্ড বুলেটিন, রেকর্ড নম্বর :এইচএমভি এন-৩১০৬৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : আগস্ট-১৯৪৯, শিল্পী : সত্য চৌধুরী, গ্রন্থ-সূত্র : নজরুল স্বরলিপি, ষষ্ঠ খন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত।

১৪. সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায় ঃ গ্রন্থ-সূত্র : গীতিশতদল, রাগ : খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭২০৩, রেকর্ড প্রকাশকাল : মার্চ-১৯৩৪, শিল্পী : মিস্ অনিমা। স্বরলিপি-গ্রন্থ : [১] নজরুল স্বরলিপি, চতুর্থ খন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত। [২] নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, ষোড়শ খন্ড, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

১৫. স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী তুই যেন রাজ রাজেশ্বরী ঃ গ্রন্থ-সূত্র : গুলবাগিচা, রাগ : পাহাড়ী, তাল : একতালা, রেকর্ড-নম্বর : এইচএমভি এন-৭১২৩, রেকর্ড প্রকাশকাল : জুলাই-১৯৩৩, শিল্পী : কে. মল্লিক।

১৬. সেই আমাদের বাংলাদেশ! রাজারানী আর ভিখারিণী ঃ সূত্র : ২৪.০১.১৯৩৫ তারিখে এইচএমভি কোম্পানীর সাথে চুক্তিপত্র। রেকর্ড-নাটিকা : প্রতাপাদিত্য, নাট্যকার : যোগেশ চৌধুরী, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭২৮৭, রেকর্ড প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর-১৯৩৪, শিল্পী : ধীরেন দাস। গ্রন্থ-সূত্র : [১] নজরুল গীতি - অখন্ড, হরফ প্রকাশনী,কলকাতা, ভারত এবং [২] নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৭. স্বদেশ আমার জানি না তোমার শুধিব মা কবে ঋণ ঃ গীতি-গ্রন্থ : গুলবাগিচা, রাগ : কেদারা, তাল : একতাল, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭১২৩, রেকর্ড প্রকাশকাল : জুলাই-১৯৩৩, শিল্পী : কে. মল্লিক।

১৮. লক্ষ্মী মা তুই আয় উঠে গো ঃ গীতি-গ্রন্থ : সুরসাকী, রাগ : মাঢ়, তাল : কার্ফা, রেকর্ড প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর-১৯৩২, রেকর্ড নম্বর : মেগাফোন জেএনজি-১, শিল্পী : ধীরেন দাস, শিরোনাম : লক্ষ্মী-বন্দনা।

১৯. ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ডাকে তোরে ঃ গীতি-গ্রন্থ : সুরসাকী, রাগ : মালগুঞ্জ , তাল : তেতালা [জলদ], রেকর্ড নম্বর : মেগাফোন জেএনজি-২৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : ডিসেম্বর-১৯৩২, শিল্পী : ধীরেন দাস।

২০. দুঃখ-সাগর মন্থন শেষে ভারত-লক্ষ্মী আয় মা আয় ঃ গীতি-গ্রন্থ : সুরসাকী, রাগ : গৌড়-সারং, তাল : একতাল, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি পি-১১৭৫৫, রেকর্ড প্রকাশকাল : অক্টোবর-১৯৩২, শিল্পী : কে. মল্লিক।

উপরোল্লেখিত দেশপ্রেমমূলক গানগুলির মধ্যে কয়েকটি গানের অন্তর্নিহিত বাণীভাব তথা কাব্যিক বিশ্লেষণ নিম্নে সন্নিবেশ করা হলো–

গান ঃ শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয় রে আয়

আলোচ্য গানে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা প্রকৃতির ষড়ঋতুর রূপবৈচিত্য যেন শিল্পীর রং-তুলিতে সুনিপুণভাবে অংকন করেছেন। একই গানের মধ্যে ছয়টি ঋতুর বর্ণনা সম্বলিত গান একেবারেই বিরল কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম। এ ধরনের গান নজরুল আরো রচনা করেছেন। আলোচ্য গানটির মধ্যে ছয়টি ঋতুর নাম উল্লেখ না হলেও ছয় ঋতুতে বাংলার প্রকৃতিতে যে রূপমাধুর্য ধরা পড়ে– তা এই গানের মধ্যে নজরুল

সুন্দভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ধানের ক্ষেত আর সবুজ শ্যামলিমার মাঝে নজরুল যেন বাংলার কালো মাকে দেখতে পেয়েছেন। গিরি-দরি, বন-বিজনমাঠ-প্রান্তর, ধানের ক্ষেত, খড়-কাদা-মাটি, কালো মেঘ, পল্লীগ্রাম, দীঘি-পদ্মফুল, বনের বাঘ-ভাল্লুক, বেদে-বেদেনীর সাপ-নৃত্য, নদীর স্রোত, ভাটিয়ালী আর বাউল গান– এ সবই যেন শিল্পীর তুলি দিয়ে ছবির মতো ক'রে গানটির মধ্যে অংকিত হয়েছে। বাংলার মা-মাটি-মানুষের প্রতি নজরুলের যে সহজাত আকর্ষণ তথা ভালবাসা, মমত্ববোধ ও দেশাত্ববোধ এ সবই গানটির মধ্যে সাবলীল অনুকরণে প্রতীয়মান হয়। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা মায়ের নন্দিত মুখকে দেখেছেন কালো মেঘের অপরূপ সৌন্দর্যে, দীঘির জলে ফুটে থাকা পদ্মফুলের মাঝে, ঝড়ের মাঝে বেদে-বেদেনীর সাপ নাচানোর ভঙ্গিমার মধ্যে, নদীর স্রোতে আর পাথর-নুড়িসম কাঁকনের ঝলকানীর সুমধুর সুরধুনীতে। এ গানের মধ্যে যেমনি তার বহু মাত্রিকতায় কাব্যিক স্ফুরণ ঘটেছে, তেমনি সুরের আঙ্গিকে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর আবির্ভাব ঘটেছে সাঙ্গীতিক ওজোস্বিতার সর্বোত্তম ঔচিত্যে। নির্দ্বিধায় গানটি নজরুলের এক অনন্য অনবদ্য সৃষ্টি।

গান ঃ নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম

এ গানটির মধ্যেও বাংলার ষড়ঋতুর রূপবৈচিত্র্যকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসতেন। তখন বাংলাদেশ নামে আলাদা কোন দেশ ছিল না কিন্তু নজরুলের হৃদয়ে বাংলাদেশ নামটি অংকিত ছিল মায়ের মতো ক'রে– যা তাঁর অনেক গানের মধ্যে সোচ্চার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। বাংলার নদ-নদী ও প্রকৃতির মনোরম রূপমাধুর্য গানের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। গ্রীষ্মের কাল-বৈশাখী ঝড়ে ময়ূরের নৃত্য, বর্ষার বারিধারা, শরতের শেফালী ফুলের আগমন আর আগমনী গীতির সুমধুর ধ্বনিতে বাংলা প্রকৃতির যে-রূপ ফুটে ওঠে– নজরুল এই গানের মধ্য দিয়ে তা তুলে ধরেছেন সাঙ্গীতিক-কাব্য পরিমিতিবোধের নান্দনিক ও শৈল্পিক ভঙ্গিমায়।

হেমন্তের চির-সবুজ ঘেরা পল্লীর মাঠ-প্রান্তর, শীতের শিশির-ভেজা ঘাস আর পাতাঝরার মর্মর ধ্বনি আর ফাগুনের পল্লীবধূর অপরূপ সাজ যেন বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যকে কাজী নজরুল ইসলাম তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। মাটি-জল-ফুল-ফল-ফসল, শস্য-শ্যামলিমা আর সুধা ভরা এ নয়নভিরাম বাংলাকে নজরুল ইসলাম সমৃদ্ধ-ভরা আমাদের বাংলার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বাংলার হাসিমাখা মায়ের বুকে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। বাংলার ষড়ঋতুতে যে রূপমাধুর্য ফুটে ওঠে– কাজী নজরুল ইসলাম এই গানের মধ্য দিয়ে তা বিভিন্ন উপমার সাহায্যে চিত্রিত করেছেন। আর গানটিও এক অনন্য অসাধারণ রূপময়তা পেয়েছে।

গান ঃ একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী

বাংলার ষড়ঋতু নিয়ে রচিত গানের মধ্যে নজরুলের আলোচ্য গানটি হলো সর্বোৎকৃষ্ট। এ ধরনের গানে নজরুলের কাব্যিক মনোবৃত্তি সর্বদা বাংলার প্রকৃতির অকৃত্রিম উপমায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে– যা ছিল বাংলার মা-মাটি-মানুয় ও শস্য-শ্যামলিমার সাথে নজরুলের সহজাত বেড়ে উঠার হৃদয়ঘন সান্নিধ্যের ফসল। বাংলাকে নজরুল ভালবাসতেন তাঁর মায়ের মতো, বাংলা-মায়ের আঁচল তাঁকে যেন সর্বদা আকৃষ্ট ও আচ্ছন্ন ক'রে রাখতো।

আলোচ্য গানের মধ্যে ছয়টি ঋতুর নাম উল্লেখ না হলেও ছয় ঋতুতে বাংলা প্রকৃতির যে-রূপ আমরা লক্ষ্য ক'রে থাকি– তার বর্ণনা গানটির প্রতি ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। গ্রীষ্মের বৈশাখে রৌদ্রের খরতাপ আর চাতকের মতো ক'রে জল চাওয়ার আকুতি; জ্যৈষ্ঠের পাকা ফলের সুমধুর গন্ধ আর মাঠে-প্রান্তরে ঝড়ের অশনি সংকেত; বর্ষার কেতকী, কদম ও যুঁই ফুলের সমারোহ আর থৈ থৈ জলভরা পুকুরে চঞ্চলা বালিকার জলকেলিতে ভেসে ওঠা সাদা ফেনায় দৃশ্যমান শ্যামল শোভার বাংলার মুখ; শরতের শিশির-ভেজা প্রকৃতির আবহে শিউলী ফুলের রঙমাখা শাড়ী প'রে আগমনী-গীত গাওয়া আর অঘ্রাণের আমন ধানের মন মাতানো গন্ধ; শীতের বাউল, ভাটিয়ালী ও কীর্তন গান আর ফাগুনে বসন্তরাজের আগমনে প্রকৃতিতে ভ'রে ওঠা বিভিন্ন রঙের ফুলের অবগাহনে ধরনী যে-অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়– কাজী নজরুল ইসলাম এই গানের মধ্যে তারই এক শিল্পিতরূপ অংকন করেছেন। প্রকৃতি তথা দেশপ্রেম নিয়ে বারোমাসী আঙ্গিকে এমন গান রচনা আর দেখা যায় না।

গান ঃ ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি, আমার দেশের মাটি

কাজী নজরুল ইসলাম দেশকে যেমন ভালবাসতেন, তেমনি ভালবাসতেন দেশের সম্পদ। এ গানটির মধ্যে দেশ, মাটি ও মানুষের সাথে দেশের অভ্যন্তরে যে-সম্পদ লুকিয়ে আছে– তার বর্ণনা গানটিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছে। দেশপ্রেমমূলক গান হলেও সুরায়ন ও গায়কী স্বাতন্ত্র্যে এটি একটি বাউল অঙ্গের গান। এ দেশের মাটি যেন সোনার চেয়ে খাঁটি। সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যে আচার ও নিয়ম-বিধি এ দেশে পালিত হয়ে থাকে, বিশ্বের অন্য ধর্ম বা জাতির মানুষ সেই আচার ও নিয়ম-বিধি শিখে যেন সভ্য, শুদ্ধ ও পরিপাটি হওয়ার জন্য যুগে যুগে এ দেশেই আসেন– গানটির মধ্যে নজরুল সেই কথা তুলে ধরেছেন। শুধু দেশপ্রেম নয়, ধর্মীয় সম্প্রীতির কথা অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়টি কাজী নজরুল ইসলাম অত্যন্ত মনোরম ও শান্তিপূর্ণ ভঙ্গিতে এই গানের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। এ দেশের সাধু-সন্যাসীরা দেশ থেকে দেশান্তরে যেন সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেই মন্ত্র প্রচারের আগুন জ্বেলেছে, ভালবাসা আর মায়া-মমতা দিয়ে বিশ্বের সকল জাতির মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করেছে– গানটির কাব্যিক ভাবনায় যেন নজরুলের অন্তরের অভিব্যক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

গান ঃ গঙ্গা-সিন্ধু-নর্মদা-কাবেরী-যমুনা ঐ

নজরুলের এ গানটি দেশপ্রেমমূলক স্বদেশী পর্যায়ের গান। পৃথিবীর সবকিছুই পরিবর্তনশীল। নশ্বর কেবল দেশ, জাতি, ধর্ম ও মানুষ। স্রষ্টার সৃষ্ট গঙ্গা, সিন্ধু, নর্মদা, কাবেরী, যমুনা প্রভৃতি নদী; হিমালয়সহ সকল পাহাড়-পর্বত সবই স্বমহিমায় অটল আছে, স্থির আছে, ঠিক আছে কিন্তু ঠিক নাই মানুষ, দেশ, জাতি, ধর্ম, রাজত্ব, ধন-দৌলত ও ঐশ্বর্য। এই গানটির মধ্যে সেই সত্যটিই নজরুল প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপমার সাহায্যে। তাজমহলখ্যাত ঐতিহাসিক আগ্রা আছে, মোঘল শাসনের পীঠস্থান সেই দিল্লী আছে কিন্তু

কেবল নেই সেই সাম্রাজ্য, সেই শাসকগোষ্ঠী। আর এটাই সৃষ্টিকর্তার বিধান। নজরুল ইসলাম এ গানের মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন যে, যারাই এ দেশকে শাসন করেছে তারাই প্রতি পদে পদে এ দেশের মানুষকে শোষণ করেছে, এ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। এ দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কোন শাসকই কাজ করেনি, সেই ভাগ্য বিড়ম্বিত জাতির আকুতির কথাই নজরুল গানটির মধ্যে সোচ্চার কণ্ঠে ব্যক্ত করেছেন। তাই এ দেশের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি নজরুল আঙ্গুল উচিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, এ দেশের মানুষ আর কত ভাগ্য-বিড়ম্বিত হবে, কবে তারা আশার আলো দেখতে পাবে ? কারণ হিসাবে এ গানের মাধ্যমে নজরুল ইসলাম সর্বকালের সকল শাসকগোষ্ঠীকে এও স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে, কেউই চিরকাল ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না; পতন মরণ ঘটবেই। তাই তোমরা শাসকগোষ্ঠী আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও; দেশের ও দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ কর আর দেশ গড়ো– এ গানটির মধ্যে নজরুল এই আশা ব্যক্ত করেছেন।

উদ্দীপনামূলক গান

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত সংগ্রামী চেতনামূলক গানকে শোষণের বিরুদ্ধে উদ্দীপনামূলক গান হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। কাজী নজরুল ইসলাম যথেষ্ট রাজনীতি সচেতন ছিলেন। তাঁর রাজনীতি ভাবনা একাকার হয়ে মিশে ছিল সমাজ ভাবনার সাথে। নজরুল ইসলামের উদ্দীপনামূলক গানগুলি শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনামূলক গান হিসাবে অর্থনৈতিক মুক্তি তথা শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বাসনায় রচিত। তাঁর গানের চিন্তাধারা ও ভাবসম্পদের সুর এবং বাণীতে বীররসের প্রবল বিস্তার ঘটতে থাকে তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে। দেশের প্রতি গভীর অনুরাগ থেকে তাঁর দেশভক্তির মাধুর্য্যমন্ডিত এ গানগুলি অগ্নিযুগের আন্দোলনকে বেগবান করতে সক্ষম হয়। কবি নজরুল যেসব দেশাত্ববোধক কবিতা বা গান রচনা করেছেন তাতে মানবপ্রেম ও দেশপ্রেম দুই-ই পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে।

স্বাভাবিক অর্থে– 'দেশপ্রেমের নামে উত্তেজনাপূর্ণ গান রচনা ক'রে বিদেশী শাসক শক্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সহজে উত্তেজিত করা যায়। মুমুর্ষ লোকও তাতে ক্ষণকালের জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেটি হল সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস। সহজ কবিত্বশক্তি থাকলে যেকোন ব্যক্তি হিংসামূলক গান বাধতে পারে, তার মধ্যে গভীরতার পরিচয় না থাকলেও চলে, হৃদয়ের পরিচয় না থাকলেও চলে। কবি নজরুল সে পথের পথিক নন। তাঁর দেশাত্ববোধে বড় কবির কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত পূর্ণতারই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, তিনি যথার্থ কবি, তাঁর মন যথার্থ কবি ধর্মী। আমি সেই মনকেই বলব যার মধ্যে মানুষের প্রতি প্রেমে কোন ভেজাল নেই। কবি নজরুল এই হিসাবে যথার্থ কবি। তাঁর গান, কাব্যে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মানুষের আত্মার অসম্মান জনিত তীব্র ক্ষোভ কবির মনের একটি ভঙ্গি মাত্র নয়। মনুষ্যত্বের উন্মেষ না হলে দেশাত্ববোধ অর্থহীন'।[৯]

নজরুলের উদ্দীপনামূলক গান ও কবিতা সমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর যেমন– বিদ্রোহাত্মক, বিপ্লবাত্মক, পরাধীনতা ও বিদেশী শাসন বিরোধী, স্বাধীনতা চেতনাবহ, ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, শোসন ও অসাম্য বিরোধী, সাম্যবাদী চেতনামূলক দেশাত্ববোধক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক চেতনাবহ, মুসলিম নবজাগরণের বীর ও মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রশংসাসূচক গান ও কবিতা ইত্যাদি। এসব কবিতার বিষয় বৈচিত্র্য এতই ব্যাপক যে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে বিদ্যমান আদর্শগত পার্থক্য তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। 'নিপীড়িত মানুষের জাগরণ, শোষিত মানুষের সংগ্রাম, পদানত জাতিসত্তার মুক্তি যে কোন দেশের যে কোন আদর্শের হোক না কেন, তা নজরুলের কাছে বন্দনার যোগ্য। পথ ভিন্ন হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্য যখন মহৎ, তখন পথের পার্থক্য নজরুলের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি'।[১০]

তাই বলা যায়, নজরুল ছিল মেহনতি মানুষের কবি, নজরুল ছিল নিপীড়িত নারীদের প্রানসঞ্চারক, নজরুল ছিল আশাহত জনতার আশার আলো, নজরুল ছিল সাম্যের বাহক। নজরুল ছিল সর্বহারা পরাধীন জাতিসত্তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা এক সৈনিক। নজরুল ছিল সকল মানুষের প্রেরনার উৎস এবং নিগৃহীত নিপীড়িত, শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘাত ঘোষনা করবার মূল মন্ত্রে মন্ত্রিত করবার এক দূর্বার শক্তি এবং সকল কিছুর মূলে ছিল একটিই উদ্দেশ্য অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং অসহায় মানুষকে উদ্দীপিত করবার লক্ষ্যে তার সৃষ্টি ছিল অনবদ্য।

আমার আলোচ্য বিষয় নজরুলের সৃষ্টি সেই উদ্দীপনামূলক গান সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। সাঙ্গিতিক পরিচয় এবং এই ধারার গানগুলোকে একত্রিত করা।

মাসিক পত্রে নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা পড়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন-অসহযোগ অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মনপ্রান যা কামনা করেছিল এ যেন তাই। দেশব্যপী উদ্দীপনা এই যেন বাণী। নজরুল বিদ্রোহী কবি হিসাবে খ্যাত হলেও তার সাহিত্য এবং গানের এক বড় এলাকা জুড়ে ভারতবর্ষের মানুষকে আত্ম শক্তিতে বলিয়ান ও উদ্দীপ্ত করার চেতনা যেন ছড়িয়ে আছে। এই শ্রেনীর গানের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি ভারতের অতীত গৌরব, বীরত্ব এবং বীর সন্তানদেরকে স্মরণ করে পরাধীন ভারতবাসীকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা আছে। এরকমই একটি গান 'আশু প্রয়ানগীতি' নজরুল গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লবী কর্মকান্ড, সাম্যবাদী আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে জনগনকে উদ্দীপ্ত করতে অসংখ্য গান রচনা করেছেন, পরাধীন ভারতের শোষিত জনগনকে আত্মশক্তি ফিরে পেতে নজরুল যে প্রেরনামূলক গান রচনা করেছেন তার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা চলে না।

'সকল দেশেই সঙ্গীত চিরদিন গনজাগরণ ও শৃঙ্খল মোচনের প্রেরণা দিয়েছে। মুক্তি সংগ্রামে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। ফরাসি বিপ্লব, নভেম্বর বিপ্লব, চীন বিপ্লব, স্পেনে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম, কিউবায় বিপ্লব ও ল্যাটিন আমেরিকায় গণমুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদিতে সঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা দেখা গেছে। আমাদের দেশের বহু

অনামী গীতিকারের লোকগীতি বৃটিশের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহের ও অমর শহীদদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে- যেমন ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রঙ্গলাল, রজনীকান্ত প্রমুখের স্বদেশীগান দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম এই স্বদেশী এবং উদ্দীপক সঙ্গীত ধারায় আর একটি মাত্রা যোগ করেছেন যা এদেশে সম্পূর্ণ নতুন'।[১১]

পরাধীনতা কিংবা শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান তো বটেই, দেশবাসীর জন্য আত্মশক্তি ও উদ্দীপনামূলক গান রচনা করেছেন নজরুল। তার এই ধারার একটি উল্লেখযোগ্য গান-

'আমি বিধির বিধান ভাঙ্গিয়াছি আমি এমনই শক্তিমান।
মম চরণতলে, মরণের মার খেয়ে, মরে ভগবান' ॥[১২]

এখানে ভারতবাসীকে তার আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন ক'রে নিয়তি বা ভগবান রূপ বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উদ্দীপনা সংক্রমিত করেছেন। নজরুলের আত্মশক্তি ও উদ্দীপনামূলক সেরা গানটি হচ্ছে–

'মোরা ঝঞ্চার মতো উদ্দাম, মোরা ঝর্নার মত চঞ্চল
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল' ॥[১৩]

বাংলা সঙ্গীত জগতে ও জাতীয় জীবনে কাজী নজরুলের আর একটি করণীয় ও বরণীয় অবদান হ'ল তাঁর রচিত প্রগতিধর্মী ও উদ্দীপনার গানগুলি। তার এই গানগুলি স্বদেশী সংগীত ও জাতীয়তাবাদী সংগীতরূপে আখ্যায়িত হয়।

নজরুলের চোখে দেশ শুধু দেশের নিঃসর্গ-সৌন্দর্য, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা এবং মসজিদ-মন্দির নয়, তাঁর কাছে দেশ অর্থ- দেশের মানুষ। এই ধারণা ও উপলব্ধি থেকে বলা যায়, 'স্বদেশের এবং ব্যাপক অর্থে বিশ্বের মানুষ নজরুলের কাছে বড় ছিল বলেই তিনি শুধু শিল্পের সাধনায় এবং কলাকৈবল্যবাদে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের স্বপক্ষে এবং বিশেষভাবে পরাধীন স্বদেশের মানুষের স্বপক্ষে লেখনি চালনা করেছেন, সহযাত্রী হয়েছেন তাদের সংগ্রামের। স্বদেশের মানুষ তার কাছে কতবড় ছিল তা একটিমাত্র উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট হবে, 'স্বদেশ বলিতে বুঝেছি কেবল দেশের পাহাড়, মাটি, বায়ু, জল দেশের মানুষ। চাই করিতে দেশ স্বাধীন, যত যেতে চাই তত পথে পাই, হই মা ধূলি-বিলীন। [গুলবাগিচা] বস্তুতঃ 'আমার দেশের মাটি ও- ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি' এই ধরনের অনেক স্বদেশপ্রেমমূলক গান ও কবিতার রচিয়তা নজরুল। যে দেশের মানুষকে আপন আত্মীয়বোধে চিনে নিয়ে এবং তাদের সংগ্রামের সাথী স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না'।[১৪]

নজরুলের কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্দীপনামূলক গানের তালিকা বিভিন্ন তথ্যাদিসহ নিম্নে প্রদান করা হলো–

১. আসে রে ঐ ভারত আকাশে আশা অরুণ রবি ঃ সূত্র : পান্ডুলিপি [নজরুল গীতি অখন্ড], গ্রন্থ : [১] নজরুল গীতি অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত ও [২] নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। শিরোনাম : জাগিছে জনগণ।

২. এসো বিদ্রোহী মিথ্যা সুদন আত্মশক্তি বুদ্ধ বীর ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : আত্মশক্তি।

৩. এসো যুগ সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়, এস চির-সুন্দর ঃ গ্রন্থ : সর্বহারা, শিরোনাম : প্রার্থনা।

৪. এসো অষ্টমী পূর্ণচন্দ্র এসো পূর্ণিমা পূর্ণচাঁদ ঃ গীতি-গ্রন্থ : ভাঙার গান, শিরোনাম : পূর্ণ অভিনন্দন। পাদটীকা : মাদারিপুর শান্তি সেনাবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ পূর্নচন্দ্র দাস মহাশয়ের কারামুক্তি উপলক্ষে রচিত।

৫. মোরা ঝঞ্চার মত উদ্দাম ঃ গ্রন্থ : [১] ছায়ানট, শিরোনাম : পাহাড়ীগান, সুর : নজরুল, রচনাস্থান : হুগলী, রচনাকাল : আষাঢ় ১৩৩১ ও [২] নজরুলগীতিকা, ব্যান্ডের সুর। রেকর্ড নম্বর : কলম্বিয়া জিই-৭৫৪৮, রেকর্ড প্রকাশকাল : আগস্ট-১৯৪৯, শিল্পী : গিরীণ : চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য, সুর : নিতাই ঘটক, স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, পঞ্চম খন্ড, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

৬. কারা পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ ঃ গীতি-গ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু, রাগ : দরবারী কানড়া, পত্রিকা : জয়তী, পৌষ, ১৩৩৭ সংখ্যা, নাটক : কারাগার, নাট্যকার : মন্মথ রায়, মঞ্চ : মনোমোহন থিয়েটার, উদ্বোধন : ২৪.১২.১৯৩০ তারিখ, চরিত্র : ধরিত্রী, সঙ্গীত শিল্পী : নীহারবালা।

৭. জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী জাগো জাগো ঃ গীতি-গ্রন্থ : গানের মালা, মার্চের সুর, রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-৩০০৩, রেকর্ড প্রকাশকাল : জানুয়ারী-১৯৩৪, শিল্পী : সন্তোষ কুমার দাস। স্বরলিপি-গ্রন্থ : [১] নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, অষ্টম খন্ড, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা এবং [২] নজরুল স্বরলিপি, একাদশ খন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত।

৮. দেশপ্রিয় নাই শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি' ঃ সূত্র : [১] পান্ডুলিপি [নজরুল সঙ্গীত সম্ভার, ঢাকা] ও [২] পত্রিকা। রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-২৮৪৩, রেকর্ড প্রকাশকাল : আগস্ট-১৯৯৩, শিল্পী : মাষ্টার কমল, রাগ : জয়জয়ন্তী। পত্রিকা : মোহাম্মদী, ভাদ্র-১৩৪০ সংখ্যা, গ্রন্থ : [১] নজরুল গীতি অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত এবং [২] নজরুল রচনাবলী, ৩য় খন্ড, ঢাকা। উপলক্ষ : দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের অকাল মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। উল্লেখ্য যে, ২৯.১০.১৯৩৩ তারিখের চুক্তিপত্রে গানটি 'দেশপ্রিয় তিরোধান' এই টাইটেলে উল্লেখিত আছে।

৯. নবীন আশা জাগল রে আজ ঃ সূত্র : নজরুলগীতি অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত, রাগ : দীপক মিশ্র, শ্রেণী : উদ্দীপনামূলক, তাল : কাহারবা।

১০. নাহি ভয় নাহি ভয় মৃত্যু সাগর মন্থন শেষ ঃ গীতি-গ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু, রাগ : টোড়ি, তাল : একতাল, পত্রিকা : জয়তী, পৌষ মাঘ, ১৩৩৭ সংখ্যা, শিরোনাম : কারাগার-এর গান, নাটক : কারাগার, নাট্যকার : মন্মথ রায় চৌধুরী, মঞ্চ : মনোমোহন থিয়েটার, উদ্বোধন : ২৪.১২.১৯৩০ তারিখ, চরিত্র : ধরিত্রী, শিল্পী : নীহারবালা। রেকর্ড : [১] এইচএমভি-র চুক্তিপত্র ১৮.০৯.১৯৩৫ তারিখ, ১৯৩৫ সালে রেকর্ড করেন প্রথমে রত্নেশ্বর মূখার্জি ও পরে ধীরেন ঘটক [সূত্র : হারানো গানের খাতা] এবং [২] রেকর্ড নম্বর : কলম্বিয়া জিই-২৮০০, রেকর্ড প্রকাশকাল : জুলাই-১৯৪৫, শিল্পী ঃ সত্য চৌধুরী, রেকর্ড-নাটিকা : কারাগার। উল্লেখ্য যে, হারানো গানের খাতায় গানটির বাণীতে যথেষ্ট পাঠান্তর রয়েছে। দ্বিতীয় রের্কডের সুর প্রামাণ্য নয়। সুর পরিবর্তন করেছেন নিতাই ঘটক।

১১. পদ্মা-মেঘনা বুড়িগঙ্গা বিধৌত পূর্ব দিগন্তে ঃ গ্রন্থ : শেষ সওগাত, শিরোনাম : পুরববঙ্গ। উল্লেখ্য যে, গানটি সম্ভবতঃ কবিতা হিসাবেও স্বীকৃত।

১২. বিশাল ভারত-চিত্তরঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ফিরে ঃ সূত্র : পান্ডুলিপি [নজরুল গীতি অখন্ড গ্রন্থে নির্দেশিত] , রের্কড : এইচএমভি জানুয়ারী-১৯৩৫, শিল্পী ঃ ধীরেন দাস, রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থ : [১] সন্ধ্যামালতী, [২] অখন্ড নজরুলগীতি, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত ও [৩] নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৩. ভারত আজও ভোলেনি বিরাট মহাভারতের ধ্যান ঃ সূত্র : রেকর্ড-বুলেটিন ও রয়্যাল্‌টি রেজিস্টার। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৩১০৬৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : আগস্ট-১৯৪৯, শিল্পী : সত্য চৌধুরী। গ্রন্থ : [১] নজরুল গীতি অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত ও [২] নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। স্বরলিপি-গ্রন্থ : সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, ভারত।

১৪. মৃতের দেশে নেমে এলো মাতৃনামের গঙ্গাধারা ঃ সূত্র : রেকর্ড বুলেটিন, গ্রন্থ : [১] বনগীতি দ্বিতীয় সংস্করণ, [২] নজরুল গীতি, অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত ও [৩] নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। রেকর্ড নম্বর : কলম্বিয়া জিই-২৫৫২, রেকর্ড প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৪০, শিল্পী : সন্তান সঙ্ঘ, তাল : তেওড়া, স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল সুর সঞ্চয়ন, দ্বিতীয় খন্ড, ডিএম লাইব্রেরী, কলকাতা, ভারত।

১৫. মোরা মারের চোটে ভুত ভাগাবো মন্ত্র দিয়ে নয় ঃ নাট্যগ্রন্থ[সংকলন] ঃ ঝিলিমিলি[দ্বিতীয় সংস্করণ], নাটক : ভুতের ভয়, চরিত্র : বিপ্লব কুমারের গান, গীতি-গ্রন্থ ঃ নজরুল গীতি অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত।

১৬. হে পার্থ-সারথি বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ ঃ গ্রন্থ : [১] সঞ্চয়ন ও [২] শেষ সওগাত। শিরোনাম : পার্থ-সারথী, রাগ : শিবরঞ্জনী, তাল : ত্রিতাল, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭২৯৫, রেকর্ড প্রকাশকাল :

অক্টোবর ১৯৩৪, শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। পত্রিকা : নবারুণ, ১৩৪৩ সংখ্যা [স্বরলিপি], স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক। স্বরলিপি-গ্রন্থ : [১] নজরুল স্বরলিপি, ষষ্ঠখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ভারত ও [২] নজরুল সুরলিপি, নবম খন্ড, ঢাকা।

১৭. আমাদের জমির মাটির ঘরের বেটি ঃ শিরোনাম : চাষার গান, শ্রেণী : জাগরণ[উদ্দীপনা]। গানটি অগ্রন্থিত এবং গানটির সুরও পাওয়া যায়নি।

১৮. আমি বিধির বিধান ভাঙ্গিয়াছি আমি এমন শক্তিমান ঃ শিরোনাম : অভিশাপ, শ্রেণী : আত্মশক্তি বোধন। গানটির সুরের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৯. ওরে আজ ভারতের নবযাত্রা পথে ঃ গীতি-গ্রন্থ : সন্ধ্যামালতী, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭৩১৩, রেকর্ড প্রকাশকাল : ১৯৩৪, শিল্পী : ধীরেন দাস। পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে পুনরায় রেকর্ড হয়েছিল এইচএমভি কোম্পানী থেকে এবং শিল্পী ছিলেন যথাক্রমে সুপ্রীতি ঘোষ ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচ্য অধ্যায় সংশ্লিষ্ট নজরুলের কিছু গানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, গীতি-উৎস ও বাণীভাবের বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

গান ঃ আমাদের জমির মাটি

এই গানটিতে কবি পরাধীন ভারতবর্ষের কৃষক সমাজের দুর্গতি লাঘব করার জন্য এর কারণ নির্ণয় করেছেন। তিনি লিখেছেন যে, কৃষকের ফলানো শস্য কিংবা তার অর্থমূল্য সাগর পাড়ে অর্থাৎ উপনিবেশ বাদীদের দ্বারা বিদেশে পাচার হয়ে যাবার ফলে কৃষকের এই দুর্গতি।

দৃশ্যতঃ গানটি কোন এক শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রেক্ষাপটে লেখা এবং এই পূজা উৎসবের যে অন্তর্নিহিত শক্তি তার সৎব্যবহার ক'রে কৃষক সমাজকে উদ্দীপিত ক'রে কবি এই নিগৃহণ এবং লুন্টনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা সংগ্রামের আহবান জানাচ্ছেন এবং এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন যে, এই সংগ্রামে বিজয়ী হলেই কেবলমাত্র দেবী শক্তির উদ্বোধন ঘটবে।

গান ঃ আসে রে ঐ ভারত আকাশে আশা অরুণ রবি

উপমা উৎপেক্ষা ও চিত্রকল্পের সমাহারে এই গানটি অসামান্য দেশ গান। অচেতন পরাধীন জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে এই গানটিতে উচ্চতম নান্দনিক মানের বিভিন্ন উপাদানের সমাহার ঘটানো হয়েছে। গানটির মূল উপজীব্য বিষয়বস্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং ভারতবাসীর নতুনতর উন্নত জীবন।

গান ঃ এসো বিদ্রোহী মিথ্যা সুখ

এ গানটি পরাধীন ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে আত্মশক্তি জাগানোর অনুপম প্রয়াস। নানা ভীরুতা এবং সংস্কারে আবদ্ধ ভারতবাসী যেদিন জাগ্রত হবে সেদিনই প্রকৃত স্বরাজ বা মুক্তি অর্জিত হবে– এ বিশ্বাস থেকে উৎসারিত হয়েছে এই গানটির নানা শব্দ-চিত্র। তিনি দৃপ্তভাবে ঘোষণা করেছেন যে, সুপ্ত আত্মশক্তি যেদিন জাগ্রত হবে সেদিন স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেশের তথা জনগণের মুক্তি অর্জিত হবে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র গানটি জুড়ে মানবিক শক্তির গভীর থেকে সত্যমন্ত্র তুলে আনার এই দীক্ষাই ধ্বনিত হয়েছে।

গান ঃ আমি বিধির বিধান ভাঙ্গিয়াছি আমি এমন শক্তিমান

মানব সমাজে অবধারিতভাবেই বিভিন্ন সংস্কারে আবদ্ধ। কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বাস করতেন মানুষের মুক্তির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন এ সকল সংস্কার থেকে মুক্তি। গানটির শেষভাগে বলা হয়েছে যে জগন্নাথের সাম্যলোকে জাত সমাজের বালাই নাই। সেই সত্যলোকে পৌঁছানোর জন্য কবি বিবেকের তাগিদ মেনে চলার জন্য আবাহন জানাচ্ছেন। এই দীর্ঘ গানটিতে বিভিন্নভাবে পুঁথির বিধান এবং নানা কুসংস্কারের বেড়াজালকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সত্যের আলোকে অবগাহনের কথা বলা হয়েছে। তাই এটি একটি অসামান্য উদ্দীপনামূলক গান। সমগ্র গানটিতে জড়িয়ে আছে বিলাবল রাগের সুর।

গান ঃ এসো যুগ সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়

'আত্মশক্তি' গানটিতে আমরা দেখেছি মানবিক শক্তির উদ্বোধনের আহবান এবং আলোচ্য গানটিতে আমরা লক্ষ্য করবো, পরাধীন এ দেশের বন্দী জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে চির-সুন্দর সর্বশক্তিমানের আবাহন। পরাধীন জনগণের বেদনা মোচন করতে পরমা সুন্দরের আবির্ভাবকে কামনা করা হয়েছে গানটি জুড়ে।

গান ঃ এসো অষ্টমী পূর্ণচাঁদ এসো

কাজী নজরুল ইসলাম যখন বহরমপুর জেলে বন্দী তার সহ সঙ্গী ছিলেন বৃহত্তর মাদারীপুর তথা বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার প্রখ্যাত চারণ বিপ্লবী শ্রী পূর্ণ দাস। পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলাম জেল থেকে মুক্ত হওয়ার পর যখন শ্রী পূর্ণ চন্দ্র দাসও কারাগার থেকে মুক্তি পান, তখন তার মুক্তি উপলক্ষ্যে এই গানটি সৃষ্ট। ভাবতে বিস্ময় অনুভূত হয় যে, পশ্চিম বঙ্গের মানুষ হয়েও পূর্ববঙ্গের ভূ-প্রকৃতির কতটা বিস্তারিত এবং আবেগঘন বর্ণনা এই গানটিতে কাজী নজরুল ইসলাম দিয়েছেন। স্বভাবসুলভভাবে তিনি ছিলেন যে কোন ধর্মের, যে কোন সমাজের মহৎ ব্যক্তিদের গুণের কীর্ত্তনকারী ও স্তুতিকারক। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যে দেবত্বের স্তবগান গাইতে ব্যর্থ হওয়া অর্থ দেবতাদেরই অসম্মান করা। তাই এই গানটিতে আমরা শুনতে পাই শ্রী পূর্ণ দাসের মহত্ব এবং বীরত্বের স্তবগান।

গান ঃ ওরে আজ ভারতের নব যাত্রা

কাজী নজরুল ইসলাম যখন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। রাওলাট আইন এবং বিভিন্ন দমন মূলক আইনের ভয়ে অসহযোগ আন্দোলনের স্বপক্ষে কোন কবি বা সাহিত্যিক তেমনভাবে কলম ধরেননি। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম আন্দোলনের পক্ষে বেশ কিছু গান ও কবিতা লিখেছেন। এগুলো এতই চাঞ্চল্য তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিল যে, কবির উপর কঠোর গোয়েন্দা নজরদারি লাগানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলোকে হতোদ্যম অবস্থা থেকে মুক্ত ক'রে তেজদীপ্ত আন্দোলনে নিয়ে আসার পেছনে কাজী নজরুল ইসলাম অবদান এককথায় অদ্বিতীয়।

সে সময়ে বেশকিছু জাগরণী এবং উদ্দীপনামূলক গান তিনি লিখেছিলেন যেগুলো অবিসংবাদিতভাবে বাংলা গানের ভুবনে প্রথম সার্থক গণসঙ্গীত। আলোচ্য গানটি পরবর্তীকালে সন্ধ্যামালতী গ্রন্থে প্রকাশিত হলেও শ্রেণীভূক্ত এ গানটিতে ভারত পরাধীন ভারতবর্ষে স্বাধীনতাকামী জনগণের নব উত্থানের জয়গান গাওয়া হয়েছে।

গান ঃ কারা পাষাণ ভেদি' জাগো

দরবারী-কানাড়া রাগে নিবন্ধ গান অতি সহজেই গম্ভীর ভক্তিরস সৃষ্টি করে। কিন্তু আলোচ্য গানটিতে কাজী নজরুল ইসলাম অবলীলাক্রমে বীররসের সৃষ্টি ক'রে উদ্দাম-উদ্দীপনা ঘটিয়েছেন। মৃত্যুর ভয় অগ্রাহ্য ও কারা-ভীতি অতিক্রম ক'রে অকুতোভয় মানসিক শক্তি অর্জন করার তাগিদ পাওয়া যায় গানটিতে।

গান ঃ জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী

গানটি রচিত হয়েছিল একটি মার্চসঙ্গীত হিসাবে। সাধারণতঃ মার্চসঙ্গীতে অত্যন্ত সহজ ধ্বনিপ্রধান শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম মার্চ সঙ্গীতে ধ্বনি প্রধান ও তার পাশাপাশি গভীর ভাবানুযঙ্গ সৃষ্টি করতে পারঙ্গম ছিলেন। এই গানটিতে একদিকে কুচ্-কাওয়াজে যোগদানের আহবান জানাচ্ছে। দ্রিম দ্রিম দ্রিম এই জাতীয় ধ্বনির অবতারণা ঘটাচ্ছে এবং অন্যদিকে দনুজ-দলনী মাতৃশক্তিকে সম্পৃক্ত করছে। এ গানটিও কাজী নজরুল ইসলামের সেই উদ্দীপনামূলক গানগুলোর একটি। যেগুলোকে অনায়াসে বাংলা গণসঙ্গীতের পথিকৃত বলা চলে।

গান ঃ দেশপ্রিয় নাই শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি'

আলোচ্য গানটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরধান উপলক্ষে রচিত। বাঙ্গালী মাত্রই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিপুল অবদানের কথা জানেন। একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং তার স্ত্রী সারদাদেবী যিনি 'বাংলাকথা' পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। তারা দু'জনই তরুণ নজরুল ইসলামকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন এবং একইসঙ্গে তাঁর ভাবাদর্শে বিপুলভাবে প্রভাবিত ছিলেন। বিশেষ ক'রে কাজী নজরুল ইসলামের হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের যে-দর্শন সেটি দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনকে অনেকখানি

প্রভাবিত করেছিল। আলোচ্য গানটিতে বুঝা যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু কাজী নজরুল ইসলামের উপর কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। গানটির সুর নির্দেশ থেকে বুঝা যায় যে, দাদ্‌রা তালে জয়জয়ন্তী রাগে নিবন্ধ হওয়ার কারণে গানটিতে গভীর বেদনার রস সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছে। নজরুলের এ এক অনন্য কীর্তি।

গান ঃ নবীন আশা জাগলো রে আজ

কাজী নজরুল ইসলামের উদ্দীপনামূলক গানগুলির মধ্যে এ গানটি একটি বিশেষ স্থান দখল ক'রে আছে। কেননা, যুদ্ধক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক বাতাবরণে তিনি উন্মোচিত হয়েছিলেন তার স্পষ্ট স্বাক্ষর যুদ্ধ ফেরত এই তরুণ কবির গানটিতে লক্ষ্য করা যায়। গানের একটি চরণে আছে 'শির উঁচিয়ে দাঁড়া জগৎ মাঝে'। এখানে স্পষ্টতঃই কবি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের উঁচুস্থান অধিকার করার কথা বলছেন এবং তা সম্ভব হবে তখনি যখন ভারতবাসীরা কর্মবিমুখতা পরিহার করবে। এজন্যই তিনি বলেছেন 'এগিয়ে গিয়ে ধরতে নিজের কাজ' মিশ্র দীপক রাগে কাহার্‌বা তালে সৃষ্ট এই গান উদ্দীপিত করার পাশাপাশি মনে একটি সুরের আমেজ ছড়িয়ে দেয়।

গান ঃ নাহি ভয় নাহি ভয়

১৯১৯, ১৯২০ এবং **১৯২১** সালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। সারা ভারতবর্ষের মানুষ দলমত নির্বিশেষে এই আন্দোলনে তাদের নৈতিক সমর্থন জুগিয়েছিল এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী কর্মবিরতি এবং অন্যান্য কর্মসূচী পালন করেছিল। এমনকি এক পর্যায়ে মানুষ পথে নেমে আসে এবং আন্দোলনে যুক্ত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে 'চৈরাচরি'-তে থানা ঘেরাও এর ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে গুলিবর্ষণে শান্তিপ্রিয় মানুষ হতাহত হয় এবং গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নেয়। জনগণ হতোদ্যম বিহ্বল হয়ে পড়ে এবং সুযোগ বুঝে বৃটিশ সরকার গান্ধীজিকে গ্রেফ্‌তার করে।

এই হতাশাজনক পরিস্থিতিতে **১৯২০** খ্রীষ্টাব্দে নজরুল ইসলাম কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে এই গানটি রচনা করেন। গানটির একটি চরণে আছে 'হোক গান্ধীবন্দী তোদের সত্যবন্দী নয়'। এতে বুঝা যায় যে, কোন একজন ব্যক্তির উপর সত্য যুদ্ধ নির্ভর করে। এমনটা নজরুল ইসলাম বিশ্বাস করতেন না এবং জনগণের সম্মিলিত আত্মশক্তির উপরই ছিল তার পরিপূর্ণ আস্থা– গানটিতে তাই-ই ব্যক্ত হয়েছে।

গান ঃ পদ্মা মেঘনা বুড়িগঙ্গা

আমরা সকলে জানি যে, অত্যন্ত প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী হয়েও কাজী নজরুল ইসলাম ঐতিহ্যে এবং ইতিহাসের যা কিছু মঙ্গলময় তা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করতেন এবং তাঁর শিল্পকর্মগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল ক'রে আছে। আলোচ্য গানটিতে আমরা দেখতে পাই আদি ভারতবর্ষে তথা সনাতন ধর্মে সুপ্রাচীন কিছু গৌরবময় ঐতিহ্যের উল্লেখ রয়েছে। যেমন– ব্রাহ্মমুহূর্তের পুরবাণী, সৌম্যশক্তি, প্রবুদ্ধতা ইত্যাদি।

গান ঃ বিশাল ভারত চিত্তরঞ্জন

এই গানটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মহাপ্রয়াণে লেখা হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য আন্তরিক সম্পর্ক বিরাজ করতো। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি এবং দেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামের যে আপোষহীন ভূমিকা সেটি দেশবন্ধুকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল। সত্য কথা বলতে কি, বয়সে সন্তানতুল্য এই তেজস্বী তরুণের দ্বারা দেশবন্ধু অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন তার রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে। একইভাবে নজরুল ইসলামের উপর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রভাব ছিল অপরিসীম। এই গানটিতে নজরুল ইসলাম তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মত মহান নেতার স্তবগান গেয়েছেন।

গান ঃ ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট

পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গা এই গানটি নিয়ে আলোচনায় বলা হয়েছে যে, কাজী নজরুল ইসলাম যতটা প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী ছিলেন, ঠিক ততটাই ঐতিহ্য ঘনিষ্ট ছিলেন। গানটির প্রথম চরণেই সেই বিষয়টি পরিদৃষ্ট হয়। গানটিতে অত্যন্ত আশাবাদী সুরধ্বনি আছে। গানটির শেষ লাইনে 'সম্ভাবামি যুগে যুগে' ও 'জেগেছে সুপ্ত সিংহ' এবং ঠিক তার আগের লাইনে 'পাষাণ ভারতে বিরাট চেতনা জাগে'– এই অভিব্যক্তিগুলি গানটির সেই আশাবাদী চরিত্রকে স্পষ্ট ক'রে তুলেছে।

গান ঃ মৃতের দেশে নেমে এলো মাতৃনামের গঙ্গা ধারা

আলোচ্য গানটি কাজী নজরুল ইসলামের অধিকাংশ দেশাত্মবোধক গানের মতই আশাবাদী ও জাগরণী সুর ধ্বণিত হয়েছে। তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষের যে জীবনমৃত চেহারা সেটির মধ্যে নতুন অনুপ্রাণীত এবং সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখতে তিনি মাতৃশক্তির আবাহন জানাচ্ছেন।

গান ঃ মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো মন্ত্র দিয়ে নয়

'ভূতের ভয়' নাটিকার এই গানটি রূপক চরিত্রের মুখেও কাজী নজরুল ইসলাম এই গানটির সাহায্যে রূপক দেশের তথা সমাজের যত মিথ্যা সংস্কার ও নির্যাতনকারী শক্তি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী শোনাচ্ছেন। গানটির একটি চরণে রয়েছে যে 'তোদের হাড্ডি গেছে, মাংস গেছে, চামড়া মাত্র গায়'। কিন্তু সেই শক্তিহীন মৃত প্রায় অবস্থা থেকে পুনঃ জাগরণের বা পুনরুত্থানের বাণী ধ্বণিত হয়েছে। 'তোদের শুষ্ক দেহে জ্বালা এবার আগুন জ্বালাময়'।

গান ঃ হে পার্থসারথী বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ

পরাধীন ভারতবাসীর ভয়ভীত মৃত্যু আতঙ্কে আতংকিত আত্মশক্তিহীন যে দৈন্যদশা, তার অবসান ঘটিয়ে নবীন, সজীব ও বীর্যবান নতুন একজাতি বিনির্মাণে শিবশক্তির আবাহন এই গানটির বৈশিষ্ট্য। মা'র স্নেহ

আঁচল ছেড়ে মাতৃভূমিকে মুক্ত করা তথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস ও তেজ দেশবাসীর মনে সঞ্চার করাই এই গানটির লক্ষ্য। বাংলাদেশে তারই প্রবর্তিত শিবরঞ্জনী রাগের বীর রসের ব্যবহার গানটির থেকে আমাদের বাড়তি প্রাপ্তি।

আলোচ্য অধ্যায় সংশ্লিষ্ট নজরুলের কিছু নারী জাগরণীমূলক গানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, গীতি-উৎস ও বাণীভাবের বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:–

গান ঃ আমি মহাভারতী শক্তি নারী

কাজী নজরুল ইসলাম পরিপূর্ণ নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। তিনি ভারতবর্ষের প্রথম কবি যিনি অকুণ্ঠচিত্তে পুরুষের সঙ্গে নারীর সম অধিকারে বিশ্বাস করেছেন। তিনি সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থে 'নারী' কবিতায় লিখেছেন-

সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ নারী কোন ভেদাভেদ নাই।

তিনি নিজ কর্মজীবনেও একথাটি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। তিনি একদিকে পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল নারীমুক্তি আন্দোলন গুলোর সব ভালো বিষয়গুলো গ্রহণ করেছিলেন-আবার অপরদিকে হৃদ্য ঐতিহ্যের ভারতবর্ষের মাতৃতান্ত্রিক সমাজে সকল মঙ্গলময় ও কল্যানকর দিকগুলো সংরক্ষণ করায় দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন।

এজন্যই তার নারীমুক্তির বানী এতটা আধুনিক আদর্শবাদী। আলোচ্য গানটিতে আমরা একই সত্যের প্রতিফলন দেখতে পাই। একদিকে পৃথিবীর সকল দ্বন্ধ ও অসাম্য সংহারে নারী তেজদীপ্ত ভূমিকা রাখবে এবং অন্যদিকে শান্তিময় ঐশী শক্তি সঞ্চয় করে পৃথিবীকে সুখ ও শান্তিতে ভরে তুলবে। এই হচ্ছে কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু।

গান ঃ চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা

চাঁদ সুলতানা ছিলেন বিখ্যাত মুসলিম বীর মহিয়সী নারীদের একজন। যিনি নিজ ভাইদের অযোগ্যতার কারনে বাবা সুলতান ইউসুফমিস এর বিশ্বাস এবং নির্ভরতা লাভ করেন এবং দিল্লীর মসনদে আরোহন করেন। তিনি বীরদর্পে ও কুশলতার সঙ্গে দীর্ঘ চার বছর দিল্লী শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। তার বীরত্ব গাঁথা আজও ভারতবর্ষের সর্বত্র সুবিদিত বা জানা। কাজী নজরুল ইসলাম সর্বদাই নারীর সম অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, নারীদেরকে অবরোধ প্রথা বা অবগুণ্ঠনের মধ্যে অবরুদ্ধ করে তাদের নিরাপত্তা বিধান করা যাবে না। তাই তিনি এই গানটিতে চাঁদ সুলতানার বীরত্বের উল্লেখ করে বলেছেন-যদি না রহিত অবরোধের দূর্গ, হতো না এই দুর্গতি।

গান ঃ কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া

পরাধীন ভারতের শত বঞ্চনা এবং দূর্দশা থেকে দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করতে কাজী নজরুল ইসলাম বারবারই মাতৃশক্তির আবাহন জানিয়েছেন। তার একটি বিখ্যাত গান "মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়"-সেই সত্যেরই প্রতীক। আলোচ্য গানটিও এক অর্থে মাতৃ শক্তিরই আবাহন। কেননা শিবশক্তির আবির্ভাব এবং তার মাধ্যমে উপনিবেশিক শক্তির দুশাসনের অন্ধকার দূর করা এই গানটির মূল বক্তব্য। অবশ্য গানটিতে মাতৃশক্তিকে আহবান জানানো হয়েছে-চাঁদ সুলতানা এবং তার মতো অন্যান্য বীরমাতা ও বীর জায়াদের সঙ্গে নিয়ে মাতৃভূমিকে এই দূর্দশা থেকে মুক্ত করতে।

গান ঃ যেথা দেবী শক্তি নারী অপমান সহে

মাতৃশক্তির এই গানটিতে সম্পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায়নি। তবে নজরুলের নিজস্ব সৃষ্ট রাগ "রুদ্র ভৈরব"। রুদ্র ভৈরব রাগের উপর রচিত "এসো হে রুদ্র ভৈরবী "- এই গানটির শেষ অংশে উপরিলিখিত গানটির কিছু অংশ পাওয়া যায়। সেই চরণ গুলোতে কাজী নজরুল ইসলাম শিবশক্তির বন্দনা গেয়েছেন।

গান ঃ গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়

আলোচ্য গানটিতে মহিয়সী মুসলিম নারীদের গুনকীর্ত্তন করা হয়েছে। রাসুলউলাহ মোহাম্মদের স্ত্রী খাদিজা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বীর নারীর মহিমা এবং বীরত্বের বিবরণ দেয়া হয়েছে এই গানটিতে এবং বলা হয়েছে-নারীকে হেরেমে বন্দী করে বা শৃঙ্খলিত করে কোন সমাজ, দেশ তথা জাতি যেমন উন্নতি লাভ করতে পারে না, তেমনি নারীকে হেয় করে কোন সমাজ বা ধর্মও মহান হতে পারে না। নারীকে পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা অধিকার দিলে, সে পরিবার ও সমাজের সম্মান বৃদ্ধি করিবে এবং দেশ তথা জাতির উন্নয়নের জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখিতে পারিবে।

গান ঃ জাগিলে পারুল কি গো 'সাত ভাই চম্পা' ডাকে

গণিতশাস্ত্রে প্রথম বাঙ্গালী মুসলিম রমনী বেগম ফজিলাতুন্নেছাকে কাজী নজরুল ইসলাম উচ্চতম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে বসিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শুধুমাত্র শিক্ষা অর্জন ও সংস্কার মুক্তি মাধ্যমেই ভারতবর্ষের মুসলিম নারীরা দেশের স্বাধীনতা এবং সমাজের মুক্তিতে যথাযথ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আলোচ্য গানটি ফজিলাতুন্নেছা বেগমের উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা উপলক্ষ্যে লেখা। গানটিতে কবি বলেছেন যে আঁধারের বন্দিনী ভারতবর্ষের নারীদের জেগে উঠার সময় হয়েছে। তাই শিক্ষা সমাপনান্তে ফজিলাতুন্নেছা বেগম যেন দেশে ফিরে এসে ভারতবর্ষের নারী মুক্তিতে তার ভূমিকা রাখেন।

তথ্য-নির্দেশ

১. নজরুল রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড-দ্বিতীয়ার্ধ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১৭৭। সূত্র : ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার ৫নং ম্যাঙ্গো লেনে দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার অফিস গৃহে 'জন-সাহিত্য-সংসদ'-এর শুভ উদ্বোধনে সভাপতি কাজী নজরুল ইসলামের প্রদত্ত 'জন-সাহিত্য' শীর্ষক অভিভাষণের অংশবিশেষ।

২. হাজার বছরে সম্পাদিত বাংলা গান, প্রভাতকুমার গোস্বামী সম্পাদিত, প্রকাশকাল : ১৩৭৬, পৃষ্ঠা-৩৪।

৩. নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১১৫।

৪. নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, মে ২০০০, পৃষ্ঠা-২৯।

৫. কাজী নজরুলের গান, নারায়ণ চৌধুরী, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৯৮।

৬. নজরুল প্রভাকর, নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, হসন্তিকা প্রকাশিকা, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-১৯।

৭. বাংলাগানের স্বরূপ, বুদ্ধদেব রায়, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৪৫।

৮. নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১২৮।

৯. শত কথায় নজরুল, সম্পাদনায় : কল্যাণী কাজী, সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মহালয়া-১৪০৫, পৃষ্ঠা-২১৭-২১৮। [মূল প্রবন্ধ : দেশাত্ববোধ ও কবি নজরুল, পরিমল গোস্বামী]

১০. কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃজন, রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০১২, পৃষ্ঠা-৩৭৯।

১১. জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কলপতরু সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জানয়ারি-১৯৯২, পৃষ্ঠা-৭৫।

১২. নজরুল গীতি–অখন্ড, আবদুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রকাশকাল : বৈশাখ-১৪১৩, পৃষ্ঠা-৩৭০।

১৩. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সংগ্রহ ও সম্পদনা : রশিদুন্ নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর-২০০৬, পৃষ্ঠা-৩২।

১৪. জাতীয় কবি নজরুল, আসাদুল হক সম্পাদিত, মূল প্রবন্ধ : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ২০১০, পৃষ্ঠা-৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুলের রাজনৈতিক চেতনার পটভূমি ও উন্মেষ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রীঃ]-এর কাব্য ও সাহিত্যে একটি কালের স্বপ্ন ও সাধনা প্রতিফলিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে কালান্তরের বাণী। নজরুলের স্বপ্ন ও সাধনা, চিন্তা ও চেতনা এবং বিপ্লবী ও সংগ্রামী মনেবৃত্তি তাঁর কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে ও অভিভাষণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর অগ্নিঝরা লেখনীতে দেশের যুবসমাজের মনে কালচেতনায় উদ্দীপিত করেছে। নজরুলের মতো এত নির্ভীকভাবে, এত সচেতনভাবে তৎকালীন যুবসমাজের আত্মবলিদান ও মাতৃভূমির মুক্তি-সংগ্রামের গৌরবগাথা আর কোন কবি তেমনভাবে রচনা করেছেন ব'লে মনে হয় না।

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ভারতে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার লক্ষ্যে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। এই প্রচেষ্টার পিছনে প্রেরণা ও শিক্ষা ছিল ১৭৬০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত সন্যাসী বা ফকির বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন, ফরায়েজী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৯-৬০ সালের নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি। আরো ছিল ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত সংঘটিত বঙ্গভঙ্গবিরোধী জাতীয় জাগরণ। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের চরমহিংস্র দমনীতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহা এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিভেদনীতির বিরুদ্ধে ক্রোধ দেশের যুবসমাজকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী চেতনায় সংগঠিত করেছিল। এই পটভূমিতে ভারত উপমহাদেশের নানা স্থানে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী দল গঠিত হয়েছিল। সৃষ্টি করেছিল অগ্নিযুগের। এই বিপ্লবী ও সংগ্রামী চেতনা তথা জাতীয়বাদী চেতনায় যাঁরা উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত হয়েছিল, তাঁরা মনে প্রাণে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের বিশ্বাস করতেন। তাঁদের কর্মধারায় ছিল ব্রিটিশ অফিসার এবং তাদের পদলেহী ভারতীয় পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চরম শাস্তিদান। এরূপ কর্মপ্রচেষ্টায় অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর নামে দু'টি বিপ্লবী দলের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাদের কর্মসূচীর প্রথম প্রকাশ ১৯০৮ সালে বিহারের মজাফ্ফর পুরে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে ঘটে। কাজী নজরুল ইসলাম তখন একজন বালক মাত্র। সেই সময় দুই বাঙ্গালী তরুণের বোমা মারার দুঃসহাহসী ভূমিকায় সারা ভারতে চাঞ্চ্যলের সৃষ্টি হয়েছিল। ধৃত হওয়ার মূহুর্তে প্রফুলচাকী নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করেন এবং ক্ষুদিরামের লোক দেখানো বিচার ও ফাঁসীতে মৃত্যুদন্ড হয়।

কিশোর নজরুল তখন লেটোদলে যোগ দেন। ১৯০৮ সালে তিনি পিতৃহারা হয়ে কিশোর বয়সেই সংসারের হাল ধরতে পিতৃব্য বজলে করিমের হাত ধ'রে গ্রাম্য লেটোদলে যোগ দেন। তাঁর রচিত ও গীত লেটোগান ও পালাগানে তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিত্র সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে।

নজরুলের জীবন, চরিত্র ও লেখাপড়ায় ছিল বোহেমীয়ান স্বভাব। কিন্তু দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি নজরুলের ছিল অগাদ ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। সেই কিশোর বয়সেই তাঁর মনে উদয় হয়েছিল দেশ-চেতনা। দেশ থেকে ইংরেজ হটাও, ইংরেজ সাম্রাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরো, দেশের যুব সমাজকে সংগঠিত করো- এ সবই ছিল দশম শ্রেণী পড়ুয়া নজরুলের চিত্তের একান্ত ও ঐকান্তিক বাসনা। নজরুলের স্বাজাত্যবোধ ছিল অত্যন্ত প্রকট। তাই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯১৭ সালে সাম্রাজবাদী যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার গঠিত ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে কাজী নজরুল ইসলাম যোগদান করেন।

নজরুলের সৈনিকবৃত্তি গ্রহন করার বিষয়ে পরবর্তীকালে নানা ঘটনা-রটনা থাকলেও তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন দেশ প্রেমের প্রেরণায় যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজে লাগানোর ইচ্ছায়। যুদ্ধ ও অস্ত্র চালানোর কৌশল শিক্ষাকে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অভিপ্রায়ে সৈনিকের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন। নজরুলের এই ইচ্ছার প্রমান পাওয়া যায় ১৯২০ সালে বাঙালি পল্টন ভেঙ্গে দেয়ার পর অন্য সৈনিকদের মতো নজরুলকে সাব-রেজিষ্টার পদে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করতে বলা হলে- তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, ইংরেজদের অধীনে নজরুল কখনই চাকুরী করবেন না- এই ছিল তাঁর রাজনীতিক ও দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠার প্রারম্ভিক লক্ষণ ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। পরবর্তীতে নজরুল রাজনীতিতে নিজেকে জড়িত করেন।

করাচী সেনানিবাসে থাকাকালে কাজী নজরুল ইসলাম সোভিয়েত ও মধ্য-এশিয়ার বিপ্লব ও লালফৌজের অভিযানের খবর-সেসময় ভারতীয়রা সীমান্ত অতিক্রম করে লালফৌজে যোগ দিয়েছিল- তাদের বীরত্বের কথা; নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য এবং বিপ্লবোত্তর কৃষি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঘোষনা পত্র সম্পর্কে জানতে পারেন। এতে নজরুল বেশ উৎসাহিত হন। সে-সময় নজরুলের মধ্যে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ, বিপ্লবের তাৎপর্য এবং কমিউনিজম বিষয়ে উপলব্ধি ঘটে। তিনি নিজেকে মনে মনে কমিউনিজমের আদর্শের সাথে মিলিয়ে ফেলেন। মধ্য এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবিপ্লবীদের পরাজয় ও লালফৌজের জয়ের খবর পেলে নজরুল ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে ব্যারাকে উৎসব পালন করতেন। করাচীতে ব্যারাকে থাকাকালীন ফার্সি সাহিত্য পাঠ, বাংলা সাহিত্য চর্চা, সঙ্গীত অনুশীলন, দেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে নজরুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং যুদ্ধ কৌশল শিখে সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ হয় ফিরে আসেন কোলকাতায়। তখন তিনি একুশ বছরের যৌবনদীপ্ত যুবক।

তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের মধ্যে থেকে ভারত উপমহাদেশে যাঁরা কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের কথা ভেবেছিলেন-কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম উদ্যোক্তা। একাজে নজরুলের দক্ষিন হস্ত ছিলেন কমরেড মুজাফ্ফর আহমেদ। ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টন ভেঙে দেয়ার পর নজরুল ইসলাম কমরেড

মুজফ্ফর আহমদের কথামত কলকাতায় চলে আসেন এবং দুজনের মধ্যে চলতে থাকে রাজনৈতিক পাঠ গ্রহন। কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সহযোগিতায় নজরুল খবরের কাগজে চাকুরী নেন এবং দুজনের মধ্যে বুঝাপড়া ছিল যে, খবরের কাগজ চালানোর ভিতর দিয়ে তাঁরা রাজনৈতিক কার্যক্রমও চালিয়ে যাবেন। ১৯২০ সালেই তাঁদের দুজনের এই মিশন শুরু হয়।

রাজনীতি করার প্রত্যক্ষ অভিপ্রায় নিয়ে বিশেষ করে কমিউনিস্ট রাজনীতি করার সংকল্পে কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজফ্ফর আহমদ যুক্তভাবে ১৯২০ সালে নবযুগ নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। এরপর একে একে ধূমকেতু, লাঙল, গণবাণী, পত্রিকায় কখনো মুজফ্ফর আহমদ নজরুলের সহযোগী; কখনো নজরুল ইসলাম মুজফ্ফর আহমদের সহযোগী হিসাবে একত্রে কাজ করেছেন। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল এক- কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এই পত্রিকাগুলির লেখায় একদিকে যেমন বিপ্লবী যুবসমাজ উৎসাহিত হয়েছে, নতুনভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রেরণা পেয়েছে; অন্যদিকে কৃষক শ্রমিকদের সংগঠিত করা ও সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রচার পেয়েছে বহুগুণে-যা ছিল উপমহাদেশে সম্পূর্ণ এক নতুন ধ্যান- ধারণা ও স্বপ্নের সূচনালগ্ন।

'ধুমকেতু' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিল, "সর্বপ্রথম, ধূমকেত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে একেক মহারথী এক এক রকম ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষের পূর্ন দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত ভারতীয়দের হাতে, তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না'।[১] 'ধুমকেতু' -তে নজরুল ইসলাম যখন ভারতের পূর্ন স্বাধীনতা দাবী করেছেন, কংগ্রেস তখন স্বরাজ, না ডোমিনিয়ন স্টোটাস- তা নিয়ে ভাবছে। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এই স্বাধীনতার দাবীতে ১৯২১ সালে আহমেদাবাদ, ১৯২২ সালে গয়া, ১৯২৬ সালে গৌহাটি ও ১৯৩১ সালে করাচীর অধিবেশন ইস্তেহার প্রচার করেছিল। ১৯২১ সালে মওলানা হসরৎ মোহানী কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের পূর্ন স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হন। কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে তিরস্কারও করেছিল। অথচ কাজী নজরুল ইসলাম ভারতের পূর্ন স্বাধীনতার দাবীতে নির্দ্বিধায় সম্পাদকীয় লিখতে পেরেছিলেন ১৯২২ সালে। নজরুলের 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থে কমিউনিস্ট পার্টির সার্বিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কাজী নজরুল ইসলাম সে- সময় স্বাধীকার আন্দোলনে নিজেকে নিয়োগ করেন সংগ্রামী চেতনার কবি হিসাবে। রচনা করেন "ক্ষুদিরামের মা" উড়িষ্যার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর তীরে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে যে-মরণপণ যুদ্ধ হয়-তাকে স্মরণ করে নজরুল রচনা করেন নব 'ভারতের হলদিঘাট' ও 'যতীন দাশ' নামে কবিতা। ১৯২১ সালের শেষ দিকে রচনা করেন বিস্ময়কর কবিতা বিদ্রোহী। এ সময় স্বদেশী ও উদ্দীপনামূলক সঙ্গীত রচনা করেন- যার মূল প্রতিপাদ্য দেশ ও জাতির মুক্তি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, দৈনিক, সাময়িকী ইত্যাদির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযোগ নজরুলকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চেতনায় বলিয়ান করে তোলে। তৎকালীন বিজলী, কল্লোল, নবযুগ, ধুমকেতু, লাঙল, মুসলিম ভারত, গণবাণী, সাধনা, বসুমতী, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকার

সাথে নজরুল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ফলে নজরুলের সাথে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ প্রমুখের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ ঘটে। এঁদের চলতো কাব্য, সাহিত্য ও রাজনীতির নিয়মিত আড্ডা। আর নজরুল ছিলেন এসকল আড্ডার মধ্যমনি। নজরুলের মধ্যে এ সময় রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা প্রবল হয়ে উঠে। তিনি প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। তাঁর সংগ্রমী চেতনার লেখনী - ইংরেজ সরকারকে এক প্রকার অতিষ্ঠ ও অস্থির ক'রে তোলে।

কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে কাজী নজরুল ইসলামের প্রচেষ্টা ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছিল। সে সময় নজরুলের পিছনে গোয়েন্দারা ছায়ার মতো লেগে থাকতো। তখন গোয়েন্দা বিভাগ থেকে ভাইসরয় দপ্তরে নজরুল সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট যেতো কিন্তু নজরুলের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে, গোয়েন্দারা খুব মুশকিলে প'ড়ে যেতো। তৎকালীন ভারতীয় গোয়েন্দা-প্রধান স্যার সিসিল কেইলনের সেক্রেটারী অব স্টেটাসকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিজম প্রচারকেন্দ্রিক পত্র-পত্রিকার খবরাখবর লিখে জানাতেন। বিশেষ করে নজরুলের ধূমকেতু পত্রিকার বিষয়টি তিনি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছিলেন। ধূমকেতু পত্রিকা তিনবার অভিযুক্ত হয় এবং এই পত্রিকায় তাঁর আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা প্রকাশের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় এবং কারা দন্ড দেয়া হয়। নজরুলকে গ্রেপ্তার করা হবে- একথা নজরুল আগে থেকেই জানতো। তাঁকে সবাই গা ঢাকা দিতে বলেছিল কিন্তু নজরুল তা করেননি। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল নজরুলের কাজকর্ম ও কবি- প্রতিভার কথা জানতো এবং এই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পক্ষে এম.এন.রায় বার্লিন থেকে কমরেড মুজফ্ফর আহমদকে পত্র দিয়েছিলেন যেন কবিকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু নজরুল তাতেও রাজী হননি। মূলতঃ নজরুল ছিলেন খুব সাহসী ও নির্ভীক, ব্রিটিশ সরকারকে তিনি পরোয়া করতেন না। নজরুলের রাজনৈতিক চেতনাবোধ ও দেশমাত্রিকা তথা মা-মাটি মানুষের প্রতি তাঁর অকৃতিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ এভাবেই তাঁর কণ্ঠ ও লেখনীতে প্রকাশ পেতো।

কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেসের ভিতর ও বাহিরে সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রচারের সাধারণ মঞ্চ হিসাবে লেবার স্বরাজ পাটি গঠিত হয়েছিল। এই পার্টি গঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন- কতুবউদ্দিন আহমদ [বর্ধমান], হেমন্তকুমাপর সরকার [নদীয়া], কাজী নজরুল ইসলাম [কোলকাতা], সামসুদ্দিন হুসেন[বীরভূম] এবং আব্দুল হালিম [বীরভূম]। এই দলের প্রথম ইস্তেহার কাজী নজরুল ইসলামের নামে প্রচারিত হয়েছিল। পরবর্তী দলের নাম পরিবর্তন হয়ে বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল এবং আরো পরে ওয়ার্কাস এ পিজেন্টস পার্টি নাম ধারণ করে।

কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক চেতনার বাস্তব রূপকল্প প্রকাশিত হয় লেবার স্বরাজ পার্টি-র আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচী; শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টির কর্ম-সংকল্প এবং কৃষক-শ্রমিকের চরম দাবীসমূহের খসড়া প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে- যা নজরুলের নামেই প্রকাশ ও প্রচারিত হয়েছিল। খসড়াগুলি নিম্নে তুলে ধরা হলো–

শিরোনাম ঃ ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়

[উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী]

গঠন প্রণালী ঃ

১. 'নাম ঃ ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টি এই দলের নাম হইবে।

২. উদ্দেশ্য ঃ নারী পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ন স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।

৩. উপায় ঃ নিরস্ত্র গন-আন্দোলনের সমবেত শক্তিপ্রয়োগ উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মূখ্য উপায় হইবে।

৪. সভ্যপদ ঃ ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির যে কোন সভ্য এই দলের উদ্দেশ্য, গঠন-প্রণালী এবং কার্যপদ্ধতি অনুমোদন করেন, তিনিই কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির মত হইলে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টির সভ্য হইতে পারিবেন। শ্রমিক এবং চাষীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারণের কথা যতদিন স্বরাজদলের কার্যপদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত থাকিবে, ততদিন এই দলের সভ্যগণের স্বরাজ্যদলের সভ্য হওয়ায় বাধা নাই।

৫. চাঁদা ঃ এই দলের প্রত্যেক সভ্য বার্ষিক এক টাকা দিবেন। শ্রমিক ও কৃষক হইলে বার্ষিক এক আনা চাঁদা লাগিবে। প্রয়োজন স্থলে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সমিতি চাঁদা না লইতেও পারেন।

৬. কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ঃ কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত কম-বেশী পনের জন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। দলের সৃষ্টিকর্তাগণ তাহাদের প্রথম সভায় তিন বৎসরের জন্য ইহাদিগকে নির্বাচন করিবেন। পঞ্চায়েতগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির এক বা ততোধিক বিভাগের ভার লইবেন এবং তদ্বিষয়ে চরম ক্ষমতা পাইবেন। [১] প্রচার, [২] অর্থ, [৩] দল গঠন, [৪] শ্রমিক, [৫] চাষী, [৬] ব্যবস্থাপক সভা। পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সভ্যের এক ভোট থাকিবে। সমান সমান স্থলে যে-ব্যক্তি সভাপতির কাজ করিবেন, তিনি কাস্টিং ভোট দিতে পারিবেন। তিনজন সভ্য থাকিলেই পঞ্চায়েতের কার্য চলিতে পারিবে।

৭. প্রাদেশিক পঞ্চায়েত ঃ কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতের দ্বারা নিযুক্ত পাঁচ হইতে নয় জন সভ্য লইয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি নির্দিষ্ট প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক পঞ্চায়েত গঠিত হইবে।

৮. প্রাদেশিক পরিষদ ঃ প্রাদেশিক পঞ্চায়েতের দ্বারা প্রথম অবস্থায় এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত প্রত্যেক জেলার জন্য এক বা একাধিক প্রতিনিধি লইয়া প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হইবে।

৯. জেলার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ জেলা, মহকুমা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য পরিষদ গঠনের চেষ্টা করিবেন। এই সকল পরিষদ গঠিত হইলে প্রাদেশিক পরিষদ, প্রাদেশিক পঞ্চায়েত এবং কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতে সভ্য নির্বাচন -প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১০. উপরোক্ত নিয়মাবলীর বহির্ভূত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত করিবেন এবং সে-বিষয়ে তাহাদের মতই চরম বলবান হইবে'। [২]

কর্ম্মনীতি ও সংকল্প

১. 'এই দল শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বার্থের জন্য বুঝিবেন [শিক্ষিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে কোন ব্যক্তি নিজের হাত-পা বা মাথা খাটাইয়া নিজের জীবিকা অর্জন করে, তাহাকে শ্রমিক বলিয়া গণ্য করা হইবে।]

২. জাতীয় কার্যে নিযুক্ত অন্যান্য দলের সহিত এই দল যতটা সম্ভব সহযোগিতা করিবেন।

৩. শ্রমিক ও কৃষকগণের চরম দাবীগুলির জন্যঅন্যান্য দাবী ছাড়াও যাহারা বুঝিবেন, ব্যবস্থাপক সভার এমনসব প্রতিনিধির নির্বাচনে এই দল সাহায্য করিবেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় তাহারা এই দলের প্রতিনিধি বলিয়া গন্য হইবে।

৪. ব্যবস্থা পরিষদে এই দলের প্রতিনিধিগণ নিজেদের জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

৫. সম্ভব হইলে প্রতিনিধিগণ চেষ্টা করিবেন:

   ক. যতদিন না শ্রমিক ও কৃষকগণের অধিকারসমূহ স্বীকার করিয়া শাসন-প্রণালী পরিবর্তিত না হয়, ততদিন টাকা মঞ্জুরী বাজেটে না দেওয়া।

   খ. আমলা-তন্ত্র শাসন-প্রণালীর শক্তি ও প্রভাব বিস্তার করে- সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধী হওয়া।

   গ. জাতীয় জীবনের শক্তি বৃদ্ধির অনুকূল এবং সে-কারণে আমলা-তন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধির প্রতিকূল- এমন সমস্ত প্রস্তাব আইনের প্রবর্তন করা ও সমর্থন করা।

৬. ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সম্মিলিত সম্মতি বিনা গভর্ণমেন্টের অধীনে কোনও প্রতিনিধি কোনও চাকরী গ্রহণ করিতে পারিবেন না'। [৩]

চরম দাবীসমূহ

১. 'আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টীমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিষ লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মীগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।

২. ভূমির চরম স্বত্ব আত্ম-অভাব পূরণক্ষম স্বায়ত্ব-শাসনবিশিষ্ট পল্লীতন্ত্রের উপরে বর্তিবে- এই পল্লীতন্ত্র ভদ্র-শুদ্র সকল শ্রেনীর শ্রমজীবির হাতে থাকিবে। যেমন ঃ

[১] শ্রমিক :

ক. জীবন-যাত্রার পক্ষে যথোপযুক্ত মজুরীর একটা নিম্নতম হার আইনের দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া।

খ. প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের পক্ষে সপ্তাহে পাঁচদিন খাটুনি চরম বলিয়া করা; নারী এবং অল্প বয়স্ক ছেলেপিলের জন্য বিশেষ শর্ত নির্ধারিত করা।

গ. শ্রমিকগণের আবাস, কাজের শর্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত প্রভৃতি বিষয়ে কতকগুলি দাবী মালিকগণকে আইন দ্বারা বাধ্য করিয়া পূরন করানো।

ঘ. অসুখ-বিসুখ, দুর্ঘটনা, বেকার অবস্থা এবং বৃদ্ধ অবস্থায় শ্রমিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন।

ঙ. সমস্ত বড় কলকারখানার লাভের ভাগে শ্রমিকগণকে অধিকারী করা।

চ. মালিকগণের খরচে শ্রমজীবীগণের বাধ্যতামূলক শিক্ষা।

ছ. কলকারখানার নিকট হইতে পতিতালয়, নেশার দোকান উঠাইয়া দেওয়া।

জ. শ্রমিকগণের আর্থিক অবস্থা উন্নতির জন্য কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।

ঝ. শ্রমিক-সংঘগুলিকে আইনতঃ মানিয়া লওয়া এবং শ্রমিকগণকে দাবী পূরণের জন্য ধর্মঘট করিবার অধিকার স্বীকার করা।

[২] কৃষক:

ক. ভূমি-কর সম্বন্ধে একটা উর্দ্ধতম হার বাঁধিয়া দেওয়া এবং বাকী খাজনার সুদ ইম্পিরিয়াল ব্যাংকের সুদের হারের সহিত সমান নির্ধারন করা।

খ. [১] জমিতে কায়েমী স্বত্ত্ব; [২] উচ্ছেদ নিরোধ; [৩] অন্যায় এবং বে-আইনী বাজে আদায় বন্ধ; [৪] স্বেচ্ছায় বিনা সেলামীতে হস্তান্তর করার অধিকার; [৫] গাছ কাটা, কুয়ো খোঁড়া, পুকুর কাটা, পাকা বাড়ী করার বিনা সেলামীতে অধিকার।

গ. জাল-করে মাছ ধরিবার নির্ধারিত শর্ত।

ঘ. মহাজনের সুদের চরম হার নির্ধারণ।

ঙ. কো-অপারেটিভ কৃষি ব্যাংক স্থাপনের দ্বারা কৃষককে ঋণদান এবং মহাজন ও লোভী ব্যবসাদারগণের হাত হইতে কৃষককে উদ্ধার।

চ. চাষের জন্য যন্ত্রপাতি কো-অপারেটিভ ব্যাংকের মারফৎ কৃষকের নিকট বিক্রয় অথবা ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া; মূল্য অথবা ভাড়ার টাকা কিস্তিবন্দী হিসাবে অল্প অল্প করিয়া লওয়ার বন্দোবস্ত।

ছ. পাটের চাষে কৃষকের উপযুক্ত লাভের বন্দোবস্ত'।[৪]

কাজী নজরুল ইসলামের নামে প্রকাশিত ও প্রচারিত খসড়ার সবশেষে লেখা ছিল, 'এই দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন : নজরুল ইসলাম, ৩৭ নং হ্যরিসন রোড, কলিকাতা'।[৫]

নজরুলের চেতনায় সাম্যবাদ ও মানবতাবাদ

নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, কৃষক-শ্রমিক-চাষীদের ন্যায্য অধিকার এবং তাদের স্বার্থ-সংশিষ্ট বিয়য়াদির প্রতি নজরুলের সুদৃষ্টি, রাজনৈতিকভাবে কৃষক-শ্রমিক-চাষীদের দাবী-দাওয়া আদায় ও সংরক্ষণে নজরুলের মননশীলতাই তাঁকে একজন সৎ, খাঁটি ও বিবেকপূর্ণ সনাতন সাম্যবাদী মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

ব্রিটিশ সাম্রাজবাদী শাসন ও শোষন নিয়ন্ত্রিত বাংলার অসম্পূর্ণ পুনর্জাগরণের আহুত সকল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী যখন নষ্টস্বপ্নে মজ্জমান, তাদের চেতনাস্রোতে যখন অন্ধকার বৃত্তে আবর্তিত, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব যখন একে অপরকে কুরে খাচ্ছে, সামাজিক অবক্ষয়ে দেশের যুবসমাজ যখন হতাশাগ্রস্থ- বাংলা সাহিত্য এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্রপটে তখন নজরুলের আর্বিভাব ঘটে প্রমিথিউসের মতো। অর্ফিয়াসের বাঁশী হাতে তিনি জাগিয়ে তোলেন দেশের মানুষকে, ঘুনে ধরা সমাজে তখন নজরুল ইসলামই শুনিয়েছিলেন আশার বাণী, দিয়েছিলেন সংগ্রামী চেতনায় অধিকার আদায়ের দীক্ষা।

সর্বজনীন পরিচিত বলয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রীঃ] প্রথমতঃ কবিত্ব গুণ এবং দ্বিতীয়তঃ সাঙ্গীতিক গুণ-এই দ্বৈত মৌলিক প্রতিভা সম্পন্ন জন-মন-নন্দিত অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগস্রষ্টা কবিসহ তিনি একাধারে গীতিকার, সুরকার, সঙ্গীত প্রশিক্ষক, সঙ্গীতশিল্পী, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সাংবাদিক, পত্র-সাহিত্যিক, উপন্যাসিক, সম্পাদক, চলচ্চিত্রকার, অভিনেতাসহ অসংখ্য গুণে গুণান্বিত। বিশ্বের মানবতাবাদী কবিদের মধ্যেও তিনি অন্যতম একজন। আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও অন্যতম রুপকার কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বের সকল মানুষকে একজাতি এবং বিশ্বের সকল সম্পদকে সকল মানুষের সম্পদরূপে দেখা ও গণ্য করার মন্ত্র শিখিয়ে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত হিসাবে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। জাতি হিসাবে বিশ্বে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার যে আকুতি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচার ও ক্রমাগত বেড়ে ওঠার যে -অভিপ্রায়, ধর্মীয় মূল উৎপাটন ক'রে দাঁড়াবার যে, আকুতি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনাচার ও ক্রমাগত বেড়ে ওঠার যে-অভিপ্রায়, ধর্মীয় গোঁড়ামীর মূল উৎপাটন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করার যে-মানসিক দৃঢ়চিত্ততা, ধর্মীয় মূল্যবোধকে আশ্রয় ক'রে মানব মনের ভিতর ও বাহির তথা ইন্দ্রীয়জাত ও অতীন্দ্রীয়জাত যে -অসীম চেতনা এরূপ ভাবাবেগকে শানিত করা ও উন্মেষকে জাগ্রত করার অন্তরালে নিহিত আছে কাজী নজরুল ইসলামের কবিচিত্ত ও তাঁর মননশীল সৃষ্টির অতুলনীয় অবদান। নজরুল আমাদের জাতীয় কবি, জাতীয় চেতনার কবি, জাতীয় মূল্যবোধের কবি। আমাদের ভিতর ও বাহিরের সকল কর্মকান্ডে নজরুল মিশে আছে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে।

কাজী নজরুল ইসলাম প্রেম-বিদ্রোহের কবি হিসাবে শীর্ষে অবস্থান করলেও একজন মানবতাবাদী দার্শনিক কবিখ্যাতি তাঁর কম নয়। কারণ, যিনি একজন বড় মাপের কবি তিনি একইসাথে একজন প্রগাঢ় দার্শনিকও বটে। মোটকথা চিন্তাশীল মানুষ বিশেষ ক'রে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী মাত্রই একজন দার্শনিক-তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজী নজরুল ইসলাম পৃথিবীর বুক থেকে সকল অন্যায়-অত্যাচার, অনিয়ম-অবিচার, নির্যাতন-নিপীড়ন দূর ক'রে সেখানে মানুষকে সুখ-শান্তিতে বসবাস করার যে-রঙীন চিত্রকল্প অংকন করেছেন, তা পর্যালোচনা করলে তাঁকে মানবকল্যাণকামী বা মানবতাবাদী দার্শনিক না ব'লে উপায় নেই।

বাংলা শব্দ দর্শন -এর উৎপত্তিগত অর্থ হলো দেখা। দর্শন- এর অর্থ দেখা হলেও কোন বস্তু বা ঘটনাকে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করাকে বুঝায় না; বুঝায় যুক্তির আলোকে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মানুষের মনে যে-সকল মৌলিক বা চিরন্তন প্রশ্ন জাগে তার যুক্তিসম্মত উত্তর অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে। সংক্ষেপে বলা যায়, বিচার-বিশেষণের মাধ্যমে বিশ্বাস ও ধারাণাকে মূল্যায়ন করা। অর্থাৎ জগৎ-জীবনের স্বরূপ মূল্যায়ন ও উপলব্ধী করার নামই দর্শন। দর্শন মূলতঃ সংস্কৃতি শব্দ থেকে বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে; যার প্রকৃত অর্থ জ্ঞানানুরাগ বা প্রজ্ঞানুরাগ অথবা সত্যানুরাগ। দর্শনের ইংরেজী শব্দ হলো ফিলোসফি যা গ্রীক শব্দ ফিলোস এবং সফিয়া থেকে এসেছে। ফিলোস শব্দের অর্থ অনুরাগ এবং সফিয়া শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। অর্থাৎ ফিলোসফি শব্দের প্রকৃত অর্থ হলে জ্ঞান বা প্রজ্ঞার প্রতি অনুরাগ। এভাবে বিচার -বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, প্রজ্ঞানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই একজন সার্থক দার্শনিক। সংক্ষেপে প্রজ্ঞাপ্রীতিই দর্শন এবং প্রজ্ঞাপ্রেমিকই দার্শনিক। দর্শনের সংজ্ঞানুসারে কাজী নজরুল ইসলাম কোনক্রমেই এর ব্যতিক্রম নন।

মানবতাবাদী দার্শনিক কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য-সাহিত্যের অন্তরালে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কবির বিস্ময়, সংশয় ও কৌতুহলবোধসহ কবির অনুসন্ধিৎসু ও বিচার-বিবেচনা দৃষ্টিভঙ্গি। তাঁর কাব্য-সাহিত্য ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হলেও তা যুক্তিনির্ভর। জগত ও জীবনের স্বরূপ উন্মোচনই নজরুল সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। কবির কাব্য-সাহিত্যে যেমন আছে সৃজন-নৈপুন্য, তেমনি আছে জ্ঞানের প্রয়োগসহ আবেগের পরশ। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর সৃষ্টিকর্মে মানুষের জীবন ও মূল্যবোধের সকল উপকরণের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন সর্বজনীনভাবে এবং সম্পৃক্ত করেছেন শাশ্বত ধারায়।

নজরুলের কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটকসহ সমগ্র কাব্য-সাহিত্য পর্যালোচনা করলে পাওয়া যায় কবির কল্যাণকামী দর্শনসহ বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক জ্ঞান: পাওয়া যায় মানবতাবাদী ও কল্যাণকামী দর্শনের প্রচুর উপকরণ।

মানবতাবোধ থেকেই মানবতাবাদী দর্শনের উদ্ভব। মানবতাবাদ এমনই একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বা মানুষের মর্যাদা ও ক্রিয়াকর্মের প্রতি সবিশেষ আস্থাশীল এবং মানুষের চেয়ে শ্রেয়তর বাহ্যিক কোন ঐশ্বরিক শক্তিকে বিশ্বাস করতে নারাজ। যা কিছু মানুষকে পীড়িত করে, তার বিলোপ সাধন মানবতাবাদী দর্শনের

অন্যতম প্রদান লক্ষ্য। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই- মানবতাবাদী দর্শনেরই মূলমন্ত্র। জীবনদর্শনের মনন ও অনুশীলনসহ পৃথিবীর বুক থেকে সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটিয়ে দিশেহারা মানুষকে নিরাপদ ও সুখ-শান্তিতে বসবাসের সুযোগ ক'রে দেয় মানবতাবাদী দর্শন।

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য-সাহিত্য পর্যালোচনা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যা কিছু দেখেছেন সাধারন দৃষ্টি দিয়ে দেখেননি; প্রজ্ঞা দিয়ে দেখেছেন, দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। প্রকৃতিপক্ষে নজরুল ছিলেন একজন জ্ঞানানুরাগী ও প্রজ্ঞানুরাগী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি তার কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতে যুগ-যন্ত্রনার সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়ে দেশ, জাতি ও জনজীবনের আশা-আকাঙ্খাকে সম্মুখপানে টেনে এনে নিজেকে মানবতাবাদী দার্শনিক হিসাবে আঞ্চলিকতার সীমা পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতার ব্যাপক পরিসরে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। সমাজের অবহেলিত নিপীড়িত মানবত্মার মুক্তির লক্ষ্যে নজরুল ইসলাম তাঁর সৃজনশীল প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে মানবতার জয়গান গেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন মানবতার সপক্ষে একজন উঁচু মাপের দার্শনিক হিসাবে। একসময় এ উপমহাদেশের বিশাল জনগোষ্টির মাথা ছিল ব্রিটিশ স্বৈরশাসনের প্রতি অবনত। মানবতাবাদী দার্শনিক হিসাবে কাজী নজরুল ইসলাম তাদের পাশে দাঁড়িয়ে অভয়বাণী উচ্চারণ করেছিলেন - বল বীর! বল উন্নত মম শির'।[৬]

কাজী নজরুল ইসলাম কেবল স্বদেশ-স্বজাতির স্বার্থ সুরক্ষায় নিয়োজিত ছিলেন না- তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের নাগরিক। তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল নিখিল বিশ্বের বেদনাক্লিষ্ট, বঞ্চিত ও লাঞ্চিত মানবের ব্যাপক ও স্থায়ী কল্যাণ সাধন। নজরুল বলেছেন, আমরা সকল দেশের সকল জাতির সকল ধর্মের সকল কালের।

মানবতাবাদী নজরুলের মানবকল্যাণের সবচেয়ে বড় দিক হলো- সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, রীতি-নীতিসহ কোন কিছুর জন্যই তিনি মানুষকে কখনো তার স্বাতন্ত্রবোধ ও স্বকীয়তাবোধকে বিসর্জন দেয়ার উপদেশ দেননি। তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যেই ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন, সমাজের জন্য মানুষ নয় বরং মানুষের জন্য সমাজ।

নজরুলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবোধ

কাজী নজরুল ইসলাম জীবনভর মানবজাতির ঐক্য ও অখন্ডতার জয়গান গেয়েছেন; নিপীড়িত মানবজাতির ভাগ্যোন্নয়নে সংগ্রাম করেছেন। তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে অনৈক্য-অনৈতিক ও অমঙ্গলজনক কাজ। তাই তিনি বলেছেন-

'গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধাব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান'।[৭]

কাজী নজরুল ইসলাম আরো বলেছেন-

Dhaka University Institutional Repository

'মোরা এক বৃন্তে দু'টি কসুম হিন্দু-মুসলমান

মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ'।[৮]

মানুষের সুখ-শান্তি ও নিরাপদ জীবন জীবন কামনায় বিভোর মানবতাবাদী দার্শনিক কাজী নজরুল ইসলাম মনোপ্রাণে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর ভাষায়-

'গাহি সাম্যের গান-

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'।[৯]

কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নী-বীণা [১৯২২] বিষের বাঁশী [১৯২৪] প্রলয় শিলা [১৯৩০] সর্বহারা [১৯২৬] ফলিমনসা [১৯২৭] সন্ধা [১৯২৯] সাম্যবাদী [১৯২৫], প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বিশেষ করে সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থে ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, বীরাঙ্গনা, মিথ্যাবাদী, নারী, রাজা, প্রজা, সাম্য, কুলি-মজুর প্রভৃতি কবিতার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ ও তার মনুষ্যত্ব। উল্লেখ্য যে, নজরুল-কাব্যে মানবতাবাদের যে-বর্ণিল সামাজিক চিত্র অংকন করা হয়েছে- সেখানেও রয়েছে শ্রেণীনিরপেক্ষতা ও ধর্মনিরপেক্ষতাসহ নর-নারী নিরপেক্ষ মানবতার জয়গান, 'মানুষ মহীয়ান'।

মানবকল্যাণে নিয়োজিত দার্শনিক মাত্রই যেমন দর্শনকে রসহীন বিশুদ্ধ তত্ত্বের অক্টোপাস থেকে মুক্ত করে তাকে যুক্ত করতে চান মানুষের সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার সঙ্গে; কাজী নজরুল ইসলামও ঠিক একইভাবে তার কাব্য সাহিত্যকে বিশুদ্ধতার সংরক্ষিত এলাকা থেকে মুক্ত করে পৌছে দিতে চেয়েছেন রিক্ত নিপীড়িত মানুষের একান্ত দ্বারপ্রান্তে। তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, পত্রসাহিত্য, ভাষন-অভিভাষণসহ সঙ্গীতের দার্শনিক মূল্য নির্ধারণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, মানবধিকার অর্জনের মহতী সংগ্রামের অগ্রবর্তী দার্শনিকদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম একজন অগ্রবর্তী সৈনিক। বিশ্বের নির্যাতিত জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি পুঁজিবাদী শ্রেণী তথা বিশ্ব-মোড়লের কালোহাতকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠির হাতে তুলে দিয়ে গেছেন অধিকার আদায়ের প্রতিবাদী ভাষাসহ বিদ্রোহের মন্ত্র। আর নজরুলের সেই মন্ত্রে মন্ত্রিত হবার লক্ষ্যে সাম্যবাদী চিন্তাধারার স্পুরণ ঘটেছে তার সৃষ্ট যে কয়েকটি সঙ্গীতে সেই সঙ্গীত সম্পর্কে বিস্তারিত নিম্নে আলোচনা করা হলো-

সর্বহারা শ্রমিকের পক্ষে কাজ করার অন্তঃতাগিদ নজরুলের ভেতরে বরাবরই ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই তা সঙ্গীতে রূপ লাভ করেছে। এই ধারার বেশিরভাগ গানই ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে রচনা করেন নজরুল। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার বিশ্ববিশ্রুত ইন্টারন্যাশনাল গানেরও প্রথম ভারতীয় তর্জমার কৃতিত্ব তার। ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীত সারা দুনিয়ার মজুর শ্রেণীর সঙ্গীত। 'মুজাফ্ফর আহমদ বলেছেন, এ ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতটি তিনি নজরুলকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে অনুবাদ করার কথা বলায় নজরুল এটি অনুবাদ করেন। সারা দুনিয়ার মজুর শ্রেনীর মধ্যে যে একটা সঙ্ঘবদ্ধতা আছে তার প্রকাশ ঘটেছে এ গানটিতে। মুজাফ্ফর আহমদ বলেন, বাঙলা ভাষার

সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদ তো বটেই আমার বিশ্বাস, ভারতীয়ভাষা গুলোতে যতসব অনুবাদ হয়েছে সে সবেরও সেরা এটি'।[১০]

কাজী নজরুল ইসলাম এই সঙ্গীতের নাম দেন আন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত

[১] জাগো অনশন বন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!

গীতি-গ্রন্থ : ১. ফনি মনসা, রচনাকাল : ১লা বৈশাখ ১৩৩৪ ও ২. নজরুলগীতিকা। ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের সুর , পত্রিকা ঃ গণবাণী, বৈশাখী, ১৩৩৪, বিষয় ঃ কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের অনুবাদ। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন ২৭৬৬৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : এপ্রিল ১৯৪৭, শিল্পী : সত্য চৌধুরী। গানটি ভীমপলশ্রী সুরে বাধা, অপ্রতিরোধ্য সেই সুরের আবেদন [নারায়ণ চৌধুরী; ১৯৮৬; ৯৮] ইন্টারন্যাশনাল সঙ মূল গানটি ফরাসি শ্রমিক কবি ইউজিন পাঁতিয়ের রচনা করেছিলেন। যার প্রথম লাইনটি ছিল-

Arise, ye prisoners of starvation
Arise, ye wretched of the earth

এই গানটি সম্পর্কে স্মৃতিকথায় মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন 'হয়তো সকলে জানেন যে, ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই গানটির ভিতর দিয়েই মজুর শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। সারা দুনিয়ার মজুর শ্রেণীর মধ্যে যে একটা সংঘবদ্ধতা আছে তাও প্রকাশ পায় এই গানটির ভিতর দিয়ে'।[১১]

গানটির শেষ প্রান্তে কোরাসে গাওয়া হয়েছে–

নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে
শোন্ অত্যাচারী ! শোনরে সঞ্চয়ী
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী ॥

এর মধ্যদিয়ে কবি শোষিত মানুষের বিজয় ঘোষণা করেছেন। কবির প্রত্যাশা একদিন অত্যচারী, সঞ্চয়ীর পতন ঘটবেই। নজরুল তার সর্বহারা গ্রন্থে কৃষক শ্রমিক জেলেদের নিয়ে গান লিখেছেন। সেখানে শোষিত মানুষকে উজ্জীবিত করতে গিয়ে নজরুল দেশের অসহায় অবস্থার কথা বলেছেন, নিজে স্বদেশ চেতনাকেই তুলে ধরেছেন।

[২] ওঠ্রে চাষী জগদ্বাসী ধর ক'ষে লাঙ্গল।
আমরা মরতে আছি- ভাল করেই মরব এবার চল ॥

মোদের উঠান- ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,
আজ মা'র কাঁদনে লোনা হল সাত সাগরের জল ॥

[কৃষানের গান, সর্বহারা]

নজরুল বাংলার কৃষককে যেমন তার শক্তির প্রতীক লাঙল চেপে ধরতে বলেছেন, তেমনি শ্রমিকের গানে হাতুড়ি শাবল ধরতে বলেছেন-

[৩] ওরে ধ্বংশ পথের যাত্রীদল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙাবো চল।
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল ॥

১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশন উপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগরে এই গান দুটি রচিত হয়। একই বৎসর মাদারীপুর অনুষ্ঠিত লিখিত বঙ্গ ধীবর সম্মিলনের অধিবেশনে নজরুলের ধীরবদের গানটি গাওয়া হয়। এই সময় শ্রমিকদের আন্দোলন ও ঐক্যের প্রেক্ষিতে ধীবর বা জেলে ও অন্যান্য উপেক্ষিতরাও সংগঠিত হবার উদ্যোগ নেয়। নজরুল তাদের উদ্দেশ্যেও প্রেরণা ও আশার বানী উচ্চারণ করেছেন।

[৪] আমরা নিচে পড়ে রইব না আর
শোন রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠবো রে সব ঠেলে
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠলো সবাই রে
ঐ মুটে-মজুর হেলে
এবার উঠবো রে সব ঠেলে ॥

নজরুলের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক আরও গান ফণি-মনসা গীতি-গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়।

[৫] ওড়াও ওড়াও লাল নিশান!
দুলাও মোদের রক্ত পতাকা
শীতের শ্বাসেরে বিদ্রুপ কবি ফোটে কুসুম,
নব বসন্ত সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম.....

[রক্তপতাকার গান]

সর্বহারা শ্রেণীর বিজয়ের এই গানটি অনেকটা রূপকাশ্রিত, এছাড়াও ইংরেজী শেলীর ভাবানুবাদ করে নজরুল রচনা করেছেন- 'জাগর-তূর্য' গানটি–

[৬] ওরে ও শ্রমিক সব মহিমার উত্তর-অধিকারী।
অলিখিত যত গল্প কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি ॥

এরূপ আরও কিছু গানের সন্ধান পাই আমরা যেখানে বাংলার শোষিত মানুষের কথা স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ।

[৭] অত্যাচার আর উৎপীড়নে যে আজিকে আমরা পর্য্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই ....
কি ভয় বন্দী নিঃস্ব যদিও আমরা আঁধারে পরিত্যক্ত,

[৮] দুঃখ সাগর মন্থন শেষ/ভারতলক্ষ্মী আয় মা আয়
চাই প্রাণ চাই ক্ষুধার অন্ন/মুক্ত আলোকে মুক্তকর

[৯] নব জীবনের নব উত্থান/আজান ফুকারি এস নকীব।
.....
জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন/জাগে মজলুম বদনসীব।

[১০] এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধর।
নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে, হবে না তোর বিসর্জন ॥

সূত্র : বেতার জগৎ ১৬.১০.১৯৩৯ সংখ্যা, বেতার : সঙ্গীতালেখ্য বিজয়াদশমী, তারিখ : ২২.১০.১৯৩৯, সংগঠন : নজরুল, শ্রেণী : কোরাস্। পত্রিকা : ১. সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা আশ্বিন ১৩৪৭ [স্বরলিপিসহ], স্বরলিপিকার : বিজলীধর ও ২. প্রবর্তক, কার্ত্তিক-১৩৪৭, শিরোনাম : আগমনী। গীতি-গ্রন্থ : ১. নজরুলগীতি–অখন্ড, হরফপ্রকাশনী, কলকাতা, ভারত ও ২. নজরু রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, স্বরলিপি-গ্রন্থ : সঙ্গীতাঞ্জলি, প্রথম খন্ড, কলকাতা। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন ২৭৩৯৫, রেকর্ড প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, শিল্পী : সত্য চৌধুরী

[১১] ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য-মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি ॥
পাপ-বিদগ্ধ তৃষিত ধরার লাগিয়া আনিল যাঁরা
মরুর তপ্ত-বক্ষ নিঙাড়ি' শীতল শান্তি-ধারা,
উচ্চ-নীচের ভেদ ভাঙি' দিল সবারে বক্ষ পাতি' ॥

এই ধারার গানগুলি যে, তৎকালীন সাম্যবাদী তথা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করেছে তাতে সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে বিভিন্ন পরিস্থিতি তথা বাস্তবতায় গানগুলো, রচিত হলেও এর মধ্যে ধ্বনিত হয়েছে শোষন মুক্তির সার্বজনীন সুর। যে সুরের রেশ ধরে পরে গনসঙ্গীত এবং গণনাট্য সংঘের সূচনা হয়েছিল। এদিক থেকে এ গানগুলোর সামাজিক রাজনৈতিক মূল্যের পাশাপাশি বাংলা সঙ্গীতে নতুন ধারার (গণসঙ্গীত) আগমনকে উৎসাহিত ও ত্বরান্বিত করেছে।

নজরুলের চেতনায় সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু ও মুসলামানের মিলনে পরিপূর্ন আস্থাশীল ছিলেন। এই চেতনা তার জীবনে নিছক বিলাসিতা বা শুস্ক মতবাদরূপে দেখা দেয়নি। এই মিলনকে সার্থকরূপে রূপায়িত করার মানসেই তিনি অতিশয় সচেতনার সংগে সাহিত্যে ব্যবহার্য ভাষার মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় অথবা জাতীয় কোনো বিষয়কে সমন্বয়ধর্মী মানবিকতাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন। হিন্দু নারীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে সংস্কারমূক্ত মনের যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাও অবশ্য স্মরনীয়।

নজরুল সাহিত্য সচেতনভাবে পাঠ করলে বা নজরুল সাহিত্যকে ভালোভাবে জানার চেষ্টা করলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যাবে-হিন্দু মুসলমানের মিলনকে সুন্দরভাবে সুগ্রথিত করার মহওর অভীপ্সা কাজী নজরুলই করেছিলেন- তার সাহিত্যে ইসলামি সঙ্গীতের পাশাপাশি শ্যামা ও বৈষ্ণব সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন।

ইসলামের বিচিত্র সৌন্দর্য, শক্তি ও মাধূর্য্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন যুগজয়ী কবি নজরুল ইসলাম। বাংলাসাহিত্যে নজরুল তার বিভিন্ন লেখায় ইসলামকে যত জনপ্রিয় করেছিলেন ততখানি জনপ্রিয় তার পূর্বে ও পরে আর কেউ করতে পারেন নি। সাহিত্যে নজরুলের কাছে ইসলাম যেমন প্রিয়, যতখানি প্রিয়, হিন্দুর ভাবধারা ও ঐতিহ্য ঠিক তেমনি ও ততখানি প্রিয়। কবিতা, গান ও প্রবন্ধে তিনি অজস্র হিন্দু ঐতিহ্যবাহী উপমার কথা টেনে এনেছেন। তিনি বহু শ্যামা সঙ্গীত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত রচনা করেছেন। নজরুলের এই রচনার কিছু নমুনা উদ্বৃত করলে বোঝা যাবে তার প্রবনতা যে বৃক্ষের মূল দিয়ে মাটির গভীরে রস আহরণ করার মত অর্থ্যাৎ তার সৃষ্টিধর্মী চেতনা তাকে তার উৎস মূল ও অতীতের সাধক, চিন্তানায়ক ইত্যাদির সমন্বয়বাদী প্রচেষ্টার দিকে টেনে নিয়ে গেছে। হিন্দু দেবদেবীর প্রতি নজরুলের ভক্তি দেখে মনে করা যেতে পারে এর মাধ্যমে তিনি তার পূর্বপুরুষদের প্রচলিত মর্যাদা ও মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এতে করে তিনি দেশকে শুধু একখন্ড মাটির মতো করে পাননি, পেয়েছেন মায়ের মতো করে। হিন্দু আর মুসলমান তার কাছে একই মায়ের দুটি সন্তান। দুটি ভাইয়ের মধ্যে মতানৈক্য, স্বার্থবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি, যেমন অভিপ্রেত নয়, তেমনি হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি সংকীর্ণতা অনভিপ্রেত। নজরুল এ দুটি সম্প্রদায়ের মিলনে বরাবর আশাবাদী মনোভাব পোষণ করেছেন। নজরুল তাঁর গানে বলেছেন–

'দুর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে
বেহুঁশ হয়ে চলেছি যেন কেঁদে কেঁদে কাবার পথে' ॥[১২]

অথবা

'তোরা যেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে,
যেন ঊষার কোলে রাঙা-রবি দোলে' ॥[১৩]

এসব গানের মধ্যে একনিষ্ঠ সাধনার সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় অথবা এসবের প্রতি নজরুলের আস্থা বলীয়ান হয় তখন যখন সামগ্রিক আবেদনে অথবা সমন্বিত চেতনায় এর মূল্য নির্ধারিত হয়। দেশের দুটি সম্প্রদায়ের চিরায়ত বিশ্বাসকে তিনি কোন মতেই অস্বীকার করতে পারেননি। এই জন্য- 'আমিনা মায়ের কোলে ইসলাম শিশুকে দুলতে দেখে কিংবা আমিনা- দুলালকে নাচতে দেখে তিনি যেমন উচ্ছসিত হন, ঠিক একইভাবে উচ্ছাসিত হন নন্দদুলালকে নাচতে দেখে। এই উচ্ছ্বাস ও আনন্দ দ্বৈতচেতনায় সার্থক ও সম্পূর্ণ - একক চেতনায় তা অসার্থক ও অসম্পূর্ণ। বাংলা সাহিত্যে এমন মহৎ ও সার্থক চিন্তা চেতনা একমাত্র নজরুলেরই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথও পারেন নি এতটা সার্থক হতে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চেতনার এমন সুতীব্র অনুভূতি, সংস্কার বর্জনের এমন নিঃশঙ্ক প্রান শক্তি ও পদচারণা রবীন্দ্রসাহিত্যেও অনুপস্থিত। নজরুলের কাব্যের মধ্যে কোলাহল হট্টগোল যতই থাক, এই একটি ব্যাপারে তার মানসিকতা আশ্চর্যভাবে অচঞ্চল, অনমনীয় ও নির্দ্বন্দ্ব। গভীর আসক্তি ও অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে তার এই মিলনের আর্তি বাগ্ময় হয়েছে'।[১৪]

নজরুল ছিল মনে প্রাণে একজন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দুত। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান জাত পাত নিয়ে তার কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। তিনি মনে করতেন মানুষ এক, সকলের শরীরে বহমান রক্ত এক, সংস্কৃতি এক, হাসি কান্না, শোক দুঃখ সকলকে একিভাবে বিচলিত বা আনন্দিত করে। সেখানে ধর্ম কখনো বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। তাইতো তিনি বলেছেন-

বাংলা সাহিত্য হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দুদের দেবদবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুর তেমনি মুসলানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী।

উভয় সম্প্রদায়ের সংস্কারে আঘাত হানবার জন্য তিনি কতখানি সচেতন তার নমুনা তার সমগ্র সাহিত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন ধর্মীয় শাসন ও ভেদাভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহী কবি তার বিশ্ববিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতার জন্য মানুষের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নিতে পেরেছেন। যে কবিতায় তিনি দৃঢ়তার সাথে লিখতে পেরেছেন-

খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর

যে সময় সামাজিক অসাম্য, মানুষে মানুষে হানাহানি, জাতিতে জাতিতে ভেদাভেদ সেই সময়ই সাহসের সাথে তিনি লিখেছেন-

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে একেঁ দিই পদচিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সুদন, শোকতাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।

এই কবিতা নজরুলকে 'যৌবনের তেজস্বিতার ভাব প্রকাশ' করার কারণে খ্যাতির উচ্চ চূড়ায় নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ভারতের মানবতাবাদী মনীষীদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি লিখেছেন মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান। নাই দেশকাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি।

ধর্মশাস্ত্রকে পুঁজি করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করা, মানবতাকে ভুলুণ্ঠিত করা, মন্দির মসজিদ গীর্জা দখল করা, নজরুলের চোখে ছিল ক্ষমার অযোগ্য পাপকার্য্য। রক্ষনশীলতার পাষানে যেখানে মানবতা চাপা পড়ে তাদের ধিক্কার দিয়ে কবি বলেছেন- 'যে ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেটা ধর্মই নয়। ধর্মের নামে সেটা মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষনের হাতিয়ার'।[১৫]

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্ভব ঘটেছিল ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে এবং পরপর তিনবার দাঙ্গা হয়েছিল। নজরুল সেই সময় কৃষ্ণনগরে ছিল যুব সম্মেলন প্রস্তুতির কাজে। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খবরে কবি ভীষনভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। এবং সেই সময় তিনি যুবসমাজকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে তার বিখ্যাত 'কান্ডারী হুশিয়ার' গানটি লিখেছিলেন।

'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরন
কান্ডারী আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
হিন্দু না ওরা মুসলিম ? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কান্ডারী বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার'।[১৬]

[কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে এই গানটি উদ্বোধনী সংগীত হিসাবে গেয়েছিলেন কবি]

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান

আলোচনায় আগেও এসেছে, সবার উপরে মানবতাকে স্থান দিয়েছিলেন নজরুল। তাই র্ধম র্বন গোত্র ভেদ নয়, মানুষকে তিনি মানুষ হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন- হিন্দু কিংবা মুসলিম নয়। আর এই মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তৎকালীন ভারতের প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু মুসলমানের সর্ম্পকের অবনতি বিশেষভাবে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গা তাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। নজরুল অনুভব করেছিলেন একে তো বিদেশী শাসন, তার ওপর ভাই-এ-ভাই-এ দ্বন্দ্ব যদি থাকে তাহলে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে না; একই সঙ্গে ভারতের দূর্গতিও দুর হবে না। এই বেদনাবোধে তার দেশপ্রেমিক সত্তা কেঁদে উঠেছিল। কেননা তার স্বপ্নছিল স্বাধীন দেশের

মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ের স্বপ্ন। তাই তো তিনি চেয়েছিলেন-'সকল সম্প্রদায়ের মানুষ গভীর প্রীতির সঙ্গে সেখানে বসবাস করবেন, মানবিক মূল্যবোধের উচ্চ বিকাশ ঘটবে সেখানে, মানবতাবাদী কবির এই ছিল একান্ত কামনা। এই কামনা থেকেই হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির বিষয়টিকে নজরুল অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী কবি এবং সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির আকুতি তাঁর রচনারই সর্বোচ্চ রূপ লাভ করে। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির ধারা দুটিকে তিনি তার সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় মিলিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেই মিলিত ধারাকে উজ্জীবিত ক'রে তুলেছিলেন নানা ধরনের রচনায় বিশেষ করে কবিতায় ও গানে। আর কোন বাঙ্গালী কবির মধ্যে এ ঘটনাটি এমনভাবে ঘটেনি'।[১৭]

নজরুল নিজেই বলেছেন 'হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না। আমিও মানি [ইব্রাহিম খাঁকে লেখা পত্র] ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভায় নজরুল যে শেষ অভিভাষণ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি তার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলেছেন। নজরুল তাঁর 'আমার পথ' নামক একটি প্রবন্ধে বলেছেন–

> 'মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন্‌খানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা আমার অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যেখানে প্রানের মিল, আদত সত্যের মিল, সেখানে ধর্মের বৈষম্য, কোন হিংসার দুশমনীর ভাব আনে না। যার নিজের ধর্মের বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃনা করতে পারে না'।
>
> [আমার পথ, রুদ্রমঙ্গল]

এ জন্যই তিনি হিন্দু মুসলিম সবাইকে আহবান জানিয়েছেন সত্য, ন্যায়, সুন্দর, মঙ্গল এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথে। নজরুল সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি ভাবনার মধ্য দিয়ে স্বদেশচেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।
মুসলিম তার নয়নমনি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥

এটি নজরুলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং দেশপ্রেমমূলক একটি অসাধারণ গান। এ গানের মধ্যে ভারতের এই দুই সম্প্রদায়ের আত্মার আত্মীয় এবং তারা একই মায়ের সন্তান এই বানী শব্দ ও ভাষা শৈলীর অপূর্ব নিপুনতায় ফুটে উঠেছে। গানের শেষ চরনে এদের সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে ভারত পৃথিবীর বুকে অহংকার দীপ্ত পদচারনা যে করতে পারবে সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। বাণীর সঙ্গে গানটির সুর এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

নজরুলের আরও একটি গান 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' আপাতভাবে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান হলেও এটি যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক গান– তা গানের উৎস এবং চরণই ব'লে দেয়। কবি লিখেছেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম- ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন, কান্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার'। এই গানটি

রচনার ইতিহাস সন্ধান করলে আমরা দেখবো, ১৯২৬ সালের এপ্রিলে কলকাতায় যখন হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হয় তখন নজরুল কৃষ্ণনগরে ছিলেন এবং এই খবরে তিনি বিচলত হয়ে পড়েন। পরের মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক যে সম্মেলন হয় সেখানে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিকে গুরুত্ব দিয়ে উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে এই গানটি [দুর্গমগিরি] পরিবেশন করেন। এভাবে নজরুল তার এই ধারার গানগুলিতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিভেদ ভুলে গিয়ে হিন্দু মুসলিম সবাইকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। তার পূর্বে বা সমকালে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে থেকে এমন চিন্তা করতে পারেন নি যা নজরুল পেরেছিলেন এবং তিনি মনে করেন, আমরা ভারতবাসী, একই মায়ের সন্তান। নিম্নে সাঙ্গেতিক বিশ্লেষণসহ কাজী নজরুল ইসলামের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক গানের একটি তালিকা দেয়া হলো-

১. জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া ঃ শিরোনাম : জাতের বজ্জাতি, পত্রিকা : ১. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ-১৩৩০ ও ২. বিজলী, শ্রাবণ-১৩৩০। গীতি-গ্রন্থ : ১. বিষের বাঁশী, ২. নজরুল গীতি–অখন্ড, ৩. নজরুল গীতি, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা ও ৪. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড। স্বরলিপি-গ্রন্থ : [ক] কারার ঐ লৌহ কপাট, [খ] নজরুল স্বরলিপি, তৃতীয় খন্ড ও [গ] সুনির্বাচিত নজরুল গীতির স্বরলিপি, প্রথম খন্ড। ১. রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি পি-৭০৫৮, রেকর্ড প্রকাশকাল : অক্টোবর-১৯২৫, শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ দত্ত ও ২. রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-২৭২৭৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : মে-১৯৪২, শিল্পী : মৃনালকান্তি ঘোষ। শ্রেণী : দেশাত্মবোধক, রাগ : পরজ মিশ্র, তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা।

[বহরমপুরে ড. নলিনাক্ষ স্যানালের বিয়ে উপলক্ষে এক বছর পূর্বে রচিত গানটি পুনরায় রচিত এবং সেখানে স্বকণ্ঠে গীতো। বহরমপুর জেলে মাদারীপুর শান্তি সেনা চারণদলের জন্য পূর্ণচন্দ্র দাসের অনুরোধে লিখিত অপ্রকাশিত নাটকের রেকর্ডকৃত প্রথম গান।]

২. দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে ঃ পত্রিকা : ১. বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ-১৩৩৩ ও ২. কালিকলম, আশ্বিন-১৩৩৩। শিরোনাম : কান্ডারী হুশিয়ার। গীতি-গ্রন্থ : ১. সর্বহারা, ২. নজরুল গীতিকা, ৩. সঞ্চিতা , ৪. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড। স্বরলিপি-গ্রন্থ : ১. সুর মুকুর ও ২. নজরুল স্বরলিপি দশম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-২৭৬৬৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : এপ্রিল-১৯৪৭, শিল্পী : সত্য চৌধুরী। বিষয় ঃ দেশাত্মবোধক, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার গান। শ্রেণী : গণসঙ্গীত, রাগ ঃ বৃহন্নট-কেদারা, তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা।

[১৯২৬ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে রচিত।]

৩. ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি ঃ শিরোনাম : আমরা সেই জাতি। গীতি-গ্রন্থ : বুলবুল, দ্বিতীয় খন্ড। রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-৩৭৬৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : জানুয়ারী-১৯৩৫, শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ। পত্রিকা : হানাফী, ১৫ই পৌষ, ১৩৪১ সংখ্যা। স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, দ্বিতীয় খন্ড, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

৪. পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর বিধির বিধান সত্য হোক ঃ শিরোনাম : সত্য মন্ত্র। গীতি-গ্রন্থ : ১. বিষের বাঁশী, ২. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, ৩. নজরুল গীতি–অখন্ড ও ৪. নজরুল গীতি, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা। স্বরলিপি-গ্রন্থ : ক. সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খন্ড ও খ. নজরুল স্বরলিপি, অষ্টম খন্ড। শিল্পী : হরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিষয় : দেশাত্ম বোধক, রাগ : আলাহিয়া বিলাবল, তাল : দাদ্‌রা।

৫. ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায় তুলে নে না তারে কোলে ঃ গ্রন্থ : ১. নজরুল গীতি–অখন্ড ও ২. নজরুল গীতি, ষষ্ঠ খন্ড, কলকাতা। শিল্পী : বরদা গুহ। বিষয় : দেশাত্মবোধক। শ্রেণী : মিলনাত্মক , তাল : দাদ্‌রা।

৬. ভারতের দুই নয়ন তারা হিন্দু মুসলাম ঃ গীতি-গ্রন্থ : ১. আব্বাস উদ্দিনের গান, ২. নজরুল গীতি, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা ও ৩. নজরুল গীতি–অখন্ড। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-১৭০৭৬, শিল্পী : আব্বাসউদ্দিন আহমদ ও মৃণালকান্তি ঘোষ। বিষয় : সম্প্রীতি মূলক গান। শ্রেণী : মিলনাত্মক।

৭. মানবতাহীন শশ্মানে দাও মানবতা, হে পরমেশ ঃ গ্রন্থ : ১. সুরসাকী, ২. নজরুল গীতি, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা ও ৩. নজরুল গীতি–অখন্ড। স্বরলিপি-গ্রন্থ : ক. সুনির্বাচিত স্বরলিপি, চতুর্থ খন্ড ও খ. নজরুল সুরলিপি ষষ্ঠ খন্ড। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-২৭২৭৬ রেকর্ড প্রকাশকাল : মে-১৯৪২, শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ। রাগ : ইমন। তাল : একতাল।

৮. মুসলিম আর হিন্দু মোরা দুই সহোদর ভাই ঃ গীতি-গ্রন্থ : ১. সুরসাকী ও ২. নজরুল গীতি–অখন্ড। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-১৭০৭৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : এপ্রিল-১৯৩৮, শিল্পী : আব্বাসউদ্দিন আহমদ ও মৃণালকান্তি ঘোষ। বিষয় : দেশাত্মবোধক, শ্রেণী : মিলনাত্মক।

৯. মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান ঃ গীতি-গ্রন্থ : নজরুল রচনা সম্ভার, সপ্তম খন্ড। নাটিকা : পুতুলের বিয়ে। স্বরলিপি-গ্রন্থ : সুনির্বাচিত স্বরলিপি, রেকর্ড নম্বর : জিটি-২৬, শিল্পী : শিশু মঙ্গল সমিতি। বিষয় : দেশাত্মবোধক, শ্রেণী : মিলনাত্মক, তাল : তেওড়া।

১০. শিকলে যাদের উঠিছে বাজিয়া বীরের মুক্তি তরবারি ঃ গীতি-গ্রন্থ : ১. বিষের বাঁশী [বন্দনা গান শীর্ষক], ২. নজরুল গীতি, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা ও ৩. নজরুল গীতি–অখন্ড। বিষয় : দেশাত্মবোধক, শ্রেণী : সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গান। রেকড নম্বর্র : জিটি-২৬।

১১. সঙ্ঘশরণ তীর্থ-যাত্রা পথে এসো মোরা যাই ঃ গীতি-গ্রন্থ : ১. নজরুল গীতি, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা ও ২. নজরুল গীতি–অখন্ড। স্বরলিপি-গ্রন্থ : ক. নজরুল সুর সঞ্চয়ন, প্রথম খন্ড, খ. কারার ঐ লৌহ কপাট, গ. নজরুল স্বরলিপি, তৃতীয় খন্ড ও ঘ. সুনির্বাচিত স্বরলিপি, চতুর্থ খন্ড। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭৩০৩, রেকর্ড প্রকাশকাল : আগস্ট-১৯৪২, শিল্পী : প্রতিভা ঘোষ, জগন্ময় মিত্র ও সত্য চৌধুরী।

১২. হিন্দু-মুসলিম দুটি ভাই ভারতের দুই আঁখি তারা ঃ গীতি-গ্রন্থ : ১. সুরসাকী, ২. নজরুল গীতি, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা ও ৩. নজরুল গীতি, অখন্ড। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-১৭১৬৯, শিল্পী : এইচএমভি ড্রামাটিক ক্লাব, রাগ : ছায়ানট, তাল : দাদ্‌রা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য-নির্দেশ

১. ধূমকেতু, ১৩ অক্টোবর, ১৯২২ সংখ্যা।

২. লাঙল, প্রথম বর্ষ, প্রথম খন্ড, বিশেষ সংখ্যা, বুধবার ১লা পৌষ, ১৩৩২,১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫,পৃঃ-১১-১২। ["লাঙল" পত্রিকাটি ছিল শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র। প্রধান পরিচালক ঃ নজরুল ইসলাম, সম্পাদক। শ্রীমণিভূষন মুখোপাধ্যায়। 'শুনহ মানুষ ভাই- সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। চন্ডীদাস -এর এই পঙক্তিটি শুরুতেই কাজী নজরুল ইসলাম ব্যবহার করেছেন। কারণ নজরুল ছিলেন মুলতঃ মানুষের কবি।]

৩. লাঙল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১২।

৪. লাঙল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১৩।

৫. লাঙল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১৩।

৬. নজরুল রচনাবলী প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ, মে-১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৭।

৭. লাঙল, প্রগুক্ত, কবিতা; সাম্যবাদী, পৃষ্ঠা-৫।

[কাজী নজরুল ইসলাম এর সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের সকল কবিতা "লাঙল" (প্রাগুক্ত) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাসমূহ হলো যথাক্রমে সাম্যবাদী, পৃষ্ঠা-৫; ইশ্বর, পৃষ্ঠা-৫; মানুষ, পৃষ্ঠা-৫-৬; পাপ, পৃষ্ঠা-৬-৭; চোর ডাকাত, পৃষ্ঠা-৭; বীরাঙ্গনা, পৃষ্ঠা-৭-৮; মিথ্যাবাদী, পৃষ্ঠা-৮; নারী, পৃষ্ঠা-৮-৯, রাজা-প্রজা, পৃষ্ঠা-৯-১০, সাম্য, পৃষ্ঠা-১০; ও কুলি-মজুর, পৃষ্ঠা-১০।]

৮. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সংগ্রহ ও সম্পাদনা; রশিদুন্ নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর-২০০৬, পৃষ্ঠা-১৪৫।

৯. নজরুল রচনাবলী, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্কারণ, মে-১৯৯৩, পৃষ্ঠা-২৩৫।

১০. কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহমদ, মুক্তধারা, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৫৪।

১১. কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুজফ্ফর আহমদ, মুক্তধারা, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ-১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১৫৩।

১২. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৬৭

১৩. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৭

১৪. নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, প্রবন্ধ : মিলনের দুত নজরুল ইসলাম, আবু জাফর, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৪৬০।

১৫. জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কল্পতরু সেনগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রকাশকাল : জানুয়ারী-১৯৯২, পৃষ্ঠা-১৬৪।

১৬. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২০৪

১৭. নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

নারী অধিকারে নজরুলের সচেতনতা

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যে নারী কি রূপে ধরা পড়েছে; সেখানে নারীর অবস্থান কি, এ সম্পর্কে সংগত কারণেই সিদ্ধান্ত টানা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া নজরুলের সব সাহিত্য সৃষ্টিতে নারী একইরূপে রূপায়িত হয়নি। নজরুল সাহিত্যে নারীর রূপায়নের স্বরূপ উন্মোচনের জন্য তার কাব্য প্রবাহকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক ভাগে পড়বে তার রোমান্টিক প্রেমের কাব্যগুলো; দোলনচাঁপা [১৯২৩], ছায়ানট [১৯২৫], পুবের হাওয়া [১৯২৬], সিন্দু-হিন্দোল [১৯২৮], চক্রবাক এবং অন্যভাগে পড়বে সাম্যবাদী [১৯২৫]। এছাড়া রাজনৈতিকতা মূখ্য বিদ্রোহ মূলক কাব্যেও নারীর রূপায়ন রয়েছে। তবে সেখানে মানবী নারী নয় বরং পুরানের শক্তিরূপিনী দেবীই মূখ্য হয়ে উঠেছে। এ কারনে বিদ্রোহীমূলক কবিতায় রূপায়িত নারীকে ঠিক নারীর রূপায়ন বা মূল্যায়ন হিসাবে বর্তমান প্রবন্ধে বিবেচনা করা হয়নি।

নজরুলের কাব্যে এক ভিন্ন নারীরূপ এবং নারীভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় তার সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থে। সমগ্র বাংলা কাব্যের ধারায় নজরুল বোধ করি সাম্যের প্রশ্নে সবচেয়ে স্পষ্ট, গভীর, ব্যাপক এবং ব্যাখ্যা প্রবন কবি। বাংলা কাব্যে সাম্যের সাধনা করেছেন, এরকম কবির সংখ্যা খুব বেশী না হলেও নিতান্ত কম নয়। এই তালিকায় সুকান্ত ভট্টাচার্য্য [১৯২৬-১৯৪৭], সুভাষ মুখ্যেপাধ্যায় [১৯১৯-২০০৩] সহ আরো অনেকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু তাদের সাম্যবাদী চেতনা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক তত্ত্ব ও দর্শন দ্বারা শাসিত। তাদের সাম্যচিন্তা মূলত অর্থনৈতিক শ্রেণিচিন্তা নিয়ন্ত্রিত। ফলে এর উদ্দেশ্য আদর্শ রাষ্ট্রীয় কাঠামো বদলের আকাঙ্খা দ্বারা চিহ্নিত হলেও এই সাম্যের বিবেচনায় সব অসমতা সম্পূর্ণভাবে আঁটে না; বলা ভালো বিবেচিত হয় না।

'কিন্তু নজরুলের সাম্যচিন্তা কেবল অর্থনৈতিক শ্রেণী সাম্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার সাম্যবাদী চিন্তার সঙ্গে রাজনৈতিক সাম্যতত্ত্বের সাদৃশ্য হয়ত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নজরুলের সাম্য চেতনা আরো ব্যাপক। কারণ, অনেকে মনে করেন নজরুলের সাম্যবাদ-মরমী চেতনা থেকে উৎসারিত'।[১] ফলে নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তার আওতায় খুব অনায়াসে বিবেচিত হয় যেমন ধনী-নির্ধন, তেমনি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-সাঁওতাল-ভীম-গারো, রাজা-প্রজা, চোর-সাধু, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, সাদা-কালো এবং নারী-পুরুষ।

প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে অসাম্যের তো নানা রকমফের রয়েছে। নজরুল স্থান-কাল পাত্রভেদে সকল অসাম্যের বিরোধী। সর্বপ্রকার অসাম্য দূর করে নজরুল পৃথিবীকে 'সাম্যবাদী স্থান' বানাতে চান। এহেন সর্বাত্মক সাম্যবাদী নজরুলের পক্ষেই ঘোষনা করা সম্ভব যে-

'সাম্যের গান গাই-
আমার চক্ষে পুরুষ-রমনী কোনো ভেদাভেদ নাই'।[২]

নজরুল তার সাম্যবাদী কাব্যে নারী পুরুষের সর্বপ্রকার ভেদের বিপক্ষে। নারী পুরুষের প্রথাগত ভেদকে উঠিয়ে দিয়ে তিনি নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্য মানুষ' প্রত্যয়টি ব্যবহারের পক্ষপাতী।

সাম্যবাদী কাব্যের 'নারী' এবং 'বীরাঙ্গনা' কবিতায় নজরুল প্রথাগত নারী ভাবনাকে, পুরুষতান্ত্রিক নারী ভাবনাকে রুখে দিয়েছেন। এখানে তিনি পুরুষের আধিপত্যবাদী হয়ে উঠা এবং নারীর অবরুদ্ধ হওয়ার ইতিহাসকে যেমন চিহ্নিত করেছেন, তেমনি বর্তমান অবরুদ্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে নারীকে নতুন ইতিহাস নির্মানের আহবান জানিয়েছেন। নারীর অবরুদ্ধ হওয়ার ইতিহাস-মূহুর্ত সম্পর্কে নজরুল বলেছেন-

'কখন আসল প্লুটো যমরাজা নিশীথ পাখায় উড়ে,
ধরিয়া তোমায় পুরিল তাহার আঁধার বিবর-পুরে।
সেই যে আদিম বন্ধন তব, সেই হতে আছ মরে
মরণের পরে নামিল ধরায় সেইদিন বিভাবরী'।[৩]

প্রথাগত নারী ভাবনায় নারীকে দেখা হয় ভীরু, অন্তঃপুরবাসী, সৌন্দর্যময় অলংকারে বিভুষিত কুণ্ঠিত আকারে। নজরুল নারীকে দেখতে চান এসবের বাইরে নতুনরূপে, পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে। নারীকে এই স্বাভাবিক প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি নারীর ব্যবহৃত অলংকারকে মনে করেন দাসত্বের চিহ্ন হিসাবে। তিনি নারীকে এই দাসত্বের চিহ্ন ফেলে, অবরুদ্ধতা থেকে মুক্ত হওয়ার আহবান জানিয়েছেন-

'চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল
মাথায় ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী ভেঙ্গে ফেল ও শিকল!
যে ঘোমটা তোমায় করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরন;
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরন!'।[৪]

নজরুল চেতনাগতভাবে সকল প্রকার আধিপত্য এবং অবরুদ্ধতার বিরুদ্ধে। এদিক থেকে তিনি পুরুষকে আবিস্কার করেছেন আধিপত্যবাদী এবং উৎপীড়ক হিসাবে। আর নারীকে মনে করেছেন আধিপত্যের শিকার এবং উৎপীড়িত হিসাবে। সাম্যবাদী নজরুল নারী পুরুষের এই পরিস্থিতিকে নারী পুরুষের অসাম্য হিসাবে দেখলেও শেষ পর্যন্ত তিনি একে মনে করেন পীড়ক এবং পীড়িতের সমস্যা হিসাবে। নজরুল এই অসাম্যের মধ্যে সাম্য বিধানের যে সূত্র নির্দেশ করেন, তা কেবল নারী পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এক সামগ্রিক সূত্রে হয়ে উঠেছে-

'বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি;
কেহ রহিবে না বন্দী কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে!
যুগের ধর্ম এই-
পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই'![৫]

এভাবে নজরুল নারীকে পুরুষের সমান আকারে দেখার আশা ব্যক্ত করেছেন সাম্যবাদী কাব্যে। নারীকে ধর্মীয় অনুশাসনের জালে জড়িয়ে রাখবার যে সমাজের প্রয়াস সেই সম্পর্কে নজরুলের আদর্শে কথা বলতে গেলে বলতে হবে-

'নারীর ওপর স্বেচ্ছাচারীর ধর্মান্ধ পুরুষ সমাজ যেভাবে মাতা, কন্যা ভগিনী ও স্ত্রীরূপে exploit করছে- তার ফিরিস্তি 'নারী', 'মিসেস এম রহমান' ও 'বীরাঙ্গনা' কবিতায় পাওয়া যায়। নারী যে শুধু পুরুষের কামনার ইন্ধন খেলার পুতুল কিংবা প্রজননের অসহায় যন্ত্র নয়, সৃষ্টির ইতিহাসে শিল্প সংস্কৃতিতে তারও যে মহৎ দান রয়েছে একথাও কবি স্বার্থান্ধ সমাজকে শুনিয়েছেন। ধর্ম ও নীতির দোহাই দিয়ে হারেমের মধ্যে অসহায় পশুর মত তাকে বন্দী করে যে কদর্যতা ও বিভীষিকাময় জীবনযাত্রা তার চলছিল, সেখানে কবি উচ্চারন করলেন মুক্তির বানী সাম্যের মন্ত্র'।[৬]

নারী অবলা নয় তার মধ্যে যে আদ্যাশক্তির অমিত সম্ভাবনা নিহিত আছে, তার সমন্ধে সে অচেতন বলেই নারী অবরুদ্ধ জীবনের অবমাননা মুখ বুজে সহ্য করে। তাই কবি জাগরনী মন্ত্রে নারীদের জাগ্রত করবার প্রয়াস দেখিয়েছেন তার নারী জাগরনী মূলক গান ও কবিতায়।

নজরুল নারীর রণরঙ্গিণী মূর্তিই কামনা করেননি, তাকে প্রেমময়ী বধূ, স্নেহময়ী জননী ও প্রিয় দয়িতারূপেও চিত্রিত করেছেন। তাঁর অজস্র গান ও কবিতায় তার প্রমাণ রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর নারী প্রেমই তাঁকে বিদ্রোহী করেছে। প্রকৃত প্রেমই আরেক অর্থে তাঁর নারী প্রেম। বিদ্রোহী, সিন্ধু, গোপনপ্রিয়া প্রভৃতি কবিতা ও গানে নিত্যকালের প্রিয়াকে তিনি আহবান করেছেন। তারপরও 'নারীর কন্যা-বধূ-জননী রূপাঙ্কনে নজরুলের কৃতিত্ব অধিক নয়, তার কৃতিত্ব রয়েছে Time spirit কে উপলব্ধি ক'রে বিপ্লবাত্মক মনোভাবকে কেন্দ্র ক'রে শতশত বৎসরের অপমান ও নির্যাতনের পুঞ্জীভূত নিরুদ্ধ বেদনার বিরুদ্ধে নারী সমাজকে যে দৃপ্তকণ্ঠে সচেতন হবার জন্য ডাক দিয়েছেন-তারই মধ্যে'।[৭]

নারী জাগরণমূলক গান

নজরুলের গানে দেশপ্রেম নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নারী জাগরন বা বাংলার নারীদেরকে কুসংস্কারের অন্ধকার ভেঙ্গে আলোতে বেরিয়ে আসার প্রেরনামূলক গান সংখ্যায় বেশী না হলেও উল্লেখযোগ্য। আপাতভাবে নারীর মানবিক অধিকার তথা তার শৃঙ্খলিত জীবনের কথা থাকলেও এর মধ্য দিয়ে সঙ্গীতকার নজরুলের স্বদেশ চেতনায়ই প্রস্ফুটিত। শুধু গানেই নয়, কবিতাতেও নজরুল আগেই বলেছেন-

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার আনিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

নজরুল জানতেন যে, এ সমাজ যে পিছিয়ে আছে তার কারন হচ্ছে অধিকার বঞ্চিত আমাদের নারী সমাজ। নারীরা সংসার-সমাজ শেকলে বন্দি থাকায় আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ হচ্ছে না। তাই তাদেরকে টেনে আনতে হবে সভ্যতার আলোয়। এই উপলব্ধি থেকে নজরুল নারী জাগরনমূলক স্বদেশী গান রচনা করেছেন। বাংলায় এ ধারার গান একেবারেই কম। তার মধ্যে নজরুলের নিম্নের প্রথম গানটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ এবং বাকী গানগুলিও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য–

১. জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা
২. আমি মহাভারতী শক্তি নারী
৩. চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা
৪. কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া
৫. এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি
৬. গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়
৭. জাগিলে পারুল কিগো সাত ভাই চম্পা ডাকে
৮. মেলি শতদিকে শত লেলিহান রসনা প্রভৃতি
৯. ঐ নন্দন নন্দিনী দয়িতা
১০. তুমি মোর জননী ধরেছ জঠরে

'এসব গান নারীদের পরমা শক্তির অংশরূপে বর্ননা করে কবি তাদের অনুপ্রানিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কোথাও বর্তমান কালের নারীদের অনুপ্রাণীত করতে ইতিহাস খ্যাত বীর রমনীদের প্রশস্তি করেছেন। 'জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা' একটি প্রবল তেজময় সংগীত। এর শক্তি দীপ্ত পৌরাণিক পূর্বোল্লেখ, বেগবান শব্দমালার সঙ্গে পরিপূরক খেয়াল অঙ্গের সুর গানটিকে এক দীপ্ত আহবানে পরিণত করেছে'।[৮]

নজরুলের 'জাগিলে পারুল কি গো' গানটি 'বুলবুল' গ্রন্থের ৩৮ নম্বর গান। এটি পুরুষ শাসিত সমাজে মেধা ও পরিশ্রমে সবাইকে অতিক্রম করে অংকে প্রথম স্থান অধিকার করা-ফজিলাতুন্নেসার বিদেশ যাত্রা উপলক্ষ্যে রচিত। এই বিদূষী নারী যেন রূপকার্থে সাতভাই চম্পার একমাত্র বোন পারুল। নজরুলের চেতনায় যে দেশ ছিল সে দেশের নারীরাও তাই ভাষা পেয়েছে তাঁর গানে, সুরে-একথা বলা যায় নির্দ্ধিধায়।

নজরুলের যে কয়টি নারী জাগরণীমূলক গান পাওয়া গেছে- সেই গানগুলির গীতি-উৎসসহ গানগুলির বিভিন্ন তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলো–

১. জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা ঃ নাটক ঃ আলেয়া, নাট্যকার ঃ নজরুল, মঞ্চ : নাট্যনিকেতন, উদ্বোধন ঃ **১৯.১২.১৯৩১**। যোগিনীদের গান, নাট্যগ্রন্থ ঃ আলেয়া। গীতি-গ্রন্থ ঃ নজরুল গীতি–অখণ্ড, রাগ : সারং, তাল : কাওয়ালী। পত্রিকা ঃ জয়তী, বৈশাখ-**১৩৩৭** সংখ্যা। রেকর্ড নম্বর : **১**. মেগাফোন জেএনজি-**৩৩৮**, রেকর্ড, প্রকাশকাল ঃ আগস্ট-**১৯৩৬**, শিল্পী ঃ জ্ঞান দত্ত ও **২**. এইচএমভি এন-**৩১০৪৯**, রেকর্ড প্রকাশকাল : জুলাই-**১৯৪৯**, শিল্পী : জগন্ময় মিত্র। স্বরলিপি-গ্রন্থ ঃ নজরুল স্বরলিপি, ডিএম লাইব্রেরী, কলকাতা। দু'টি রেকর্ডের মধ্যে সুরে ও বাণীতে ঈষৎ পার্থক্য রয়েছে।

২. আমি মহাভারতী শক্তি নারী ঃ গীতিগ্রন্থ: -১. সন্ধ্যামাতলী, ২. সর্বহারা, ৩. নজরুলগীতি অখন্ড, ৪. নজরুলগীতি তৃতীয় খন্ড, কলকাতা। অন্যসূত্র: শৈল দেবীর খাতা, বেতার অনুষ্ঠান- চীনের জাগরণ, বিষয়: নারী জাগরণমূলক।

৩. চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা ঃ গীতি-গ্রন্থ : **১**. নজরুল-গীতি, পঞ্চম খন্ড, ২. নজরুল গীতি, চতুর্থ খন্ড, ৩. বুলবুল দ্বিতীয় খন্ড ও ৪. নজরুল গীতি–অখন্ড। বেতার-সঙ্গীতালেখ্য : পঞ্চাঙ্গনা, তারিখ : **২৩.৮.১৯৪১**। শিল্পী : চিত্তরায়। বিষয় : নারী জাগরণীমূলক তথা দেশাত্মবোধক, তাল : দাদ্‌রা।

৪. কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া ঃ গীতি-গ্রন্থ : **১**. ফণি মনসা, শিরোনাম : হেমপ্রভা, রচনাস্থান ও কাল : মাদারীপুর, ২৯শে ফাল্গুন, **১৩৩২** ও ২. নজরুল গীতিকা। রাগ : সিন্ধুড়া, তাল : একতাল। বিষয় : নারী জাগরনীমূলক তথা দেশাত্মবোধক।

৫. এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি ঃ স্বরলিপি-গ্রন্থ : বেণুকা, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, রাগ : রুদ্র-ভৈরব, নজরুল-সৃষ্ট রাগ, তাল : সুর ফাঁকতাল। গীতি-গ্রন্থ : **১**. নজরুল গীতি–অষন্ড, হরফ ও ২. নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, ঢাকা। স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক, বেতার-নাটিকা : উদাসী ভৈরব[গীতি আলেখ্য], পরিকল্পনা : নজরুল।

৬. গুণে গরিমায় আমাদের নারী ঃ সূত্র : **১**. পান্ডুলিপি [নজরুল সঙ্গীত সম্ভার] ও ২. রেকর্ড কোম্পানীর চুক্তিপত্র, ২৪.১.১৯৩৫, চুক্তিপত্রের পাঠ : 'আমাদের নারী'। রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-৩৭৬৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : জানুয়ারী-**১৯৩৫**, শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন, সুর : আব্বাসউদ্দীন ও আব্দুল করিম খাঁ, সূত্র : আমার শিল্পী জীবনের কথা, আব্বাস-উদ্দীন। উপলক্ষ : তুরস্কের নারী জাগরণের অগ্রদূতিকা খালিদা এদিব কলিকাতায় এলে তাকে কারমাইকেল হোস্টেলের ছেলেরা অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে্ কবি ছেলেদের অনুরোধে গানটি রচনা ক'রে দেন। গ্রন্থ : **১**. নজরুল রচনাবলী , তৃতীয় খন্ড, ঢাকা ও ২. নজরুল গীতি–অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা। স্বরলিপি : নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, দ্বিতীয় খন্ড, ঢাকা, রাগ : মালকোষ, তাল : দাদ্‌রা।

৭. জাগিলে পারুল কি গো সাতভাই চম্পা ডাকে ঃ গীতি-গ্রন্থ : ১. বুলবুল ও ২. সঞ্চিতা, তাল : দাদ্‌রা, রাগ : ভীমপলশ্রী। উপলক্ষ : ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিস্ ফজিলাতুন্নেসার বিলাত গমন উপলক্ষে রচিত ও কবি কর্তৃক গীতো। গ্রন্থ : প্রলয় শিখা।

৮. মেলি শতদিকে শত লেলিহান রসনা প্রভৃতি ঃ এই গানটির তথ্য সূত্র পাওয়া যায়নি।

৯. ঐ নন্দন নন্দিনী দয়িতা ঃ সূত্র : কাফেলা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯। রাগ : বিহগড়া, রেকর্ড : ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে কলম্বিয়া কোম্পানীতে বিমলভুষণ কর্তৃক রেকর্ডে গীতো কিন্তু রেকর্ডটি প্রকাশিত হয়নি।

১০. তুমি মোর জননী ধরেছ জঠরে ঃ সূত্র : দুখু মিয়ার লেটোগান, সংগ্রহ ও সম্পাদনা : মোহাম্মদ আইয়ুব হোসেন বিশ্বকোষ পরিষদ কলকাতা ২০০৩।

কুন্তী মহাভারতের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। তিনি একজন দৃঢ় চরিত্রা তেজস্বিনী ও আদর্শ জননী। ধৃতরাষ্ট্রদের হিংসা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ না করে তার ছেলেদের তিনি সতর্ক থাকতে এবং অহিংস থাকতে পরামর্শ দিতেন। আবার তাদেরকে ভগ্ন মনোরথ হতে দেখলে অনুপ্রাণিত করতেন। লোকনিন্দার ভয়ে তিনি কর্ণকে ত্যাগ করলেও আজীবন তার এই সন্তানের প্রতি গভীরভাবে স্নেহশীলা ছিলেন। কর্ণ এবং অর্জুনের দ্বন্ধে তিনি গভীর মনকষ্ঠ ভোগ করেন সারাটি জীবন গভীর বেদনায় অতিবাহিত করলেও একজন মহিয়সী নারী হিসাবে তিনি পুরান কাহিনীতে উজ্জ্বল এক আসন দখল করে আছেন। আলোচ্য গানটিতে কর্ণের প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে।

তথ্য-নির্দেশ

১. কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃজন, রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি-২০১২, পৃষ্ঠা-৪৯৭।
২. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১, পৃষ্ঠা-৮৯।
৩. নজরুল রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯১।
৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯১।
৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯০।
৬. বাংলা সাহিত্যে নজরুল, আজহার উদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল-১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩২০।
৭. শত কথায় নজরুল, সম্পাদনায় : কল্যাণী কাজী, সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মহালয়া-১৪০৫, পৃষ্ঠা-২২৬।
৮. নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি-১৯৯৬, পৃষ্ঠা- ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তরুণ যুবা-ছাত্রদলের গান

কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীতে অন্যান্য আরো বিষয়গুলির উপর যে স্বদেশচেতনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে সেই সকল বিষয়ে সঙ্গীতের উপর এই অধ্যায়ে আলোচনা এবং গানসমূহ এই অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়সমূহ নিম্নে দেয়া হলো–

১. তরুণ যুবাদের উদ্দীপ্ত করার গান
২. ইসলামী জাগরণীমূলক গান
৩. নিঃসর্গ বন্দনামূলক গান
৪. ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সমৃদ্ধ দেশাত্ববোধক গান
৫. কোরাস্ ও মার্চ সঙ্গীত
৬. আন্তজার্তিক সম্পর্ক ও জাতীয় উন্নয়নমূলক গান
৭. বিদ্রোহী চেতনামূলক গান

নজরুল তারুণ্যের কবি। তরুণ ছাত্রদলকে উৎসাহিত করা তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্য। 'তরুণের সাধনা' অভিভাষণে তিনি বলেছেন- আমার একমাত্র সম্বল আপনাদের তরুণদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালোবাসা, প্রাণের টান। তারুণ্যকে, যৌবনকে আমি যে দিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি; সেই দিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি ও সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। গানে কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি, স্তব রচনা করিয়াছি।

নজরুলের ছাত্রদলের গান 'চল-চল-চল' ও তরুণের গান-এ এই প্রতিশ্রুতির প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তরুণরা যে দেশের শক্তি ও সাহসের প্রতীক তাই যেন ফুটে ওঠে বারবার।

'যে দুর্দিনে নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি ঝড়ের বন্ধু আধাঁর নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙ্গাতরী। মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো মেঘে, মরুপথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁয়া লেগে, মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে; দীপ-শলাকার মতো মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরী'। [তরুণের গান]

কিংবা ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙ্গা প্রভাত
আমরা টুটিব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল ॥
[চল্-চল্-চল্]

এই মার্চের গানটি প্রথম কোথায় কবে গাওয়া হয়েছিল এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও [মুজফ্ফর আহমদ, স্মৃতিকথা] গানে তরুণ্যের উদ্দীপনা ও শক্তির কথা নিয়ে বিতর্ক নেই। 'ছাত্র দলের গান' রূপে আখ্যায়িত 'আমরা শক্তি আমরা বল্ আমরা ছাত্রদল' গানটির প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে এটি ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধনী গান হিসেবে নজরুল নিজেই পরিবেশন করেন।

এই ধারার উল্লেখযোগ্য গানের মধ্যে রয়েছে–

১. অগ্রপথিক হে সেনাদল
২. আমরা শক্তি আমরা বল
৩. আমি গাই তারই গান
৪. চলরে চপল তরুণ দল
৫. জগতে আজিকে যারা আগে চলে
৬. জাগোরে তরুণ দল
৭. দে দোল্ দে দোল্
৮. নতুন পথের যাত্রা পথিক চালাও অভিযান
৯. রাঙা পথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল

ইসলামী জাগরণমূলক গান

নজরুলের পূর্বে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও চেতনা ভিত্তিক জাগরণমূলক গান বলতে হিন্দু মেলায় গীত কিছু গান পাওয়া যায় আর সেগুলো ছিল হিন্দু জাগরণমূলক গান। নজরুল যখন সঙ্গীত রচনা করেন তখন অন্য কোন উল্লেখযোগ্য বাঙালি মুসলমান গীতিকারের সন্ধান আমরা পাইনি। কাজেই নজরুল যে ইসলামী জাগরনমূলক গান রচনার পথিকৃত হবেন বলার অপেক্ষা রাখে না। নজরুলের মুসলিম জাগরণমূলক সেই গানগুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় যেখানে স্বদেশচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ ইসলামী আর্দশ, ঐতিহ্য, গৌরব গাঁথা থাকলেও তার মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষের নিপীড়িত শোষিত মানুষের (হোক সে মুসলমান) উজ্জীবনের স্বপ্ন বা প্রেরনা রয়েছে। নজরুলের এই গানগুলো মূলত প্রেরনা, উদ্দীপনার গান।

প্রায় কাছাকাছি সময়ে নজরুল মুসলিম বা ইসলাম জাগরণমূলক কাব্য ও গান রচনা করেছেন। তার কামালপাশা, আনোয়ার, রক্তভেরী কবিতাসহ জিঞ্জির কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই মুসলিম ঐতিহ্য ও জাগরণ মূলক। অনেক অভিভাষনেও তিনি মুসলিম জাগরনের কথা জোর দিয়ে বলেছেন বারবার। তবে এই ধারার উল্লেখযোগ্য গানগুলো হচ্ছে–

১. আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়
২. একি বেদনার উটিছে ঢেউ দুর সিন্ধুর পারে
৩. খুশী লয়ে খোশরোজের আর খেয়ালী খোস-নসীব

৪. জাগো না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান

৫. তাওফিক দাও খোদা ইসলামে

৬. দিকে দিকে পুনঃ জালিয়া উঠিছে দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল

৭. ধর্মের পথে শহীদ যাহারা

৮. বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা

৯. ভুবন জয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলামন

১০. সকাল হ'ল শোন্‌রে আজান

১১. সালাম, সালাম, জামালউদ্দীন, আফগানী, তসলিম

১২. হাতে হাত দিয়ে আগে চল, হাতে নাই থাক হাতিয়ার

এছাড়াও 'গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়' গানটিকে গবেষক করুনাময় গোস্বামী মুসলিম জাগরণের গান হিসাবে বিবেচনা করলেও আমাদের মতে এটি নারী জাগরনের গান। কেননা গানটিতে ইসলামের চেয়ে নারীর মূল্য ও গুরুত্বের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

নজরুল ইসলামী চিন্তা, চেতনা, ঐতিহ্য নিয়ে অনেক গান লিখলেও [আবদুল আজিজ আল্-আমানের মতে দুই শতাধিক] এর মধ্যে অল্প গানই স্বদেশ চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। নজরুলের এই গানগুলোতে মূলত ভারতবর্ষের শিক্ষায়, সাহিত্যে, জ্ঞানে বিদ্যায়, অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদেরকে উদ্দীপ্ত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সধর্মী ভাইদেরকে টেনে তোলার আকাঙ্খা থেকে এ গানগুলো সৃষ্টি হয়েছে। 'বিশ্ব মুসলিম সমাজের নবজাগরনের প্রেরণা ও বাংলার সমাজ বিন্যাসে হিন্দু মুসলিম পরিস্থিতির ভারসাম্য রক্ষা এই দুই বোধ থেকেই নজরুল মুসলিম জাগরনে কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত ছিলেন। নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব বোধ থেকে নজরুল নানা ধরনের রচনায় এই আহবান ধ্বনিত করে তুলেছিলেন। গীত রচনা ছিল তার একটি অংশ বিশেষ'।[১]

নিঃসর্গ বন্দনামূলক গান

নজরুলের সাহিত্য এবং সঙ্গীতে দেশপ্রেম নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নিঃসর্গ বন্দনার মাধ্যমে স্বদেশচেতনার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা এখানে আলোচনা করা হলো। দেশ বন্দনামূলক গানের মধ্যে এগুলো সম্পৃক্ত না ক'রে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নজরুলের পূর্বে এই ধারার সবচেয়ে সফল সঙ্গীতকার নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গানে বাংলার প্রকৃতির যে স্নিগ্ধ রূপ ধরা পড়ে অন্য কারো গানে এমনটি আর পাওয়া যায় না। যেমন–

আকাশ ভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ।
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান ॥

তবে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বন্দনার প্রধান অংশই বর্ষাকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রকৃতি বন্দনায় নজরুলের যে পার্থক্য তা হচ্ছে কবিগুরু প্রকৃতিকে অনুভুতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন অর্থ্যাৎ ব্যক্তি কেন্দ্রিক। কিন্তু নজরুলের প্রকৃতি কবি হৃদয়ের বাইরে দেশকেন্দ্রিক এবং সর্বজনীন। এজন্যই এখানে দেশচেতনা অনুরনিত। যেমন-

'শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা, আয়রে আয়
গিরি-দরী-বনে-মাঠে-প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায় ॥
ধানের ক্ষেতে বনের ফাঁকে
দেখে যা মোর কালো মা'কে
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিণী বীণ বাজায়' ॥[২]

এখানে একদিকে যেমন বাংলার চিরন্তন নিঃসর্গ সৌন্দর্য অংকিত হয়েছে, তেমনি কবি এখানে বাংলা মায়ের অপরূপ রূপ দেখার আমন্ত্রণও জানিয়েছেন। মায়ের প্রতি কবির ভালোবাসার অভিব্যক্তি এভাবে ফুটে উঠেছে গানটিতে। এ ধরনের অসাধারণ দেশাত্ববোধকগান বাংলাভাষায় খুব কমই আছে। নজরুলের এই ধারার আরো কিছু গান নিম্নরূপ–

১. একি অপরূপ রুপে মা তোমায় [গানটি একই সঙ্গে দেশবন্দনার গানও]
২. জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা
৩. বাংলা মা তোর সোনার ক্ষেতে দেখা যায় কার আঁচলখানি
৪. সোনার আলোয় ঢেউ খেলে যায় মাঠের ঘাসে ঘাসে

নিঃস্বর্গ বন্দনা মূলক গানের মধ্যে ঋতুর গানগুলোও পড়ে। নজরুলের এই ধারার গান একবারে কম নয়। কিছু কিছু ঋতুর গানে দেশ তথা দেশের মানুষের কষ্টের কথা আছে। যেমন বর্ষার দুটি গান–

৫. ঝরে বারি গগনে ঝুরু ঝুরু
৬. ঝরিছে অঝোর বর্ষার বানী

ঋতু বিষয়ক গানের সঙ্গে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কবি হৃদয়ের গীতি ময়তা সম্পর্কিত হলেও কিছু কিছু গানে আমরা ভিন্নতা পাই। যেমন- শরতের গান–

৭. 'এস শারদ প্রাতের পথিক' গানটিতে কবি লিখেছেন-

শ্যাম শষ্যে কুসুমে হাসিয়া
এস হিমেল হাওয়ায় ভাসিয়া
এস ধরনীরে ভালবাসিয়া ।

আবার শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় জল রঙে আঁকা ছবির মত ধরা পড়ে হেমন্তে বাংলার অসাধারণ রূপ।

৮. সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায় ঢেউ খেলে যায় নবীন আমন ধানের ক্ষেতে।
হেমন্তের ঐ শিশির নাওয়া হিমেল হাওয়া সেই নাচনে উঠলো মেতে ॥

এভাবেই নজরুল তার নিঃসর্গ বন্দনামূলক গানে দেশ মাতৃকাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন অকৃত্রিম অনুরাগে।

ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সমৃদ্ধ দেশাত্ববোধক গান

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গরচনা অনেক থাকলেও ব্যঙ্গগানের সংখ্যা তেমন একটি উল্লেখযোগ্য নয়। সেই সঙ্গে দেশাত্ববোধ সম্পন্ন ব্যঙ্গ গানের সংখ্যা আরও কম। ব্যঙ্গ গানে খোঁচা বা আঘাত থাকলেও এর মধ্যে দিয়ে রচয়িতার স্বদেশানুরাগ আভাসিত হতে পারে।

'ব্যঙ্গ গান আমাদের বোধ বা চৈতন্যের ওপর আঘাত দেয়। সে আঘাত উপভোগ্য। কারণ তার মধ্যে হাস্যকর উপকরন থাকে। মোহ, জড়তা, দুনীতি, দুর্বুদ্ধি, অন্যায়, অত্যাচার, কুসংস্কার সমাজ বা জাতীয় জীবন থেকে এ সব দূর করার ব্যাপারে এই উপভোগ্য আঘাত" একজন রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা বা একজন সমাজ সংস্কারকের উপদেশের চেয়ে কম উপযোগী নয়'।[৩]

'বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ কাব্যের সুচনা কবি ঈশ্বর গুপ্তের [১৮১২-৫৯] হাতে। তবে বাংলাগানে এই ধারার পথিকৃত এবং সফল রচয়িতা নিঃসন্দেহে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় [১৮৬৩-১৯১৩]। একই সময় ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বেনোযারীলাল গোস্বামী, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ খ্যাতিমান সাহিত্যিকগনও দেশাত্ববোধক ব্যঙ্গ কবিতা- গান রচনা করেছেন। "বিশেষ করে স্বদেশী আন্দোলনের সময় লেখা বিজয়চন্দ্রের কয়েকটি সুন্দর ব্যঙ্গ কবিতা এবং রজনীকান্তের কয়েকটি অপূর্ব ব্যঙ্গসঙ্গীত জাতীয়তাবোধের দিক থেকে এখনো কিছু চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। বিশ শতকের প্রথম চার দশকে কয়েকজন বিশিষ্ট কবি ও গীতিকারের দেশাত্ববোধক ব্যঙ্গ রচনায় নতুন প্রেরনার পরিচয় ফুটে ওঠে। এদের মধ্যে মুকুন্দদাস, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র ঘটক, বন বিহারী মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র পন্ডিত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কাজী নজরুল ইসলাম এবং বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য'।[৪]

ব্যঙ্গগীতি বা রচনা মূলতঃ কোনো বিশেষ সময়ের বা ঘটনা কেন্দ্রিক রচনা। কাজেই এর মধ্যে ধরা পড়ে একটি যুগের বিশেষ সামজিক বা রাষ্ট্রীয় অবস্থা; যাকে বিষয় করে গীতিকারগণ গান রচনা করেন। সঙ্গীতকার কাজী নজরুল ইসলাম তার ব্যঙ্গগীতিতে সমকালের নানা ঘটনা ও অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন সার্থক ভাবে। হাসির গানের রচয়িতা ডি এল রায়ের পর তাই এ ধারার অন্যতম সফল কবি নজরুল। 'তার হাসির গান রচনার আরম্ভ, কৈশোর কালে লেটোর দলের গান লেখার সময়ই। তারপর বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যেমন সিরিয়াস তেমনি হিউমারাস গান তিনি লিখেছেন অজস্র। রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক, ধার্মিক, প্রভৃতি কোন বিষয়ই বাদ পড়েনি তার তীর্যক দৃষ্টি থেকে। সেগুলির মধ্যে বেশিভাগই বিদ্রুপাত্মক'।[৫]

নজরুলের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গগান নিম্নে উল্লেখ করা হলো। তবে গানটি রবীন্দ্রনাথের একটি গানের প্যারোডি–

'তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে, ধন্য তুমি ধন্য হে।
আমারই গান তোমারই ধ্যান, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥
রেখেছ শাস্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই-আদরে,
বেঁধেছ শিকল প্রণয়-ডোরে, তুমি ধন্য ধন্য হে' ॥[৬]

এই ব্যঙ্গ গানটি নজরুল হুগলি জেলের জেল সুপারকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন– যিনি সে সময়ে কয়েদিদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাতেন। এ ছাড়াও 'সায়মন কমিশনের রির্পোট' নজরুলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গ গান। এটিও তার দেশপ্রেমের পরিচায়ক–

[প্রথম ভাগ : ভারতে যাহা দেখিলেন]

কোরাস্ 'কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে', রিপোট লেখেন সায়মন
হুটোপুটি ক'রে ছুটোছুটি করে বুড়োবুড়ি, কাজে নাই মন।
'ম্যাদা' দল আর 'উদো' দল পায়ে হস্ত বুলায় হর্দম
পুঁচকে দলের ফচ্‌কে ছোঁড়ারা ছিটাইছে বটে কর্দম'।[৭]

বৃটিশ শাসককে ব্যঙ্গ ক'রে লেখা রাজনৈতিক ব্যঙ্গ গানে নজরুলের সাফল্য যে অতুলনীয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে নজরুলের স্বদেশ চেতনামূলক ব্যঙ্গ গানের তালিকা দেয়া হলো।

১. এই বেলা নে ঘর ছেয়ে এ দেশটা ভীষণ মূর্খ [প্রাথমিক শিক্ষা বিল]
২. একে একে সব মেরেছিস, জাতটা শুধু ছিল বাকি
৩. ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতারে তোর [ভুত ভাগানোর গান]
৪. কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে [সাইমন কমিশনের রিপোর্ট]
৫. কে বলে, মোদের ল্যাডা গ্যাপকার [ল্যাবেন্ডিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত]
৬. টিকি আর টুপিতে লেগেছে দ্বন্দ্ব বচন যুদ্ধ ঘোর
৭. তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে [সুপার বন্দনা]
৮. থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় [শ্রীচরণ ভরসা]
৯. দড়াদড়ির লাগবে গিঁট [রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স]
১০. দাদা বলতো কিসের ভাবনা

১১. দ্যাখো হিন্দুস্থান সাহেব মেমের

১২. দে গরুর গা ধুইয়ে

১৩. ধ্বংশ কর এ কচুরিপানা

১৪. নখ-দন্ত বিহীন চাকুরী অধীন [বাঙালী বাবু]

১৫. নমঃ নমঃ রাম খটি

১৬. বগল বাজা দুলিয়ে মাজা [ডোমিনিয়ন স্টেটাস]

১৭. বসেছে শান্তি-বৈঠক বাঘ সিংহ হাঙ্গর [লীগ অব নেশন]

১৮. ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার

১৯. সাহেব কহেন চমৎকার [সাহেব ও মেমসাহেব] প্রভৃতি।

কোরাস্ ও মার্চের গানে দেশাত্ববোধ

নজরুলের বৈচিত্রময় দেশাত্ববোধক গানের ধারায় কোরাস ও মার্চের গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধারার গানের আঙ্গিক ভিন্নতা তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে বাংলায় মার্চের গান সফলভাবে রচনা করার প্রথম কৃতিত্ব যে নজরুলের তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও ডি এল রায় তার পূর্বেই মার্চের গান রচনা করেছেন। এখানে বলে নেয়া ভাল মার্চের গান বলতে কোন বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক গানকে বোঝানো হয় না। মার্চের গান এক ধরনের কোরাস বা সম্মিলিত কুচকাওয়াজের গান। তরুন ছাত্রদলের উদ্দেশ্যে রচিত নজরুলের কিছু গান তাই মার্চের গানের অন্তর্ভূক্ত।

'নজরুল যে সব কোরাস গান রচনা করেছিলেন তা সুরের দিক থেকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন- মার্চের সুরে রচিত কিছু গান যার মধ্যে কুচকাওয়াজের গান, নারী জাগরনের গান, ছাত্রদলের গান, সৈন্যদলের গান। আরেক ধরনের কোরাস গান তিনি রচনা করেছিলেন যা পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী - বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে'।[৮]

নজরুলের পূর্বেও বাংলায় কোরাস গান ছিল। মূলত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই ধারার জন্ম। সেদিন দেশবাসীকে জাতীয় চেতনায় উদ্দীপ্ত করতে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ডি এল রায়, অতুল প্রসাদ প্রমুখ গান রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বাউল ও কীর্তন ভাঙ্গা সুরে কোরাস গান লিখেছেন। সৈনিক কবি নজরুল শুধু কোরাস গানই লেখেননি, সৈনিক তরুন দলের মার্চ পাস্টের তালে তালে সুর মিলিয়ে রচনা করেছেন কোরাস- মার্চের গান। এই গানগুলিতে তারুন্যের উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য তো বটে সেই সঙ্গে স্বদেশ চেতনার পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

তাঁর কোরাস্ গানগুলি বাস্তবিকই স্বদেশিকতা ও সংগ্রামী ভাবের উদ্বোধক। কোরাসেরই স্বগোত্র মার্চের গানের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো–

১. 'চল্ চল্ চল্ ! চল্ চল্ চল্ !
উর্দ্ধে গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুন দল
চল রে চল রে চল
চল্ চল্ চল্'॥[৯]

মার্চের আরও একটি উল্লেখযোগ্য গান–

২. 'বীর দল আগে চল্
কাঁপাইয়া পদভারে ধরণী টলমল
যৌবন-সুন্দর চির-চঞ্চল' ॥[১০]

নজরুলের কোরাস গানের মধ্যে অন্যতম একটি রচিত হয়েছিল **১৯২১** সালে কুমিল্লায় ইংল্যান্ডের যুবরাজের আগমন উপলক্ষে যে হরতাল হয়- তার শোভাযাত্রায়।

কোরাস্ : 'ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও !
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী, সন্তান দ্বারে উপবাসী।
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও ! জাগো গো, জাগো গো,
তন্দ্রা-অলস জাগো গো, জাগো রে, জাগো রে' ॥[১১]

নজরুলের কোরাস্ গানের সংখ্যা তেমন বেশি নয়। ইতোমধ্যেই আমরা এগুলোর কিছু বিভিন্ন ধারার মধ্যে আলোচনা করেছি। লক্ষ্য করার বিষয় যে এই গানগুলো দুটি সুরের ধারায় বিভক্ত। একটি বিদেশী [ইংল্যান্ড] সুরের কাঠামো [মার্চ], অন্যটি রাগ সঙ্গীতের কাঠামোতে সুরারোপিত। প্রথমটির উদাহরণ-'আমরা শক্তি আমরা বল' দ্বিতীয়টির উদাহরণ 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম' সংখ্যায় কম হলেও নজরুলের কোরাস্ গানগুলি অনবদ্য নিঃসন্দেহে।

'কোরাস গানগুলির মধ্যে আমরা কবির স্বাদেশিকতা ও সংগ্রামী ভাবের দ্যোতনা দেখতে পাই। কবির মার্চের গানগুলি অর্থ্যাৎ যুদ্ধ যাত্রার গানগুলির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করি বীর রসের প্রাবল্য। তার এই পর্যায়ের গানগুলি সংগ্রামশীলতার দ্যোতক ও দেশপ্রেমবোধক'।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জাতীয় উন্নতিমূলক গান

পরাধীন ভারতবর্ষকে শুধু শৃঙ্খলামুক্ত করার বাসনাই ব্যক্ত করেননি নজরুল। তিনি একই সঙ্গে অভাগা ভারতের জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখতে অনুপ্রানিত করেছেন। তার গানে, সাহিত্যে নানাভাবে সেই প্রেরনা ব্যক্ত হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কমূলক ও জাতীয় উন্নতি মূলক দেশপ্রেমের গানের সংখ্যা হাতে গোনা দু একটি। এরই মধ্যে শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে ধীবরদের গান-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে জেলেদের উদ্দেশ্য ক'রে কবি যা বলেছেন তাতে জাতীয় উন্নয়নেরই ইঙ্গিত করেছেন তিনি।

'আমরা নীচে পড়ে রইব না আর শোন্ রে ও-ভাই জেলে
এবার উঠবো রে সব ঠেলে।
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠল সবাই রে, ঐ মুটে-মজুর হেলে
এবার উঠবো রে সব ঠেলে' ॥[১৩]

আরেকটি গানে স্বদেশমাতার ভিখারিণী বেশ কবিকে ব্যথিত করে তুলেছে তাই তিনি চান 'মা' তার বিশ্ব মাঝে মাথা উচুঁ ক'রে দাঁড়াক–

'এসো মা ভারত-জননী আবার জগৎ-তারিণী সাজে
রাজরাণী মা'র ভিখারিণী বেশ দেখে প্রাণে বড় বাজে' ॥[১৪]

বিশ্ব যখন সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত, ভারত তখন পিছিয়ে পড়ছে, অথচ ভারতের রয়েছে অতীত গৌরব ইতিহাস। কেন তার প্রিয় মাতৃভূমির এমন পতন হলো, কবি তা জানতেন। তাই এগিয়ে চলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি আশার আলোর আহবানে 'বোধন' সঙ্গীতে বলেছেন–

'দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ মরুভু পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে' ॥[১৫]

আমরা আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সম্পর্কমূলক অন্তত একটি গান পেয়েছি নজরুলের। এখানেও স্বদেশ চেতনা আভাসিত। গানটি ১৯৪২ সালে ৯ ফেব্রুয়ারী চীনের নেতা চিয়াংকাইশেক ও তার স্ত্রী ভারত সফর উপলক্ষ্যে কবি নজরুল রচনা করেন। নজরুলের দেশাত্ববোধক গানের ধারায় এটি একটি ব্যতিক্রমী সন্দেহ নেই–

'চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক। ঐক্যের জয় হোক। সাম্যের জয় হোক।
ধরার অর্ধ নর-নারী মোরা রহি এই দুই দেশে
কেন আমাদের এতো দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে।
সহিব না আর এই অবিচার খুলিয়াছি আজি চোখ ॥[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহী চেতনামূলক গান

দেশাত্ববোধক বাংলা সঙ্গীতে নজরুলের সবচেয়ে বড় অবদান মূলত তার পরাধীনতা বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক গানে। বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাসে আর কোন শিল্পীই এ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। শৈশব থেকে নজরুল মানসে স্পর্শ করেছিল পরাধীনতার গ্লানী। আর তাই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার কবিতায় ও গানে। সে সময়ে ভারত মানসে বৃটিশ বিরোধী তথা পরাধীনতা বিরোধী যে মানসিকতা দানা বেঁধে উঠেছিল তারই বাস্তব প্রকাশ নজরুলের গানে লক্ষ্য করা যায়। নজরুল তার এই গানগুলি যেমন বিদ্রোহের এক জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন, তেমনি শৃঙ্খল মুক্তির সংগ্রামে অনুপ্রাণীত করেছেন দেশবাসীকে। তার মতো আর কেউ সেদিন বাঙ্গালীকে এভাবে উদ্দীপ্ত করতে পারেননি, পারেননি স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর করতে। এই গানগুলোতে শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোমল,হ্রস্য উচ্চারণনযুক্ত শব্দ বাদ দিয়ে উচ্চগ্রামের ওজোগুন সম্পন্ন ভারি মহাকাব্যিক তৎসম শব্দ প্রয়োগ করেছেন। ফলে যেমন বানীর তেজোদীপ্ততা বেড়েছে, তেমনি সুর ও তার স্বাভাবিক মাত্রা ছেড়ে উচ্চপদে আহরন করেছে। গানগুলো আয়তনের দিক থেকেও বেশ র্দীঘ। প্রথমেই কিছু শব্দ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন– কারা, লৌহ, কপাট, শিকল, তরবারী, অভ্রভেদী, গন্ডমুক্ত, মিথ্যাসুদন, আত্মশক্তি, উদ্দাম, ঝঞ্জা, দুর্গম, কান্তার, শঙ্খ, নিশান, শঙ্কাশূন্য, বজ্র, যাত্রী, বাঁধন প্রভৃতি।

এখানে কয়েকটি বিদেশী শব্দ বাদ দিলে বেশির ভাগই তৎসম এবং ওজোগুন সম্পন্ন অর্থ ও ধ্বনি তাৎপর্যময় শব্দ। এখানে লোহা প্রয়োগ না করে লৌহ, দরজা হয়েছে কপাট, পতাকা হয়েছে নিশান প্রভৃতি অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। নজরুল সচেতন শিল্পী বলেই বিদ্রোহের এই গানগুলোতে 'লাল পতাকা' না লিখে লাল নিশান লিখেছেন। সম্ভবত নজরুলের দেশাত্ববোধক গানের মধ্যে এই ধারার গানই সর্বাধিক। এই ধারার গান রচনায় নজরুলের সফলতার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, নজরুল তার নিজের অভিজ্ঞতার পরিমন্ডল থেকে যে আবেগে ঋদ্ধ হয়েছেন এখানে তাই-ই তুলে ধরেছেন। সাংবাদিক ছিলেন, বিদ্রোহমূলক কাব্য রচনা করেছেন, জেল খেটেছেন, রাজনীতি করেছেন, গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কাজেই এ গানগুলো যেন 'প্রানের গভীর থেকে উৎসারিত'। এখানে 'কারার ঐ লৌহ কপাট ! ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী' গানটির প্রসঙ্গে বলা যায়- দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস "বাঙলার কথা" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন, সেই সময় তাকে বৃটিশ সরকার বন্দি করে জেলে পাঠিয়ে দেয়। তার স্ত্রী বাসন্তী দেবী তখন পত্রিকাটি সম্পাদনার ভার নেন। তার অনুরোধে নজরুল এই গানটি লিখে দেন 'বাঙলার কথার জন্য' যা ২০ জানুয়ারী, ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। পরে লেখাটি 'ভাঙ্গার গানে' স্থান পায়। এই ধারার আরেকটি উল্লেখযোগ্য গান 'ঐ অভ্রভেদী তোমার ধ্বজা উড়লো' এবং 'এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল' গান দুইটি কুমিল্লায় রচনা করেন। সে সময়টা ছিল অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। কুমিল্লায়ও তার ঢেউ এসে লেগেছে।

সভা, শোভাযাত্রা আর আন্দোলনে কুমিল্লা তখন মূখর। নজরুল কুমিল্লার রাস্তায় মিছিলে যোগদান করে গাইলেন-এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল বন্দিনী মার আঙিনায়' গানটি বিশের বাঁশীতে সংকলিত।

'শিকল পরার ছল' গানটি লিখেছিলেন হুগলী জেলে বসে। এসময় তিনি অনশন ধর্মঘটও করেছিলেন। 'দুর্গম গীরি কান্তার মরু' কবির একটি উল্লেখযোগ্য গান। এটি একই সঙ্গে বিদ্রোহ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গান।

পরাধীনতার বিরুদ্ধে নজরুলের সংগ্রামী চেতনা প্রকাশ পেয়েছে বহু গানে। কখনো সরাসরি কখনো বা পরোক্ষাভবে। মানুষকে কোনো চেতানায় উদ্দীপ্ত করাও যে মহান গুন তা নজরুলের এই গানগুলোর মধ্যেই আভাসিত হয়েছে। ১৯২৪ সালে হুগলীতে গান্ধীজীর অভ্যর্থনায় দুটি গান করেন নজরুল। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হলেও এর মধ্যে পরাধীনতা শেকল ছেঁড়ার আহ্বান আছে–

১. আজ না চাওয়ার পথ দিয়ে কে এল ঐ কংস কারার দ্বার ঠেলে।

২. ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর।

ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর ॥

'বিশের বাঁশীর'-র 'বন্দী বন্দনা' গানটি ১৩২৮ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মল্লার রাগ উল্লেখিত এই দীর্ঘ গানটি নজরুল ১৯২১ সালে কুমিল্লায় রচনা করেন। স্বাধীনতার জয় এবং কারা বন্দীদেরকে দেশচেতনায় উদ্দীপ্ত করার একটি অপূর্ব গান। গানটির কিছু অংশ তুলে ধরা হল–

'আজি রক্ত নিশি-ভোরে একি শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে মুক্তি-হাসি হাসে,
টুটিছে ভয়-বাঁধা স্বাধীন হিয়া-তলে' ॥[১৭]

নজরুল স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতেন বলেই প্রিয় মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করার প্রয়াসে গান রচনা করেছেন। 'ভারবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম তথা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত হলেও নজরুল ইসলামের এই সংগ্রামী সংগীতমালার আবেদন তাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার কালাতিক্রমী প্রেরনার রূপায়ন ঘটেছিল এই সব গানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল স্তরে নজরুলের এসব সংগ্রামী সংগীত মানুষকে অনুপ্রাণীত করেছে'।[১৮]

আর এখানেই সম্ভবতঃ নজরুলের স্বদেশ চেতনামূলক গানের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য যা কাল থেকে কালান্তরের মানুষকে অনুপ্রাণীত করতে পেরেছে। স্থান কালের উর্দ্ধে উঠে স্বাধীনতার, মানবতার মুক্তির বাণী শুনিয়েছে। নজরুলের পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনামূলক কিছু গানের তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো–

১. আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এল

২. আজি রক্ত নিশি ভোরে

৩. আজ ভারত ভাগ্য বিধাতার বুকে

৪. আজ ভারতের নব আগমনী

৫. আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈঃ -বরাভয়

৬. এই শিকর পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল

৭. এসো এসো এসো ওগো মরন

৮. কারার ঐ লৌহ-কপাট

৯. ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর

১০. জননী! জননী! আবার জাগো শুভ্র শারদ প্রাতে

১১. বন্দী তোমায় ফন্দি- কারার গন্ডী- মুক্ত বন্দী-বীর

১২. বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা

১৩. বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও

১৪. বল ভাই মাভৈঃ , মাভৈঃ

১৫. ঐ অভ্রভেদী তোমার ধ্বজা

১৬. এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল

১৭. বল নাহি ভয়, নাহি ভয়

১৮. তোরা সব জয়ধ্বনি কর

১৯. এসো বিদ্রোহী মিথ্যাসুদন

২০. টলমল টলমল পদভরে

২১. শঙ্কা শূন্য লক্ষ কণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ

২২. শিকল যাদের উঠিছে বাজিয়া বীরের মুক্তি তরবারি– ইত্যাদি।

এ অধ্যায় সংশ্লিষ্ট যে সকল গান সংযুক্ত করা হয়েছে সে গানগুলির বিভিন্ন তথ্যাদি নিম্নে সন্নিবেশ করা হলো–

তরুণ যুবা ছাত্রদলের গান

১. অগ্রপথিক হে সেনাদল ঃ সুত্র : মাসিক সওগাত, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সংখ্যা। শিরোনাম : অগ্রপথিক। গ্রন্থ : ১. জিঞ্জীর , ২. নজরুল গীতিকা, ৩. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ও ৪. গীতি সংকলন, কাজী নজরুল ইসলাম, তৃতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। শ্রেণী : তরুণ যুবা ছাত্রদলের গান। তাল : মার্চ ছন্দ।

২. আমরা শক্তি আমরা বল ঃ গ্রন্থ : ১. সর্বহারা, ২. সঞ্চিতা, ৩. নজরুল-গীতিকা ও ৪. নজরুল রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একডেমী, ঢাকা।, শিরোনাম : ছাত্রদলের গান, রেকর্ড নম্বর : জিই-৭৮৩২, শিল্পী : গৌরি কেদার ভট্টচার্য্য ও পার্টি, শ্রেণী : গণ-সঙ্গীত, সুরচয়ন : কীর্তন বাউল। ১৯২৬ সালের ২২শে মে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীতরূপে কবি এই গানটি রচনা করেন।

৩. চলরে চপল তরুন দল ঃ গ্রন্থ : গানের মালা, মার্চের সুর, পত্রিকা : মোয়াজ্জিন,আশ্বিন-১৩৪০ সংখ্যা। রেকর্ড প্রকাশকাল : জানুয়ারী-১৯৩৪, রেকর্ড নম্বর : টুইন, এফটি-২৯৬৭, শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত।

৪. জগতে আজিকে যারা আগে চলে ঃ গ্রন্থ : ১. গুলবাগিচা, ২. নজরুল গীতি–অখন্ড ও ৩. নজরুল গীতি, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা। বিষয় : দেশাত্ববোধক, শ্রেণী : তরুণ ছাত্রদলের গান।

৫. জাগো রে তরুন দল ঃ গ্রন্থ : ১.নজরুল গীতি, পঞ্চম খন্ড, ২. সঞ্চয়ন, ৩. নজরুল গীতি–অখন্ড ও ৪. নজরুল গীতি, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা। বিষয়: দেশাত্ববোধক, শ্রেণী : ছাত্র সঙ্গীত।

৬. দে দোল্ দে দোল্ ঃ গ্রন্থ : ১. ফণি মনসা, ২. নজরুল গীতি, তৃতীয় খন্ড, ৩. নজরুল গীতি–অখন্ড ও ৪. নজরুল গীতি, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা। স্বরলিপি-গ্রন্থ : ক. নজরুল স্বরলিপি, তৃতীয় খন্ড ও খ. সুনির্বাচিত নজরুল গীতির স্বরলিপি, চতুর্থ খন্ড।

৭. নতুন পথের যাত্রা পথিক ঃ রচনাকাল ও স্থান : ২রা জুলাই, ১৯২৬, নারায়ণগঞ্জ। পত্রিকা : অভিযান, ভাদ্র-১৩৩৩ সংখ্যা। শিরোনাম : অভিযান। গ্রন্থ : ১. সিন্ধু হিন্দোল ও ২. নজরুল রচনাবলী। সুরকার : শেখ লুতফর রহমান, বিষয় : দেশাত্ববোধক, শ্রেণী : তরুণ ছাত্রদলের গান, তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা।

৮. রাঙা পথের ভাঙ্গন ব্রতী অগ্রপথিক ঃ গ্রন্থ : ১. সন্ধ্যা [তরুণ তাপস্য] ও ২. নজরুল গীতি–অখন্ড, কলকাতা। অন্যান্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

ইসলামী জাগরণমূলক গান

১. আল্লা আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয় ঃ গ্রন্থ : ১. নজরুল গীতি–অখন্ড, কলকাতা, ২. জুলফিকার ও ৩. আব্বাসউদ্দীনের গান। স্বরলিপি-গ্রন্থ : ক. নজরুল সুরলিপি, ষষ্ঠ খন্ড ও খ. নজরুল সুর সংকলন। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭১০৯, রেকর্ড প্রকাশকাল : মে-১৯৩৩, শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ। রাগ : ভৈরবী, শ্রেণী : ইসলামী, তাল : কাহার্‌বা।

২. একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ ঃ গ্রন্থ : ১. নজরুল গীতি–অখন্ড ও ২. সন্ধ্যা। বিষয় : দেশাত্ববোধক, শ্রেণী : ইসলামী চেতনামূলক।

৩. খুশী লয়ে খোশরোজের আর খেয়ালী খোস নসীব ঃ পত্রিকা : জয়তী-১৩৩৮ সংখ্যা, গ্রন্থ : ১. জুলফিকার, ২. নজরুল গীতি, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা ও ৩. নজরুল গীতি–অখন্ড, কলকাতা। স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল স্বরলিপি, পঞ্চম খন্ড। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭০২৭, রেকর্ড প্রকাশকাল : ১৯৩২, শিল্পী : মহম্মদ কাশেম। শ্রেণী : ইসলামী দেশচেতনামূলক, রাগ : কাফি, তাল : কাহার্‌বা।

৪. জাগো না সে জোশ লয়ে আর মুসলমান ঃ গ্রন্থ : জুলফিকার, রাগ: ভৈরবী, তাল : কার্ফা, রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-২৯৬৯, রেকর্ড প্রকাশকাল : ডিসেম্বর-১৯৩৩, শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ। স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল সুরলিপি, চতুর্থ খন্ড, ঢাকা।

৫. তওফিক দাও খোদা ইসলামে ঃ গ্রন্থ : গুলবাগিচা, রাগ : ইমন মিশ্র, তাল : পোস্তা, পত্রিকা : মোহাম্মদী, ফাল্গুন-১৩৩৯ সংখ্যা। রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-২৯৬৯, রেকর্ড প্রকাশকাল : নভেম্বর-১৯৩৩, শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ। স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল সুরলিপি, চতুর্থ খন্ড, ঢাকা।

৬. দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে ঃ গ্রন্থ : জুলফিকার [মার্চের সুর], রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭০৬৮, রেকর্ড প্রকাশকাল : ডিসেম্বর-১৯৩২, শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ। স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, একাদশ খন্ড, ঢাকা।

৭. ধর্মের পথে শহীদ যারা ঃ এই গানটি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণণা তৃতীয় অধ্যায়ে সংযোজন করা হয়েছে।

৮. বাজিছে দামামা বাঁধ রে আমামা ঃ গ্রন্থ : গুলবাগিচা, রাগ : ইমন মিশ্র, তাল : একতাল। পত্রিকা : মোহাম্মদী, চৈত্র-১৩৩৯ সংখ্যা। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭২১২, রেকর্ড প্রকাশকাল : মার্চ-১৯৩৪, শিল্পী : মহম্মদ কাশেম। স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল স্বরলিপি, চতুর্থ খন্ড, হরফপ্রকাশনী, কলকাতা।

৯. ভুবনজয়ী তোরা কি হায়, সেই মুসলমান ঃ গ্রন্থ : গুলবাগিচা। রেকর্ড নম্বর : মেগাফোন জেএনজি-১২৪, রেকর্ড প্রকাশকাল : জুলাই-১৯৩৪, রাগ : পাহাড়ী মিশ্র, তাল : কার্ফা, শিল্পী : মি. শেখ মোহন।

১০.সকাল হ'ল শোন্ রে আজান ঃ গ্রন্থ : জুলফিকার, দ্বিতীয় সংস্করণ। রেকর্ড নম্বর : ১. টুইন এফটি-১২৫৯৭, রেকর্ড প্রকাশকাল : নভেম্বর-১৯৩৮, শিল্পী: আশরাফ আলী ও ২. রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-১৯৭৩২, রেকর্ড প্রকাশকাল : মে-১৯৪৯

শিল্পী : মফিজুল ইসলাম। দ্বিতীয় রেকর্ডের সুর প্রথম রেকর্ড থেকে স্বতন্ত্র। স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল সুরলিপি, তৃতীয় খন্ড, ঢাকা।

১১.সালাম সালাম জামালউদ্দীন ঃ পত্রিকা : মোহাম্মাদী, ভাদ্র-১৩৪৬ সংখ্যা, শিরোনাম : সালাম। গ্রন্থ : ১. নজরুল গীতি-অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ও ২. নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, ঢাকা। এই গানটি সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১২.হাতে হাত দিয়ে আগে চল, হাতে নাই থাক হাতিয়ার ঃ সূত্র : ১. রেকর্ড বুলেটিন ও লেবেল ও ২. ঝড় কাব্যগ্রন্থ। রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-১৩৫৪৫, রেকর্ড প্রকাশকাল : মার্চ-১৯৪১, শিল্পী : আব্বাসউদ্দীন আহমদ। বিষয় : ইসলামী জাগরণীমূলক গান। গ্রন্থ : ১. ঝড় [শিরোনাম : ঘোষণা], ২. নজরুল গীতি-অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ও ৩. নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, ঢাকা। পত্রিকা : ১. শারদীয়া, স্বাধীনতা-১৩৫৪ সংখ্যা ও ২. বাঙ্গালী, ৫ই পৌষ-১৯৪৯ সংখ্যা। স্বরলিপি-গ্রন্থ : ১. নজরুল স্বরলিপি, ষষ্ঠ খন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ও ২. নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, দ্বাদশ খন্ড, ঢাকা।

নিঃসর্গ বন্দনামূলক গান

১. একি অপরূপ রূপে মা তোমায় ঃ এই গানটির বিস্তারিত তথ্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'দেশপ্রেমমূলক গান' এই শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. জননী মোর জন্মভুমি তোমার পায়ে নোয়াই মাথা ঃ এই গানটির ব্যাখাও দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩. বাংলা মা তোর সোনার ক্ষেতে ঃ গ্রন্থ : ১. নজরুল গীতি–অখন্ড, কলকাতা ও ২. নজরুল গীতি,ষষ্ঠ খন্ড, কলকাতা। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৩১৩৯, শিল্পী : ধীরেন্দ্রনাথ দাস। বিষয় : দেশাত্ববোধক, শ্রেণী :নিঃসর্গ বন্দনামূলক।

৪. ঝরে বারি গগনে ঝরু ঝুরু ঃ গ্রন্থ : ১. গানের মালা, ২. নজরুল গীতি, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা ও ৩. নজরুল গীতি–অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা। বিষয় : উচ্চাঙ্গ, শ্রেণী : খেয়াল, রাগ : দেশ, তাল : ত্রিতাল। গানটির সর্বত্রই নিঃসর্গের বন্দনা করা হয়েছে।

৫. ঝরিছে অঝোর বরষার বারি ঃ গ্রন্থ : ১. নজরুল গীতি ও ২. চোখের চাতক। বিষয় : উচ্চাঙ্গ, শ্রেণী : ঋতুসঙ্গীত [বর্ষা], রাগ : মল্লার, তাল : কাওয়ালী।

৬. সোনার আলোয় ঢেউ খেলে যায় মাঠের ঘাসে ঘাসে ঃ গ্রন্থ : নজরুল গীতি–অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা। স্বরলিপি : নজরুল স্বরলিপি, অষ্টম খন্ড, সুরকার : চিত্ত রায়, বিষয় : লোকগীতি [নিঃসর্গ বন্দনামুলক], শ্রেণী : বাউল, তাল : কাহার্‌বা।

৭. এসো শারদ প্রাতের পথিক ঃ পত্রিকা : গুলিস্থান, শ্রাবণ ১৩৪০, গ্রন্থ : ১. গীতিশতদল, ২. নজরুল গীতি, ৪র্থ ও ৫ম খন্ড কলকাতা, ৩. নজরুল গীতি–অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ও ৪. নজরুল হস্তলিপি। স্বরলিপি-গ্রন্থ : ক. সুরধুনী, খ. নজরুল স্বরলিপি, চতুর্থ খন্ড, গ. হিন্দোল, প্রথম খন্ড ও ঘ. সুনির্বাচিত নজরুল গীতির স্বরলিপি, তৃতীয় খন্ড। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭২০৩, রেকর্ড প্রকাশকাল : মার্চ-১৯৩৪, শিল্পী : অনিমা বাদল, বিষয় : ঋতু সঙ্গীত, শ্রেণী : শরতের গান [প্রকৃতি-বন্দনা], রাগ : মিশ্র, তাল : দাদ্‌রা।

৮. সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যায় ঢেউ খেলে যায় ঃ এই গানটির বিস্তারিত তথ্যাদি পূর্বেই সংযোজন করা হয়েছে।

ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সমৃদ্ধ দেশাত্ববোধক গান

১. এই বেলা নে ঘর ছেয়ে ঃ গ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু, শ্রেণী : হাস্যরস সমৃদ্ধ ব্যঙ্গাত্বক গান। শিরোনাম : প্রাথমিক শিক্ষা বিল। মূলতঃ এ গানটির প্রথম চরণ হলো 'এই দেশটা ভীষণ মূর্খ' কিন্তু প্রতি স্তবকের শেষে নেপথ্যে কোরাস্ হিসাবে 'এই বেলা নে ঘর ছেয়ে' গীতো হয়ে থাকে।

২. একে একে সব মেরেছিস, জাতটা শুধু ছিল বাকি ঃ গ্রন্থ : ১. গীতি শতদল, শিরোনাম : জাতের জাঁতিকল ও ২. হারানো গানের খাতা, ঢাকা, শিরোনাম : জাতের জাঁতিকল।

৩. ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : ভুত ভাগনোর গান, শ্রেণী : বাউলের গান।

৪. কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে ঃ গ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু, বিষয় : সাইমন কমিশনের রিপোর্ট, শ্রেণী : হাস্যরসাত্বক।

৫. কে বলে মোদের ল্যাডা গ্যাপচার ঃ গ্রন্থ : ভাঙার গান, শিরোনাম : ল্যাবেন্ডিশ বাহিনীর বিজাতীয় সঙ্গীত। পত্রিকা : ধুমকেতু ১১.৮.১৯২২ সংখ্যা। উপলক্ষ : ইংরেজ সরকার কর্তৃক গঠিত সিভিল গার্ড নামে বাহিনীর উদ্দেশ্যে রচিত।

৬. টিকি আর টুপিতে লেগেছে দ্বন্দ্ব ঃ সুত্র : রেকর্ড কোম্পানীর চুক্তিপত্র ২১.১২.১৯৩৫ তারিখ। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭৪২২, রেকর্ড প্রকাশকাল : অক্টোবর-১৯৩৫, শিল্পী : বিমল গুপ্ত, শ্রেণী : হাসির গান, টাইটেল : ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

৭. তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে ঃ গ্রন্থ : ১. ভাঙ্গার গান, শিরোনাম : সুপার বন্দনা। হুগলি জেলে কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল প্রকার জুলুম কয়েদিদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় জেলের মুর্তিমান জুলুম বড় কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন জানানো হয়েছিল। ২. সঞ্চয়ন, গানটির সুর রবীন্দ্র সংগীত 'তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে'- এর সাদৃশ্যে রচিত।

৮. থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় ঃ গ্রন্থ : ১. চন্দ্রবিন্দু, শিরোনাম : শ্রীচরণ ভরসা, রাগ : সোহিনী, তাল : একতাল ও ২. নজরুল গীতিকা, রাগ : সোহিনী, তাল : একতাল। দুটি গীতিগ্রন্থে বাণীর পার্থক্য রয়েছে। শ্রেণী : হাস্যরস সমৃদ্ধ ব্যঙ্গাত্বক সঙ্গীত।

৯. দড়াদড়ির লাগবে গিঁট ঃ গ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু, শিরোনাম : রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স, শ্রেণী: কমিক।

১০.দাদা বলতো কিসের ভাবনা ঃ সুত্র : মেগাফোন কোম্পানীর টেস্ট কপি রেজিস্টার। রেকর্ড : মেগাফোন, ফেব্রুয়ারী-১৯৪০ [১৪.০২-১৯৪০ তারিখে রেকর্ড হয়]। শিল্পী : সারদা গুপ্ত। সহ-শিল্পী: রঞ্জিত রায় ও নজরুল। টেস্ট কপি নম্বর : OMC-১০৫০৪, টেস্ট কপি বরদা গুপ্তের কাছে রক্ষিত আছে। রেকর্ডটি

ইংরেজ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থ : নজরুল গীতি–অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

১১. দ্যাখো হিন্দুস্থান সায়েব মেমের ঃ গ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু , রাগ : বেহাগ-খাম্বাজ, তাল : দাদরা, শিরোনাম : তৌবা।

১২. ধ্বংস কর এই কচুরীপানা ঃ গ্রন্থ : শেষ সওগাত, বেতার : পল্লী মঙ্গলের আসর, তারিখ : ৩০.১২.১৯৩৯

১৩. নখদন্ত বিহীন চাকরী অধীন ঃ গ্রন্থ : গীতি শতদল, শিরোনাম : বাঙ্গালি বাবু। রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-১২৪২৯, রেকর্ড প্রকাশকাল : জুন-১৯৩৮, শিল্পী : চিন্তাহরণ মুখোপাধ্যায়, সুর : রঞ্জিত রায় [বুলেটিন] কিন্তু রেকর্ড লেবেলে সুর নজরুল। টাইটেল : আমরা বাঙালি বাবু। রেকর্ড কোম্পানীর চুক্তিপত্র ২৯.০৫.১৯৩৩ সম্ভবতঃ ১৯৩৩ সালেও গানটি রেকর্ড হয়েছিল এবং তা বাতিল হয়েছিল।

১৪. নমো নমঃ রাম খুঁটি ঃ গ্রন্থ : গীতিশতদল, শিরোনাম : রামখুঁটি, রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭০৯৮, রেকর্ড প্রকাশকাল : এপ্রিল-১৯৩৩, শিল্পী : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। টাইটেল : খুঁটোর ভয়।

১৫. বগল বাজা দুলিয়ে মাজা ঃ গ্রন্থ : চন্দ্র বিন্দু, শিরোনাম : ডোমিনিয়ন। উপলক্ষ : বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্টেটার্স দেবার ঘোষণার প্রতিক্রিয়া ব্যাঙ্গাত্বক ভাষায় লেখা গান।

১৬. বসেছে শান্তি বৈঠক বাঘ সিংহ হাঙ্গর ঃ এই গানটির কোন তথ্যাদি পরিচয় পাওয়া যায়নি।

১৭. ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার ঃ গ্রন্থ : ১. ভাঙ্গার গান, ২. নজরুল গীতি, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা ও ৩. নজরুল গীতি–অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, স্বরলিপি-গ্রন্থ : ক. সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খন্ড, খ. নজরুল স্বরলিপি, অষ্টম খন্ড ও গ. সুনির্বাচিত নজরুল গীতির স্বরলিপি, প্রথম খন্ড। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-২৭৮৮১, শিল্পী: সত্য চৌধুরী। রচনাকাল : ১৯২২, প্রকাশকাল : আগস্ট-১৯৪৮। বিষয় : দেশাত্ববোধক শ্রেণী : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সমৃদ্ধ হাস্যরসাত্বক। রাগ : মিশ্র খাম্বাজ, তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা।

১৮. সাহেব কহেন চমৎকার ঃ গ্রন্থ : ১. চন্দ্র বিন্দু ও ২. নজরুল গীতি–অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, বিষয় : হাসির গান।

কোরাস্ ও মার্চ সঙ্গীত

১. চল্ চল্ চল্, উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল ঃ গ্রন্থ : ১. সন্ধ্যা, ২. নজরুল গীতিকা, মার্চের সুর ও ৩. সঞ্চিতা। পত্রিকা : ১. শিখা, বৈশাখ-১৩৩৫ [দ্বিতীয় বর্ষ], শিরোনাম : নতুনের গান, ২. মোয়াজ্জিন, বৈশাখ, ১৩৩৫ [প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা], শিরোনাম : উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল ও ৩. সওগাত : নতুনের গান। পাদটীকায় মন্তব্য করা আছে 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুবক সম্মিলনীতে এই গানটি গীত হয়েছিল'। উপলক্ষ : ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুবক সম্মেলন। ১. রেকর্ড নম্বর : মেগাফোন জেএনজি-৭৮, রেকর্ড প্রকাশকাল : অক্টোবর-১৯৩৩, শিল্পী : মেগাফোন কোরাস্ পার্টি, ২. রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭১৫৫, রেকর্ড প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর-১৯৩৩, শিল্পী : ধীরেন দাস ও ৩. রেকর্ড নম্বর

: এইচএমভি এন-৩১১৫২, রেকর্ড প্রকাশকাল : জানুয়ারী-১৯৫০, শিল্পী : গিরীন চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য। চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সিনেমায় গানটি ব্যবহৃত হয়।

২. বীরদল আগে চল ঃ গ্রন্থ : ১. গানের মালা, ২. নজরুল গীতি–অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ৩. হস্তলিপি ও ৪. নজরুল গীতি, তৃতীয় খন্ড, কলকাতা। বিষয় : দেশাত্ববোধক, শ্রেণী : সমর সঙ্গীত, তাল : মার্চের ছন্দ।

৩. ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও ফিরে চাও ঃ রচনাকাল ও স্থান : ২১ শে নভেম্বর, ১৯২১, কুমিল্লা। পত্রিকা : ধুমকেতু, শ্রাবণ-১৩২৯ সংখ্যা, শিরোনাম : জাগরণী গান। গ্রন্থ : ১. ভাঙ্গার গান ও ২. নজরুল গীতি, পঞ্চম খন্ড, কলকাতা। বিষয় : দেশাত্ববোধক। ব্রিটিশ অষ্টম এডওয়ার্ড ভারত পরির্দশনে এলে সারা দেশ হরতাল ও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কবি কুমিল্লায় অবস্থানকালে অসহযোগ আন্দোলনের শোভাযাত্রার সামনে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে তাৎক্ষণিক রচিত এ গানটি গেয়ে সারা শহর ঘুরে এর প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও জাতীয় উন্নতিমূলক গান

১. আমরা নীচে পড়ে রইব না আর ঃ পত্রিকা : লাঙল, ১২শ সংখ্যা, ১৯২৬, শিরোনাম : জেলেদের গান [তবে জাতীয় উন্নয়নের ইংগিত বহন করে]। গ্রন্থ : ১. সর্বহারা, ২. নজরুল গীতি, চতুর্থ খন্ড, কলকাতা, ৩. নজরুল গীতি–অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ও ৪. নজরুল রচনাবলী , দ্বিতীয় খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। বিষয় : বিচিত্রা, শ্রেণী : আনুষ্ঠানিক। খ্রীষ্টাব্দে মাদারীপুর নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রাদেশিক মৎস্যজীবী সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনী গান হিসাবে গাওয়া হয়, কবি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

২. এস মা ভারত-জননী আবার জগৎ-তারিণী সাজে ঃ এই গানটি সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত তথ্যসহ সংযোজন করা হয়েছে।

৩. দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী. শিরোনাম : বোধন। পাদটীকায় বলা হয়েছে, গানটি হাফিজের 'যুসোফে গম গশতা বাজ আয়েদ ব-কিন আন গম্ মখোর' শীর্ষক গজলের ভাব ছায়ায় রচিত। পত্রিকা : মোসলেম ভারত, জ্যৈষ্ঠ-১৩২৭ সংখ্যা, শিরোনাম : বোধন। সুর-উৎস : সেদিন সুনীল জলধি হইতে [দ্বিজেন্দ্রগীতি]।

৪. চীন ও ভারতে মিলেছি আবার ঃ সূত্র : রেকর্ড লেবেল। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-২৭৩০৩, রেকর্ড প্রকাশকাল : আগস্ট-১৯৪২, শিল্পী : প্রতিভা ঘোষ, জগন্ময়মিত্র ও সত্য চৌধুরী। বেতার : চীনের জাগরণে। সুত্র : শৈল দেবীর খাতা]। স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল স্বরলিপি, চতুর্থ খন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা। গ্রন্থ : ১. নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড, ঢাকা ও ২. নজরুল গীতি অখন্ড, হরফ।

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্রোহী চেতনামূলক গান

১. আজ না চাওয়া পথ দিয়ে ঃ গ্রন্থ : ফণিমনসা, শিরোনাম : বাংলায় মহাত্মা, রচনাকাল : জ্যৈষ্ঠ-১৩৩১, উপলক্ষ : মহাত্মা গান্ধীর হুগলী আগমন উপলক্ষে রচিত।

২. আজি রক্ত নিশি ভোরে ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : বন্দী-বন্দনা। পত্রিকা : ১. নারায়ণ, মাঘ-১৩২৮ সংখ্যা, রাগ : মল্লার, তাল : তেওড়া ও ২. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য , মাধ ১৩২৮, শিরোনাম: বন্দী-বন্দনা, রচনা স্থান : কান্দির পাড়, কুমিল্লা। স্বরলিপি : স্বরলিপিটি নলিনীকান্ত সরকার পন্ডিচেরী থেকে কাজী অনিরুদ্ধকে পাঠিয়েছিলেন।

৩. আজ ভারত ভাগ্য বিধাতার বুকে ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : তূর্য নিনাদ। পত্রিকা : মাসিক বসুমতী, বৈশাখ-১৩২৯ সংখ্যা।

৪. আজ ভারতের নব আগমনী ঃ গ্রন্থ : সুরসাকী, রাগ : ভৈরবী, তাল : দাদ্‌রা, রেকর্ড নম্বর : মেগাফোন জেএনজি-২৬ , রেকর্ড প্রকাশকাল : ডিসেম্বর-১৯৩২, শিল্পী : ধীরেন দাস।

৫. এই শিকল পরা ছল, মোদের এ শিকল পরা ছল ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : শিকল পরার গান, পত্রিকা : ভারতী, জ্যৈষ্ঠ-১৩৩১ সংখ্যা [স্বরলিপিসহ]। শিরোনাম : শিকল পারা, স্বরলিপিকার : নজরুল , রাগ: খাম্বাজ, তাল : দাদ্‌রা। রেকর্ড নম্বর : কলম্বিয়া জিই-৭৫০৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : জুন-১৯৪৯, শিল্পী : গিরীণ চক্রবর্ত্তী। স্বরলিপি : নজরুল সংগীত আদি স্বরলিপি সংগ্রহ নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, সম্পাদনায় ব্রহ্মমোহন ঠাকুর।

৬. ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশি, শিরোনাম : চরকার গান। পত্রিকা : ভারতী , বৈশাখ-১৩৩১ সংখ্যা [স্বরলিপিসহ]। স্বরলিপিকার : নজরুল। ১৯২৪ সালের মে মাসে মহাত্মা গান্ধী হুগলী এলে একটি সভায় কবি গানটি গেয়ে শোনান।

৭. এস এস এস ওগো মরণ ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : মরণ-বরণ। পত্রিকা : ১. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক, ১৩২৮ সংখ্যা, রাগ : মিশ্র বিলাবল ও ২. প্রবর্তক, আষাঢ়, ১৩৩১ সংখ্যা [স্বরলিপিসহ], স্বরলিপিকার : নলিনীকান্ত সরকার। রচনাস্থান ও সময় : কুমিল্লা, জুন-জুলাই-১৯২১।

৮. কারার ঐ লৌহ কপাট ঃ গ্রন্থ : ভাঙার গান, শিরোনাম : ভাঙার গান। পত্রিকা : বাঙলার কথা, ২০ শে জানুয়ারী-১৯২২ সংখ্যা। ১. রেকর্ড নম্বর : কলম্বিয়া জিই-৭৫০৬, রেকর্ড প্রকাশকাল : জুন-১৯৪৯, শিল্পী : গিরীণ চক্রবর্তী, পরিচালনা : নিতাই ঘটক ও ২. রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৩১১৫২ রেকর্ড প্রকাশকাল : জানুয়ারী-১৯৫০, শিল্পী : গিরীণ চক্রবর্তী। সিনেমা : চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল স্বরলিপি, তৃতীয় খন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

৯. জননী ! জননী ! আবার জাগো ঃ গ্রন্থ : ১. সঞ্চয়ন [জননী জাগো] ও ২. নজরুল গীতি–অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

১০. বন্দী তোমায় ফন্দী কারার গন্ডী মুক্তবন্দী বীর ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : মুক্তবন্দী, উপলক্ষ : জনৈক বিপ্লবীর কারামুক্তি।

১১. বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা ঃ গ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু, রাগ : হাম্বীর, তাল : কাওয়ালী, নাটক : কারাগার, নাট্যকার : মন্মথ রায়। মঞ্চ : ১. মনোমোহন থিয়েটার ও ২. নাট্য নিকেতন। উদ্বোধন : ১. ১৪ .১২ ১৯৩০ ও ২. ০৮. ০৮. ১৯৩১। চরিত্র : ধরিত্রী, শিল্পী : নীহারবালা।

১২. বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশি, শিরোনাম : উদ্বোধন। পত্রিকা : সওগাত, বৈশাখ-১৩২৭ সংখ্যা, শিরোনাম : উদ্বোধন, রাগ : বসন্ত-সোহিনী, তাল : দাদ্‌রা। প্রথম প্রকাশিত নজরুলের গান।

১৩. বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : যুগান্তরের গান। রেকর্ড নম্বর : কলম্বিয়া জিই-৭১৫৬ , রেকর্ড প্রকাশকাল : নভেম্বর-১৯৪৭, শিল্পী : গৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য, পরিচালনা : নিতাই ঘটক। স্বরলিপি-গ্রন্থ : ১. নজরুল সুরলিপি, প্রথম খন্ড, ঢাকা ও ২. নজরুল স্বরলিপি, তৃতীয় খন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

১৪. ঐ অভ্রভেদী তোমার ধ্বজা ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : বিজয় গান। পত্রিকা : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ-১৩২৮ সংখ্যা। রচনাস্থান : কুমিল্লা, জুন-জুলাই-১৯২১ সংখ্যা।

১৫. এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : পাগল পথিক। পত্রিকা : মোসলেম ভারত, ভাদ্র-১৩২৮ সংখ্যা, রাগ : মেঘ-ছায়ানট, তাল : দাদ্‌রা। রচনাস্থান ও কাল : কুমিল্লা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩২৮।

১৬. বল নাহি ভয়, নাহি ভয় ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : অভয় মন্ত্র, রচনাকাল : জুন-জুলাই ১৯২২[শিরোভাগে গান নির্দেশিত]। রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-২৭৮৮১, রেকর্ড প্রকাশকাল : আগস্ট-১৯৪৮, শিল্পী : সত্য চৌধুরী, পরিচালনা : নিতাই ঘটক। স্বরলিপি-গ্রন্থ : সঙ্গীতাঞ্জলী, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা।

১৭. তোরা সব জয়ধ্বনি কর ঃ গ্রন্থ : ১. অগ্নিবীণা, শিরোনাম : প্রলয়োল্লাস ও ২. নজরুল গীতিকা। রাগমালা : মালকৌষ-ভৈরব-মেষ-বসন্ত-হিন্দোল-শ্রী- পঞ্চম-নটনারায়ণ। পত্রিকা : ১. প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ-১৩২৯ সংখ্যা, ২. বিজলী, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ সংখ্যা ও ৩. নারায়ণ, আষাঢ় ১৩২৯ সংখ্যা । রচনাস্থান ও কাল : কুমিল্লা, এপ্রিল ১৯২২। রেকর্ড নম্বর : কলম্বিয়া জিই-৭৫৪৮, রেকর্ড প্রকাশকাল : আগস্ট-১৯৪৯, শিল্পী : বাংলার সন্তানদল। মূল সুর এই রেকর্ডে পরিবর্তিত হয়েছে।

১৮. এসো বিদ্রোহী মিথ্যাসুদন ঃ এই গানটি সম্পর্কে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৯. টলমল টলমল পদভরে ঃ গ্রন্থ : ১. প্রলয় শিখা, শিরোনাম : সমর সঙ্গীত ও ২. নজরুল গীতিকা [মার্চের সুর]। নাটক : আলেয়া, নাট্যকার : নজরুল, মঞ্চ : নাট্যনিকেতন, উদ্বোধন : ১৯. ১২. ১৯৩১। যশলক্ষীর সেনাদলের গান। ১. রেকর্ড নম্বর : মেগাফোন জেএনজি-৭৮, রেকর্ড প্রকাশকাল : অক্টোবর-১৯৩৩, শিল্পী : মেগাফোন কোরাস্ পার্টি [জ্ঞান দত্ত ও অন্যান্য] ও ২. রেকর্ড নম্বর : এইচএমভি এন-৭১৫৫, রেকর্ড প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর-১৯৩৩, শিল্পী : ধীরেন দাস। স্বরলিপি-গ্রন্থ : নজরুল স্বরলিপি, ডিএম লাইব্রেরী, কলকাতা।

২০. শঙ্কা শূন্য লক্ষ কণ্ঠে ঃ গ্রন্থ : গানের মালা [মার্চ সংগীত]। রেকর্ড নম্বর : টুইন এফটি-২৯৬৭, রেকর্ড প্রকাশকাল : জানুয়ারী-১৯৩৪, শিল্পী : কমল দাশগুপ্ত। সুর : London philharmonic orchestra [রেকর্ড]। স্বরলিপি-গ্রন্থ : ১. নজরুল স্বরলিপি, একাদশ খন্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা ও ২. নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, দ্বাদশ খন্ড, ঢাকা।

২১. শিকল যাদের উঠিছে বাজিয়া ঃ গ্রন্থ : বিষের বাঁশী, শিরোনাম : বন্দনা গান, পত্রিকা : সাধনা, অগ্রহায়ণ-১৩২৮ সংখ্যা, শিরোনাম : বিজয় গান। রচনাস্থান : কান্দিরপাড়, কুমিল্লা।

তথ্য-নির্দেশ

১. নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৪৬।

২. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, সংগ্রহ ও সম্পদনা : রশিদুন্ নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর-২০০৬, পৃষ্ঠা-২৩।

৩. ব্যাঙ্গ কবিতা ও গানে স্বদেশিকতা সংস্কৃত, সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তকভান্ডার কলকাতা, ১৩৮৪,পৃষ্ঠা-৩।

৪. নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনা, রোকসানা হোসেন, অনুপম প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬৩।

৫. নজরুল প্রভাকর, নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, হসন্তিকা প্রকাশিকা, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা-৫৪।

৬. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩।

৭. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭২৮।

৮. বাংলাগানের স্বরূপ, বুদ্ধদেব রায়, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৫০।

৯. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৯৬।

১০. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭০৯।

১১. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭১০।

১২. নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ, প্রবন্ধ : কাজী নজরুল ইসলাম, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-৪৮৩।

১৩. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮৫।

১৪. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩২।

১৫. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭০২।

১৬. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩৫।

১৭. নজরুল সঙ্গীত সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮৪।

১৮. নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি-১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৩২।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

নজরুলের স্বদেশ চেতনামূলক গানের তালিকা

১. আজ না চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে।
ঐ কংস কারার দ্বার ঠেলে ॥

২. আজ ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষান-ভার।
আর্ত্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব, কে করে মুশকিল্ আসান তার ॥

৩. আজ ভারতের নব আগমনী জাগিয়া উঠেছে মহাশ্মশান।

৪. আজি রক্ত নিশি-ভোরে একি এ শুনি ওরে।

৫. আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈঃ-বরাভয়।
এ যে আনন্দ-বন্ধন ক্রন্দন নয় ॥

৬. আমরা নীচে পড়ে রইব না আর শোন্ রে ও-ভাই জেলে।

৭. আমাদের জমির মাটি ঘরের বেটি সমান, রে ভাই!

৮. আমার দেশে মাটি ও ভাই, খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি।

৯. শ্যামলা বরণ বাঙলা মায়ের রূপ দেখে যা আয় রে আয়।

১০. আমার সোনার হিন্দুস্থান!
দেশ-নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ ॥

১১. আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান।
মম চরণের তলে, মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান ॥

১২. আমি মহাভারতী শক্তিনারী।
আমি কৃশ-তনু-অসিলতা, স্বাহা-আমি-তেজ তরবারি ॥

১৩. আসে রে ঐ আসে ভারত-আকাশে আশা-অরুণ রবি।

১৪. উদার ভারত! সকল মানবে দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবণী ॥

১৬. একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ সিন্দুর পারে,
নিশীথ-অন্ধকারে।

১৭. একে একে সব মেরেছিস জাতটা শুধু ছিল বাকী।
টিকি ধরে টানিস তোরা, তারেও এবার মারবি নাকি ॥

১৮. এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মার আঙ্গিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায় ॥

১৯. এ দেশ কার? তোর নহে আর।
হে মূঢ় সন্তান! ভারত-মাতার ॥

২০. এই ভারতে নাই যাহা তা' ভূ-ভারতে নাই।
মানুষ যাহা চায় স্বর্গে গিয়ে, আমরা হেথায় পাই ॥

২১. এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥

২২. এস এস এস ওগো মরণ!
এই মরণ- ভীতু মানুষ-মেষের ভয় কর গো হরণ ॥

২৩. এস অষ্টমী-পূর্নচন্দ্র, এস পূর্ণিমা-পূর্ণচাঁদ!
ভেদ করি' পুনঃবন্ধ কারার অন্ধকারের পাষাণ ফাঁদ ॥

২৪. এসো বিদ্রোহী মিথ্যা-সুদন আত্ম শক্তি-বুদ্ধ বীর।
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপান, বিজলী ঝলক ন্যায় অসির্ ॥

২৫. এই বেলা নে ঘর ছেয়ে।
এই দেশটা ভীষণ মূর্খ, এবার ঘুচাবো দেশের দুঃখ ॥

২৬. এস মা ভারতজননী আবার জগৎ-তারিনী সাজে।

২৭. এস যুগ সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়।
এ চির-সুন্দর অভেদ অসংশয় ॥

Dhaka University Institutional Repository

২৮. ঐ অভ্রভেদী তোমার ধ্বজা উড়লে আকাশ-পথে।

২৯. ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভুতে।
আজ নাচ্ বুঢটি নাচায় বাবা উঠ্তে বস্তে শুতে ॥

৩০. ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!
তোদের কোন্ ভায়ের আজ বিদায়-ব্যাথায় নয়ন ছল-ছল ॥

৩১. ওঠ রে চাষী, জগদ্বাসী, ধর কষে লাঙ্গল।
আমরা মরতে আছি- ভাল করেই মরব এবার চল ॥

৩২. ওরে আজ ভারতের নব যাত্রাপথের।

৩৩. ওরে ধ্বংশ পথের যাত্রী-দল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল ॥

৩৪. ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।
দুলাও মোদের রক্ত -পতাকা, ভরিয়া বাতাস, জুড়ি' বিমান ॥

৩৫. কল কল্লোলে ত্রিংশ-কোটি কণ্ঠে উঠেছে গান।
জয় আয্যাবর্ত্ত, জয়ভারত, জয় হিন্দুস্থান ॥

৩৬. কারা পাষান ভেদি' জাগো নারায়ন!
কাঁদিছে বেদীতলে আর্ত্ত জনগন ॥

৩৭. কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙ্গে ফেল্, কর রে লোপাট।

৩৮. কালের শঙ্খে বাজিয়ে আজও তোমারই মহিমা, ভারতবর্ষ।
প্রণতি জানায়ে বিশ্বভুবন শিখিছে আজিও তব আদর্শ ॥

৩৯. কি দেখিতে এসে কি দেখিনু শেষে/রিপোর্ট লেখেন সায়মন
হুটোপুটি করে ছুটোছুটি করে/বুড়োবুড় কাজে নাই মন ॥

৪০. খূশী লয়ে খোশরোজের আর খেয়ালী খোশ নসীব।
জ্বাল দেওয়ালী শবে রাতের জ্বালরে তাজা প্রাণ প্রদীপ ॥

৪১. গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা কাবেরী যমুনা ওই।
বহিয়া চলেছে আগের মতন কইরে আগের মানুষ কই ॥

Dhaka University Institutional Repository

৪২. গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ-দুনিয়ায়।
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরীপরী লাজপায় ॥

৪৩. ঘন-ঘোর-মেঘ-ঘেরা দূর্দ্দিনে ঘণশ্যাম ভূ-ভারত চাহিছে তোমায়।

৪৪. ঘোর-ঘোর্ রে ঘোর্ রে আমার সাধের চরকা ঘোর।
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর ॥

৪৫. চল্ রে চপল তরুনদল বাঁধন হারা।
চল্ অমর সমরে চল্ ভাঙি' কারা ॥

৪৬. চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা, চাঁদের চেয়েও জ্যোতি।
তুমি দেখাইলে মহিমান্বিতা নারী কি শক্তিমতী ॥

৪৭. চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শতকোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক। ঐক্যের জয় হোক্। সাম্যের জয় হোক ॥

৪৮. জগতে আজিকে যারা আগে চলে ভয়-হারা।
ডেকে যায় আজি তারা, চলরে সমুখে চল ॥

৪৯. জননী! জননী!" আবার জাগো শুভ্র শারদ প্রাতে।
আঁখি তোল অনসিত অনাহত মহিমাতে ॥

৫০. জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা ॥

৫১. জবা-কুসুম-সঙ্কাশ রাঙা অরুন রবি।
তোমরা উঠিছ; না-আসা-দিনের তোমরা কবি ॥

৫২. জয় ভারতী, শ্বেত শতদল বাসিনী।
বিষ্ণু-শরণ-চরন আদি বাণী ॥

৫৩. জাগে না সে জোস লয়ে আর মুসলমান।
করিল জয় যে তেজ লয়ে দুনিয়া জাহান ॥

৫৪. জাগো জাগো জাগো হে দেশ-প্রিয়!
ভারত চাহে তোমায় হে বীর-বরণীয় ॥

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী জাগো জাগো।
ঐ পোহাল তিমির রাত্রি! জাগো জাগো ॥

৫৬. জাগো রে তরুণ দল!
উৎসারিত ঝর্ণাধারার প্রায় জাগো প্রাণ চঞ্চল ॥

৫৭. জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী, কাঁদে ধরা দুঃখ- জরজর।

৫৮. ঐ নন্দন নন্দিনী দুহিতা, চির আনন্দিতা।
যেন প্রথম কবির প্রথম লেখা কবিতা ॥

৫৯. জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেল্‌ছ জুয়া।
ছু'লেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া ॥

৬০. ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান, ঘন বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে, সাজো সাজো রণ সাজে ॥

৬১. তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে, তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমার এ গান তোমারই ধ্যান, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥

৬২. ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ডাকে তোরে।
ভুলে আছিস্ দেশ জননী কেমন ক'রে ॥

৬৩. থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেশে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরন জয় শ্রীচরণ ভরসা ॥

৬৪. দড়া দড়ির লাগবে গিঁঠ, গোল-টেবিলের বৈঠকে।
ঠোকর মারে লোহায় ইট, এ ঠকে কি ঐ ঠকে ॥

৬৫. দাদা বলত কিসের ভাবনা –হুঁ হুঁ।
ওদের আছে বন্দুক কামান আমাদের আছে নাদনা ॥

৬৬. দিকে দিকে পুনঃজ্বলিয়া উঠেছে দীন-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বেখবর তুইও উঠ্ জেগে তুইও তোর প্রানপ্রদীপ জ্বাল ॥

৬৭. দুরন্ত দুর্ম্মদ প্রাণ অফুরান।
গাহে আজি উদ্ধত গান ॥

Dhaka University Institutional Repository

৬৮. দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তা হাসিবে ধীরে ॥

৬৯. দুঃখ- সাগর মন্থন শেষ ভারতলক্ষ্মী আয় মা আয়।

৭০. দে গরুর গা ধুইয়ে- ষন্ডা মার্কা গিন্নি গন্ডাতিনেক আন্ডা বাচ্চা।

৭১. দে দোল্ দে দোল্।
জাগিয়াছে ভারত-সিন্ধু-তরঙ্গ কল-কল্লোল ॥

৭২. দেশ গৌড়-বিজয়ে দেবরাজ।
গগনে এলো বুঝি সময়-সাজ ॥

৭৩. 'দেশপ্রিয় নাই' শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি'।
আকাশে ললাট হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির-অভাগী ॥

৭৪. ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি ॥

৭৫. ধ্বংস কর এই কচুরী পানা!
এরা লতা নয় পরদেশী অসুর ছানা ॥

৭৬. নখ-দন্ত-বিহীন চাকরী অধীন, আমরা বাঙালি বাবু।
পায়ে গোদ, গায়ে ম্যালেরিয়া, বুকে কাশি লয়ে সদা কাবু ॥

৭৭. নতুন পথের যাত্রা-পথিক, চালাও অভিযান!
উচ্চ কণ্ঠে উচ্চা'র আজ- মানুষ মহীয়ান ॥

৭৮. নব-জীবনের নব-উত্থান, আজান ফুকারি' এস নকীব্।
জাগাও জড়! জাগাও জীব ॥

৭৯. নবীন আশা জাগ্‌ল যে রে আজ!
নতুন রঙয়ে রাঙা তোদের সাজ ॥

৮০. নমঃ নমঃ রাম খুঁটি !
তুমি গদিয়া বসেছ আমাদের ঘরে সাধ্য নাই যে উঠি ॥

৮১. নমঃ নমঃ নমোঃ বাঙলা দেশ মম, চির-মনোরম চির-মধুর।

Dhaka University Institutional Repository

৮২. নমো নমো নমঃ হিম গিরি সুতা, দেবতা-মানস-কন্যা।

৮৩. নাহি ভয় নাহি ভয়
দুঃখ-সাগর মন্থন শেষ,আসে মৃত্যুঞ্জয় ॥

৮৪. পদ্মা-মেঘনা-বুড়িগঙ্গা-বিধৌত পূর্ব দিগন্তে।
তরুণ-অরুণ-বীণা বাজে তিমির বিভাবরী অন্তে ॥

৮৫. পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে তোর, বিধির বিধান সত্য হোক!

৮৬. বগল বাজা দুলিয়ে মাজা, বসে কেন অম্‌নী রে।
ছেঁড়া পেলে লাগাও চাঁটি, মা হবেন আজ ডোমনি রে ॥

৮৭. বজ্র আলোকে মৃত্যুর সাথে হবে নব পরিচয়,
জয় জীবনের জয় ॥

৮৮. বদনা গাড়ুতে গলাগলি করে এর প্যাকেটের আসনাই।
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥

৮৯. বন্দি তোমার ফন্দি-কারার গম্ভী-মুক্ত বন্দী বন্দী-বীর।
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয়-বছরের জয় প্রাচীর ॥

৯০. বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা।
আনো অভয়ঙ্কর শুভ-বারতা ॥

৯১. বল, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
বল, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয় ॥

৯২. বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ, নবযুগ ঐ এলো ঐ।

৯৩. বসেছে শান্তি-বৈঠকে বাঘ, সিংহ, হাঙর, নেকড়ে।
বৈষ্ণব গরু, ছাগ মেষ এসে হরিবোল বলে দেখরে ॥

৯৪. বাঙলার 'শের' বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর, সহসা ও- পারে অন্তমান।

৯৫. বাঙলা মা তোর সোনার ক্ষেতে দেখা যায় কার আঁচলখানি।
কার রূপের আলোয় আকাশ-বাতাস, ভরে গেল শ্যাম-বনানী ॥

Dhaka University Institutional Repository

৯৬. বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও।
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জ্জয় মহা-আহবান তব, বাজাও ॥

৯৭. বাজিছে দামামা, বাধরে আমামা শির উচু করি মুসলমান।

৯৮. বাজে ওই বন্দনা-প্রভাতী, জাগে অরুণ ভাতি।
শ্রান্ত এ নিদ্রিত ভারতে জাগে নবীন জাতি ॥

৯৯. বিদায় রবির করুনিমায় অবিশ্বাসীর ভয়।
বিশ্বাসী! বল আস্‌বে আবার প্রভাত-রবির জয় ॥

১০০. বিশাল ভারত- চিত্ত-রঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ফিরে।
কান্ডারী হে, দেখাও দিশা অসীম অশ্রু সাগর নীরে ॥

১০১. বীরদল আগে চল্ কাঁপাইয়া পদভরে ধরণী টলমল।
যৌবন-সুন্দর চির-চঞ্চল ॥

১০২. ভাই হয়ে ভাই চিন্‌বি আবার গাইব কি আর এমন গান!
সেদিন দুয়ার ভেঙে আস্‌বে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান ॥

১০৩. ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায় তুলে নে না তারে কোলে।
মুছিয়ে দে তার নয়নের জল সে যে আপন মায়ের ছেলে ॥

১০৪. ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট মহাভারতের ধ্যান।
দেশ হারায়েছে- হারায়নি তা'র আত্মা, ভগবান ॥

১০৫. ভারত-লক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ- ভারতে।
ব্যাথায় মোদের চরণ ফেলে-অরুণ আশার সোনার রথে ॥

১০৬. ভারত শ্মশান হ'ল মা, তুই শ্মশানবাসিনী ব'লে।
জীবন্ত শব নিত্য মোরা, চিতাগ্নিতে মরি জ্বলে ॥

১০৭. ভারতের দুই নয়ম-তারা হিন্দু-মুসলমান।
দেশ জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান হিন্দু-মুসলমান ॥

১০৮. ভিক্ষা দাও ! ভিক্ষা দাও !
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী, সন্তান দ্বারে উপবাসী।

Dhaka University Institutional Repository

১০৯. ভুবনের নাথ! এ নব ভবনে তব আশীষ।
ঝরুক শ্রাবণ-বারিধারা সম অহর্নিশ ॥

১১০. ভূমিকম্পের প্রলয়-লীলায় সব হ'ল ছারখার।
ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আজ ভাই সম্বল নাহি আর ॥

১১১. ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী মুক্ত আলোকে জাগো।

১১২. মুসলিম আর হিন্দু মোরা দুই সহোদর ভাই।
এক বৃন্তে দুটী কুসুম এক ভারতে ঠাঁই ॥

১১৩. মাগো তোমার অসীম মাধুরী বিশ্বে পড়েছে ছড়ায়ে।

১১৪. মানবতাহীন ভারত শ্মশানে দাও মানবতা, হে পরমেশ।
কি হবে লইয়া মানবতাহীন ত্রিশ কোটি এই মানুষ মেষ ॥

১১৫. মৃতের দেশে নেমে এল মাতৃনামের গঙ্গাধারা।
আয় রে নেয়ে শুদ্ধ হবি অনুতাপে মলিন যারা ॥

১১৬. মোরা একই বৃন্তে দুটী কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥

১১৭. মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মতো সচ্ছল ॥

১১৮. মোরা মারের চোটে ভুত ভাগাবো, মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভরে মার খেয়েছি আর প্রানে না সয় ॥

১১৯. রাঙা পথের ভাঙন-ব্রতী অগ্রপথিক দল।
নাম্‌রে ধুলায়- বর্তমানের মর্ত্ত্যপানে চল্ ॥

১২০. লক্ষ্মী মাগো এস ঘরে।
সোনার ঝাঁপি লয়ে করে ॥

১২১. লক্ষ্মী মা তুই আয়গো উঠে সাগর জল-সিনান করি'।
হাতে ল'য়ে সোনার ঝাঁপি, সুধার পাত্রে সূধা ভরি' ॥

Dhaka University Institutional Repository

১২২. শঙ্কাশূন্য লক্ষকণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ।
পুণ্য-চিত্ত-মুত্যু-তীর্থ পথের যাত্রী কই ॥

১২৩. শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি।
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তারি ॥

১২৪. শুভ যাত্রার লগ্ন এসেছে কালের শঙ্ক বাজিছে ওই !
কে দেখাবে পথ, প্রদীপ তুলিয়া নিশীথ রাতের বন্ধু কই?

১২৫. এস শঙ্কর ক্রোধাগ্নি হে প্রলয়ঙ্কর।
রুদ্র ভৈরব! সৃষ্টি সংহর, সংহর ॥

১২৬. সঙ্খশরণ তীর্থযাত্রা-পথে এসো মোরা যাই।
সঙ্খ বাঁধিয়া চলিলে অভয় সে পথে মৃত্যু নাই ॥

১২৭. সালাম, সালাম, জামালউদ্দীন আফগানী তস্‌লীম।
এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য্য-পুরুষ মহামহিম ॥

১২৮. স্বদেশ আমার। জানি না তোমার শুধিব মা কবে ঋন।
দিনের পরে মা দিন চলে যায়, এল না সে শুভ দিন ॥

১২৯. স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী, তুই যেন রাজ রাজেশ্বরী।

১৩০. সেই আমাদের বাংলাদেশ। রাজরানী আজ ভিখারিণী।
কাঁদছে বনে লুটিয়ে কেশ ॥

১৩১. সোনার আলোর ঢেউ খেলে যায় মাঠের ঘাসে ঘাসে।
বাউল হাওয়ায় কানানানি মা বুঝি ঐ আসে ॥

১৩২. হাতে হাত দিয়ে আগে চল, হাতে নাই থাক হাতিয়ার।
জমায়েত হও, আপনি আসিবে শক্তি জুলফিকার ॥

১৩৩. হায় পলাশী !
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে কলঙ্ক- কালিমা রাশি, হায় পলাশী ॥

১৩৪. হিন্দু-মুসলমান দুটী ভাই ভারতের দুই আঁখি-তারা।

১৩৫. হে পার্থসারথী! বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ।
চিত্তের অবসাদ দুর কর কর দুর, ভয়-ভীত জনে কর হে নিঃশঙ্ক ॥

উপরে উল্লেখিত গানের মধ্যে অনেক গানের সুর বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গেছে কিন্তু গানগুলির কাব্যিক বিচারে নজরুল মানসে যে স্বদেশ চেতনার অভিব্যক্তি নিহিত ছিল- তা স্পষ্টতঃ লক্ষ্য করা যায়। সুরগত না হলেও কাব্যিক বিচারে গানগুলিতে নজরুলের এক অনন্য সৃজনশীলতা ও স্বদেশচেতনার নিগূঢ় ভাবমূর্তি অঙ্কিত হয়েছে। দেশমাতৃকার উদ্বুদ্ধকরণে এমন নির্দশন বিরল- এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। কারণ, তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক গোষ্টির ভিত একমাত্র নজরুলই কাঁপিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন- এ কথা ইতিহাসসিদ্ধ হয়ে আছে।

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম অবিসংবাদিতভাবে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞদের একজন। আর সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁর কীর্তি ও অর্জন তুলনারহিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। এর অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য ও গভীরতা। একদিকে তিনি যেমন অসংখ্য আত্মগত ভাবসঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে অবলীলাক্রমে সৃজন করেছেন গণ মানুষের জন্য উপযোগী বিপুল সংখ্যক দেশাত্মবোধক ও আদর্শকেন্দ্রিক সঙ্গীত। এই উভয় শ্রেণীর গানের সহজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানুষকে জাগ্রত করার, উদ্দীপিত করার অসামান্য ক্ষমতা।

গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, স্বদেশপ্রেমমূলক গানে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতিভাকে বহুমাত্রিকভাবে ব্যবহার করেছেন। এই শ্রেণীর গানে তিনি একদিকে যেমন শ্যামলীমায় ছাওয়া বাংলা মায়ের স্নিগ্ধ লাবনীমাখা ছবিটি এঁকেছেন নিখুঁত শৈল্পিক নিপুনতায়, অন্যদিকে দেশের পরাধীনতায় ক্ষুব্ধ ও বেদনাহত হয়ে দেশমুক্তির সংগ্রামে যোগ দিতে উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন স্বাধীনতাকামী দেশবাসীকে। অবশ্য শুধুমাত্র দেশের ভৌগলিক স্বাধীনতার কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, দেশের মানুষের মুক্তির কথাও বলেছেন সমধিক গুরুত্বের সঙ্গে। আর মানুষের সার্বিক মুক্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত প্রগতিশীল মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। একদিকে ভারতবর্ষের কথা প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত সকল মানব কল্যানকর তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহার ঘটিয়েছেন এবং অন্যদিকে তৎকালীন সর্বাধুনিক সমাজ-মুক্তির উদাহরনগুলোকে ব্যবহার করেছেন অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে। তিনি নির্দ্বিধায় ধর্মের মধ্যে নিহিত মঙ্গলময় উপাদানগুলোকেও সম্পৃক্ত করেছেন দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে ও দেশমুক্তির সংগ্রামকে বেগবান করতে।

উদ্দীপনামূলক গানের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যপকভাবে বিস্তৃত। এর মূল কারন হচ্ছে তার অতুলনীয় সমন্বয়বাদী চেতনা। তিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবীতে অগুনতি মত ও পথ রয়েছে এবং এর প্রায় সবগুলোর মধ্যেই বিধৃত রয়েছে কোন না কোন মঙ্গলময় উপাদান। অবারিত উদারতায় তিনি দুহাত ভরে গ্রহন করেছেন সে সব উপাদান এবং তা অত্যন্ত শিল্পিতভাবে ব্যবহার করেছেন মানুষকে উদ্দীপিত করতে।

গবেষনায় প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি হিন্দুপুরান, মুসলিম ঐতিহ্য, পেগান ঐতিহ্য, সমাজতান্ত্রিকতা প্রভৃতি উৎসকে অকৃপণভাবে ব্যবহার করেছেন। উদ্দীপনামূলক গানের ক্ষেত্রে তাঁর যে বিষয়টি সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তা হল দেশমাতৃকার পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে সকল উপলক্ষ্যে অভিন্ন তেজস্বিতা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে সঙ্গীত রচনা। উদাহরন স্বরূপ বলা যায়, অসহযোগ আন্দোলনের কথা। রাওলাট ও অন্যান্য আইনের কঠোরতম প্রয়োগ করে আন্দোলন দমনের ফলে মূলধারার কবি সাহিত্যিকেরা যখন প্রায় নিশ্চুপ, কাজী নজরুল ইসলাম তখন শুধুমাত্র পরম নির্ভয়ে অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে শুধুমাত্র সঙ্গীত রচনাই করেননি, বরং রাস্তায় নেমে আন্দোলনকারীদের সম্মুখভাবে অবস্থান নিয়ে সে গান পরিবেশন করে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশপ্রেম সঞ্জাত ও উদ্দীপনামূলক গানের পরিধি সকল সীমাবদ্ধতার গন্ডী পেরিয়ে বিশ্বমানবতার এবং আর্তমানবতার কল্যান লক্ষ্যে ধাবিত। ফলে উপর্যুক্ত শ্রেণীর গানগুলোর বৈচিত্র এক কথায় চমকপ্রদ। তাঁর অসাম্প্রদায়িক চৈতন্য তাঁর জীবন ও কর্মে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত ছিল এবং তিনি ছিলেন অদ্বৈত সত্ত্বা সম্পন্ন শিল্পী। ফলে স্বদেশপ্রেম ও উদ্দীপনামূলক গানগুলোতে সে মহান উদারতার স্নিগ্ধোজ্জল ছায়া পাঠক বা শ্রোতাকে অবধারিতভাবেই উদার ও কল্যান প্রবদ্ধ করে তোলে। আবার তাঁরই গান আমাদেরকে সকল সাম্প্রদায়িক ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুভয়হীন ভাবে যুদ্ধ করতে শেখায়। একথা বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে পৃথিবীতে খুব কম শিল্পকর্মই কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্মের মত করে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য মানুষকে প্রবুদ্ধ করে তোলে। সে কারনেই তাঁর স্বদেশপ্রেমের ও উদ্দীপনার গানগুলো একদিকে বেসামাল করে ফেলেছিল ঔপনিবেশিক বৃটিশ সরকারকে আর অন্যদিকে ত্রাস সঞ্চার করেছিল বলদর্পী অত্যাচারীর শিবিরে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর অসাম্প্রদায়িক, উদার মানবতাবাদী চৈতন্যের কারনেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সকল মত ও পথের মানুষকে একতাবদ্ধ হবে সকল মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দ্বৈরথে অবতীর্ণ হবার উদাত্ত আহবান জানানো।

কাজী নজরুল ইসলামের উদ্দীপনামূলক গানের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, যে কোন মঙ্গলময় লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিনি দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহনে একটি দূর্বার গণশক্তি গড়ে তুলতে চান। এক্ষেত্রে তাঁর কোন ভেদভাব কাজ করে না। এমন কি পুরুষ ও নারীর মধ্যেও তিনি কোন ধরনের ভেদাভেদে বিশ্বাস করেন না। তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ- 'সাম্যের গান গাই, আমার চক্ষে পুরুষ নারীর কোন ভেদাভেদ নাই' আজ প্রায় একশ বছর পর এ বিষয়টি মুগ্ধতা নিয়ে আলোচনা করা তেমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু যে সময়ে, যে পরিমন্ডলে তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন তা ভাবতে পারাও আজ বেশ কঠিন বিষয়। মনে রাখা প্রয়োজন, তখনো সমাজ যুদ্ধ করছে সহমরণ ও অবরোধ প্রথার মত মধ্যযুগীয় অভিশাপের বিরুদ্ধে। সেই প্রেক্ষাপটের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি নারী মুক্তির এমন গান গাইলেন যা পাশ্চাত্যের জন্যও ছিল স্বপ্নের ব্যাপার।

একদিকে নারীর পরিপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বললেন আর অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যে নারীর কল্যানী রূপটিকে পুরোপুরি সংরক্ষণ করলেন। বিষয়টি বিশদভাবে আলোচনা করার কারণ হচ্ছে এই যে, শুধু নারীর ক্ষেত্রে নয়, বরং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই যে, তিনি ঐতিহ্যের মহীরুহে নতুন পল্লবের সমাহার ঘটাচ্ছেন প্রকৃতির মতই সহজ, স্বাভাবিক ছন্দে। খুব সম্ভবত এ কারনেই তার দেশগান ও উদ্দীপনার গান এতটা ঋদ্ধ, গভীর, প্রেরণাদায়ক ও শক্তিমান।

কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী মনোভঙ্গির ছাপ সুস্পষ্টভাবে পড়েছে তার গানেও। এ অভিসন্দর্ভে আমি নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি যে, তাঁর সাম্যবাদী শ্রেণীর গানেই একই সঙ্গে কতটা আধুনিক ও ঐতিহ্যসংলগ্ন। তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে তখনই [অর্থাৎ ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সাল] তিনি রাশিয়ায় সংঘটিত সেপ্টেম্বর বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিকাশের অন্যান্য বিষয়গুলো সম্পর্কে শুধুমাত্র অবহিতই নন, অধ্যয়নশীলও বটে। যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি দেশে ফিরে এসে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি বিশাল ভূমিকা পালন করছেন, এমনকি কমিউনিষ্ট পার্টির আদিরূপটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাঁর স্বাক্ষরিত ইশতেহারে যেটি প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরই প্রকাশিত লাঙ্গল পত্রিকায়। সাম্যবাদের প্রতি তাঁর এই নিবেদিতপ্রাণ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সঙ্গীতেও। এ প্রসঙ্গে ১৯২৭ সালের ২১ এপ্রিল গণবাণী পত্রিকায় ছাপানো তার সুবিখ্যাত গান 'জাগো অনশন বন্দী' ও সমসাময়িক রচনা ' উড়াও, উড়াও, উড়াও লাল নিশান' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। গান দুইটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ সমর্থনের স্বাক্ষরবাহী।

কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী চৈতন্যকে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক ভাবনার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে তা হবে একটি বড় ধরনের ভুল। গবেষণার কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি যে, কাজী নজরুল ইসলামের সাম্যবাদ একটি ব্যপক বিষয়। একে সর্বব্যাপী যুক্তিবাদী ও সমন্বয়বাদী মানবতাবাদও বলা চলে। কেননা, মানবিক সুবিচারের আকাঙ্ক্ষাকে চরমতম সীমায় প্রসারিত ক'রে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নিজস্ব যে সাম্যবাদ প্রচার করেছেন তাতে পৃথিবীর প্রধান সকল সাম্যবাদী ধারণা ও তত্ত্বেরই সমাবেশ ঘটেছে। আর সে কারণেই আমরা দেখতে পাই কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের 'ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীত' গানটির ভাবালম্বনে লেখা গান যেমন তাঁর রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে সনাতন ধর্ম ও ইসলামী ঐতিহ্যে প্রোথিত সাম্যবাদী উপাদানের শিল্পরূপ। এক কথায় বলতে গেলে সাম্যবাদকেই কবি পৃথিবীর একমাত্র স্বাভাবিক এবং নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা ব'লে মনে করতেন এবং তাঁর এ মনোভঙ্গিরও প্রভাব তাঁর বেশ কিছু গানে পরিলক্ষিত হয়।

কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বাস করতেন শিল্পবোধ ও শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা মানুষের শ্রেষ্ঠতম আশ্রয় ও শক্তিগুলোর একটি। একই সঙ্গে তিনি এও বিশ্বাস করতেন যে, এই অতুল সম্পদ শুধুমাত্র বিনোদন বা আনন্দের জন্য ব্যবহৃত হওয়া মানুষের মর্যাদাবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির লক্ষ্যে এর ব্যবহারের পাশাপাশিই এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করা প্রয়োজন মানুষের আনন্দের জন্য। আর্ট বা শিল্পের

এই সংজ্ঞা শুধুমাত্র অভূতপূর্বই নয় বরং মানবজাতীর জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি দার্শনিক দিকদর্শনও রয়েছে এর মধ্যে। তাই এটিই স্বাভাবিক ছিল যে, তাঁর সঙ্গীতে এ বিশ্বাস ও দর্শনের পর্যাপ্ত প্রতিফলন ঘটবে। গবেষনাকালে আমার কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীতে স্বদেশপ্রেম, উদ্দীপনা ও সাম্যবাদের প্রভাব পর্যাপ্ত পরিমানে উপস্থিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাতকার

[এক]

সাক্ষাতদাতা ঃ বিশিষ্ট নজরুল সংগীতশিল্পী, স্বরলিপিকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় সুধীন দাশ

প্রশ্ন ঃ স্বদেশচেতনা অর্থ্যাৎ মানবপ্রেম, উদ্দীপনা, সাম্যবাদ নজরুলের এই ধারার গানগুলোর মধ্যে আপনাকে কোন্ গানগুলো বেশী আকর্ষণ করে ?

উত্তর ঃ স্বদেশচেতনার গান বলতে নজরুল রচিত যে সকল গান আছে, যা আমরা পাই এগুলো সব অনবদ্য গান। এই গানের তুলনা হয়না । গনজাগরনের গান, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের গান, শিকল ভাঙ্গার গান, মুজুরের গান, ছাদপেটার গান সবইতো স্বদেশকে নিয়েই রচিত। কাজেই কোন্ কোন্ গান আমাকে টানে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া মুশকিল। তারপরও ভালো লাগার তালিকা এত বিশাল যে বলে শেষ করা যাবে না। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার'- এর মত গান কি আর হয়? 'কারার ঐ লৌহ-কপাট, ভেঙ্গে ফেল কর্ রে লোপাট'- এগুলি অনবদ্য গান। এছাড়া নারীজাগরনী গান- 'জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা' ইত্যাদি একেকটি গান নজরুলের অসাধারন সৃষ্টি। নজরুলের শুধু স্বদেশচেতনা মূলক গানই নয়, এমন কোন বিষয় নেই যে সেই বিষয়ে নজরুলের সৃষ্ট গান নেই। যেমন ঐতিহাসিক গান- নুরজাহান, মমতাজ, জেবুন্নেসা, চাঁদসুলতানা এদের সম্বন্ধে নজরুলের যে অনবদ্য গান এতো তুলনাহীন। কাজেই নজরুলের সৃষ্ট সঙ্গীত ভান্ডারে স্বদেশচেতনার গান এক অবিস্মরনীয় সৃষ্টি।

প্রশ্ন ঃ কারাগার জীবনে নজরুলসৃষ্ট যে সকল গান আছে সেই সম্পর্কে কিছু বলুন ?

উত্তর ঃ ইংরেজদের অত্যাচার, জুলুম সহ্য করেও নজরুল তাঁর সাহিত্য ও সংগীত রচনার ক্ষেত্রে এতটুকুও পিছু হঠেননি। বরং জেল-জীবনে তিনি অসাধারণ কিছু গান রচনা ক'রে গেছেন। যেমন–

'কারার ঐ লৌহ-কপাট ভেঙ্গে ফেল্, কর্ রে লোপাট'

আবার

'এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল।

এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল' ॥

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের রচিত গান- 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে, তুমি ধন্য ধন্য হে' এই গানের প্যারোডি লিখেছেন জেলে ব'সে–

'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে

আমার এ গান তোমারই ধ্যান তুমি ধন্য ধন্য হে' ॥

কাজেই এই সমস্ত গান- যা নাকি নজরুল পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গার জন্য, জনগণকে জাগ্রত করবার জন্য রচনা করেছেন এবং তিনি তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত দিয়ে একাই লড়াই ক'রে গেছেন, সে সমস্ত সৃষ্টি নজরুলকে অসাধারণ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আর এই ক্ষেত্রে বলা চলে, তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। এরকম অনবদ্য সৃষ্টি নজরুল বলেই সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ এই অঙ্গের গানগুলো কি বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা সে রকমভাবে চর্চা করছে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর ঃ অবশ্যই কম চর্চা করছে বা কমগীত হচ্ছে। তুলনামূলক ভাবে নজরুলের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় এই অঙ্গের গান গুলো প্রচার প্রসার তথা চর্চা সকল কিছুই কম হচ্ছে। আমরা দেখি যে, কোন অনুষ্ঠান বা ঐ ধরনের কোন উপলক্ষ ছাড়া এই ধরনের গানগুলো গাওয়া তো হয়ই না, বিশেষ করে বেতার টেলিভিশনেও এই অঙ্গের গানগুলো তেমনভাবে গীত হয় না।

প্রশ্ন ঃ এই গানগুলো সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় ব'লে আপনি মনে করেন ?

উত্তর ঃ নজরুলের অন্যান্য গান যেভাবে সংগ্রহ করা হচ্ছে, ঠিক সেইভাবে এই ধরনের গানগুলোও সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একসময় নজরুলের গান যেভাবে বিকৃত হচ্ছিল সেই দিন যদি আমি একা প্রতিবাদী না হতাম, আজকে নজরুলের গান বা নজরুল সঙ্গীত খুঁজে পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ আছে কিন্তু এখন নজরুলের গান সুরক্ষিত। সরকার নজরুল ইন্সটিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান করেছেন। যাতে নজরুলের সমস্ত গান, কবিতা মোট কথা নজরুলের সৃষ্টি সংরক্ষন করে রাখা যায়। নজরুল ইন্সটিটিউট এর মাধ্যমে আমরা নজরুলের গান শুদ্ধ সুরে, শুদ্ধ বানীতে সংরক্ষন করার ব্যবস্থা করেছি এবং এখনো করছি। সামনেও করা হবে। তাই আমি আশাবাদী নজরুলের স্বদেশচেতনা মূলক গানগুলোও আস্তে আস্তে আরো সুসংবদ্ধ একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবে।

[দুই]

সাক্ষাতদাতা ঃ বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীতশিল্পী খালিদ হোসেন

প্রশ্ন ঃ তৎকালীন বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নজরুলের প্রতিবাদমূলক গানগুলি সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ঃ নজরুলের দেশবন্দনামূলক গানের কোন তুলনা নেই। তিনি বৃটিশবিরোধী গানের জন্য কারাবরণ করেছিলেন- একথা সবাই জানে। কিন্তু তার লেখনি কিন্তু থামেনি, তিনি একটার পর একটা লিখে গিয়েছেন

তার সংগ্রামী লেখনী দিয়ে একটার পর একটা গান ও কবিতা। এবং তার এই রচনা অক্ষয় হয়ে আছে বলে আমার ধারণা। দেশমাতৃকার জন্য তাঁর অবদানের কোন তুলনা নেই। স্বয়ং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুভাষচন্দ্র বসু এরা সকলেই তাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন এই সব গানের জন্য এবং জাতীয় কবি হিসাবে তারা তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। দেশপ্রেমমূলক গানও সে প্রচুর লিখেছেন এবং এই গানগুলো মানুষের মনে শিহরন জাগিয়েছিল এবং প্রেরণার কারণ হয়ে ছিল। এবং তার সেই সব গান আমাদেও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণ জুগিয়েছিল। সেই সময় তার সমসাময়িক অনেকেই এ ধরণের লিখা/লেখার চেষ্ঠা করেছিলেন কিন্তু তার মত এমন করে এত বেশী মানুষকে মুগ্ধ করা বা অনুপ্রাণিত করা আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি এর জন্য কারাবরণ করেছেন-সেটা আমি বলেছি আগেই এবং অনেকভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন কারাজীবনে। তারপর যেসব পত্রিকা বের করেছিলেন সেই পত্রিকাগুলোতে বৃটিশ বিরোধী কবিতা গান থাকবার কারনে তাকে কারাবরণ যেমন করতে হয়েছে এবং তার লেখা বাজেয়াপ্ত পর্যন্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ এই গানগুলির প্রচার প্রসার আরো বেশী হওয়া দরকার- এই বিষয়ে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ঃ প্রশ্ন হলো, সব কিছুরই একটি অবস্থান বিন্দু আছে। যে গান গুলো যে পরিবেশে যে প্রয়োজনে লেখা হয়েছিল সেদিন সেইগানগুলোর প্রয়োজনীয়তা যেমনটা ছিল আজ সেই রকম অবস্থা না থাকার কারনে সেই গানগুলোর প্রচার প্রসার হয়ত তেমনভাবে হচ্ছে না। তবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন বিভিন্ন সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করা যায় বা সঙ্গীত যে যে বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ আছে-সে সমস্ত জায়গায় অবশ্যই এই শ্রেণীর সঙ্গীত অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। তবে সমগ্র নজরুলকে জানতে গেলে বুঝতে গেলে অবশ্যই এই শ্রেণীর বা স্বদেশ চেতনামূলক গানগুলো শিখতে হবে, গাইতে হবে। আর যারা নজরুল সঙ্গীত শিক্ষার্থী অবশ্যই তাদের এই শ্রেণীর গানগুলো জানা প্রয়োজন এবং অবশ্যই গবেষনার মাধ্যমে গানগুলোকে সামনে আনার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু স্বভাবিকভাবে আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলোতে এই গানগুলো তেমনভাবে উঠে আসে না।

প্রশ্ন ঃ আমি এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখছি, এই বিষয়ের উপর লেখা তেমন একটা পাওয়া যায় না, আবার গানগুলির ক্ষেত্রেও বাণী আছে অথচ সুরের সন্ধান নেই। এই বিষয়ে যদি কিছু বলেন।

উত্তর ঃ সেই সব কারণ হচ্ছে এই গানগুলির সুর যা নজরুলের অনেক গানেরই সুর পাওয়া দুস্প্রাপ্য হয়ে গেছে। সেইগুলি চর্চা করতে গেলে আনুষ্ঠানিকভাবে চর্চা করতে হবে। সেই পরিবেশ বা পরিস্থিতি নেই যে একটা অনুষ্ঠানে বা কোন প্রতিযোগিতায় এরকম দুটি গান গেয়ে দেয়া হলো- সাধারণভাবে সেটা হয় না।

প্রশ্ন ঃ এই অঙ্গের গানগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার অভিমত কি ?

উত্তর ঃ নজরুলের গান পাওয়ার ক্ষেত্রে চিরকালই সমস্যা। কেননা তাঁর ক্ষেত্রে বলতে হবে তিনি চিরকালটাই উদাসীন ছিলেন তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথের যেমন সমস্ত গান গীত বিতানে রক্ষিত আছে স্বরলিপি সহ খন্ডে খন্ডে সবগানের সুর রক্ষিকত আছে। কেউ রবীন্দ্রনাথকে জানতে চাইলে তাঁর সৃষ্টিকে জানতে চাইলে সহজেই তা পাবে। কিন্তু নজরুলের ক্ষেত্রে তা নয়। তিনি একাধারে লিখে গিয়েছেন-কিন্তু সেই গুলোকে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত করে রাখবার ক্ষেত্রে তেমন কোন উদ্যোগ নেননি। তাঁর অসাবধানতার কারনেও তাঁর পুরো কর্ম সৃষ্টি আমরা খূজে পাই না। তবু বাংলাদেশ অনেক চেষ্ঠা করে তাঁর গানের স্বরলিপি সিডি আকারে নজরুল ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে সংরক্ষণ করার চেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং এজন্য বাংলাদেশ সরকার অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। নজরুল একাডেমী এই বিষয়ে অনেকটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন বা এখনো কাজ করে যাচ্ছেন। তবে এখন আর আঙ্গুরবাল, ইন্দুবালা, কমলাজুড়িয়া এদের রেকর্ড বাজারে পাওয়া য়ায় না। সেক্ষত্রে নজরুল ইনস্টিটিউট অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে।

[তিন]

সাক্ষাতদাতা ঃ বিশিষ্ট নজরুল-গবেষক ও নজরুল-জীবনীকার প্রফেসর এ্যামিরিটাস ড. রফিকুল ইসলাম

প্রশ্ন ঃ স্যার নজরুলের স্বদেশ চেতনামূলক গানের প্রচার-প্রসার কম হচ্ছে– এ বিষয়ে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ঃ এই গানগুলো বিশেষ সময়ের প্রয়োজনে রচিত হয়েছিল। সেই সময় তো এখন নেই এবং ইংরেজ আমলে স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে রচিত। এখন তো তারপর অনেক সময় কেটে গেছে। কতগুলো বিষয় আছে যে গুলো চিরন্তন। সেইসব বিষয়ের গান সবসময়ই প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু এই অঙ্গের গানের প্রচার প্রসার কম হচ্ছে বললে ভুল হবে। এটা বলা যায়, এই অঙ্গের বেশকিছু গান আছে, যেমন- 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' এই গানটি কিন্তু সর্বজন শ্রুত। এই গানটির আবেদন সর্বাত্মক এবং বহুল প্রচলিত একটি গান। এ রকম আরো অনেক গান আছে এই অঙ্গের যে গুলো মানুষের মুখে মুখে ফেরে। যেমন- 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি' বা 'এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী'।তবে আমার কাছে মনে হয় সময়ের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। একটি স্বাধীন দেশের প্রেক্ষাপটে এই গানগুলি হয়ত এখন তেমনভাবে প্রচার প্রসার পাচ্ছে না। তবে কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলো আমাদের তুলে ধরবার সময় এখন এবং এ বিষয় গুলো প্রচার প্রসার খুব বেশী প্রয়োজন। সে রকম বিষয় হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। আমি মনে করি এখন এ বিষয়ের উপর অনেক বেশী কাজ হওয়া প্রয়োজন এবং এই বিষয়ের উপর সৃষ্ট গানগুলো সামনে আনা উচিত। সময়ের সাথে সবকিছু নির্ভরশীল। একারনে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় রচিত গানগুলোর আবেদন এখন অনেকটাই কম।

প্রশ্ন ঃ স্যার, এই অঙ্গের গান গুলোর বাণী প্রায় ক্ষেত্রে পাওয়া যায় কিন্তু গানগুলোর সুর বা সুরের উৎস সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। এই বিষয়ে আপনার মতামত কি ?

উত্তর ঃ সুর নেই তা নয়। হয়ত রেকর্ড গুলো কলকাতায় পাওয়া যেতে পারে। কলকাতায় নজরুলের সৃষ্টি সংরক্ষণের উদ্যোগ সম্প্রতি নেয়া হয়েছে নজরুল তীর্থ সংগঠন থেকে। হয়ত এখন নজরুলের এই সকল না প্রাপ্ত সৃষ্টিগুলো আস্তে আস্তে আমাদের হাতে চলে আসবে। এক্ষেত্রে তোমার গবেষণায় প্রাপ্ত গানগুলোর সুর হয়ত চলে আসবে। কারণ, নজরুলের সমস্ত সৃষ্টি ছড়িয়ে আছে ওখানে। উনারা আন্তরিক হলে কবিকে জানা যাবে আরও বিশদভাবে।

প্রশ্ন ঃ স্যার, মা, মাটি ও দেশ নজরুলের গানে ব্যাপক অর্থে এসেছে। এ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

উত্তর ঃ নজরুলের আগে রবীন্দ্রনাথ, ডি এল রায়, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ, মুকুন্দ দাস সকলে দেশকে নিয়ে, মাটিকে নিয়ে ও মাকে নিয়ে গান লিখেছেন। কিন্তু সকলেই এ বিষয়টি উহ্য রেখে তাঁদের গান রচনা করেছেন। কেবলমাত্র নজরুলই শুধু এ বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করেছেন সরাসরি দৃঢ়তার সাথে। তাই নজরুলের এই অঙ্গের গানে সফলতা অনেক বেশী।

প্রশ্ন ঃ স্যার, আপনি মনে করছেন যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিষয়ক নজরুলের যে সৃষ্টি সে গুলো গানই হোক বা কবিতাই হোক, সে গুলোর প্রচার-প্রসার এই সময়ে অনেক বেশী প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে কি ভূমিকা নেয়া উচিত ?

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরাশক্তি যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। নজরুলের সময় যেটা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেটা এখন অন্যভাবে এসেছে। বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির আকারে। কাজেই ঐ ধরনের যে গানগুলো আছে, সেগুলো প্রাসঙ্গিক।এছাড়া মানুষের মধ্যে ভাতৃত্ববোধের অভাব, ধর্মীয়গোড়ামী, মানুষে-মানুষে হানাহানি, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি– এ বিষয়গুলো যাতে সমাজে খুববেশী নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে না পারে সেজন্য নজরুলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিমূলক সৃষ্টি বড় ভূমিকা রাখবে ব'লে আমি মনে করি। এ কারণেই নজরুলের এ ধরনের গানগুলোর প্রচার-প্রসার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

উত্তর ঃ তোমাকেও ধন্যবাদ এবং শুভ কামনা জানাচ্ছি যাতে তোমার গবেষণা কার্য সফল হয়।

Dhaka University Institutional Repository

[চার]

সাক্ষাতদাতা ঃ নজরুল-গবেষক, গ্রন্থকার, স্বরলিপিকার, কণ্ঠশিল্পী ও প্রশিক্ষক জনাব ইদ্‌রিস আলী

প্রশ্ন ঃ নজরুলের স্বদেশ চেতনামূলক গানগুলিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন ?

উত্তর ঃ কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি, আমাদের জাতীয় চেতনা ও মূল্যবোধের কবি। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে একমাত্র নজরুল ইসলামই ছিলেন সোচ্চার। ব্রিটিশ বেনিয়াদের ভিত কাঁপিয়ে তুলতে নজরুল ইসলাম বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গীতকে। তাঁর রচিত স্বদেশ চেতনাজাত জাগরণীমূলক, উদ্দীপনামূলক ও জাতীয় সঙ্গীতগুলি তার বলিষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের গানের মধ্যে যেমন আছে কাব্যিক ভাবব্যঞ্জনা, তেমনি আছে সুরের অবকাঠামো। তাঁর স্বদেশ চেতনামূলক গানের মধ্যে দেশের খেটে খাওয়া মানুষ তথা কুলি, মজুর, চাষী, কামার, কুমর, জেলে, মাঝি প্রভৃতি পর্যায়ের মানুষের কথা অতি প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আবার এ ধরনের গানের গায়কী অবকাঠামো নিষিক্ত হয়েছে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় সোচ্চার ভঙ্গিমায়। নজরুলের এ ধারার গানগুলির আবেদন শাশ্বত, সর্বকালের। তাই দেশমাতৃকার প্রতি মানুষের সহজাত ভালবাসা, ভক্তি ও কর্তব্যপরায়নতাকে উচ্চকিত ও উদ্ভাসিত করতে নজরুলের স্বদেশ চেতনামূলক গানের কোন বিকল্প নেই ব'লে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ঃ নজরুলের এ ধরনের গানগুলির প্রচার ও প্রসারে কি কি করণীয় আছে ব'লে আপনি মনে করেন ?

উত্তর ঃ নজরুল সমসাময়িককালে এ ধরনের গানের প্রয়োজন ছিল অতি তুঙ্গে। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি এ উপমহাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে সদা প্রবহমান ছিল প্রতিবাদের ঝড়। কবি-সাহিত্যিক তথা দেশের একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে নজরুলও ছিলেন সোচ্চার। ফলে সে সময় এ ধরনের গানের ছিল অসম্ভব চাহিদা। তারপরও আমি বলতে চাই, এ ধরনের গানের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা থাকে শাশ্বতকালব্যাপী। তাই নজরুলের এ ধরনের গানগুলির প্রচার-প্রসারে প্রথমতঃ গানগুলির সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। তবে সহজপ্রাপ্যতা এখন অনেকখানি তরল হয়েছে। বিশেষ ক'রে নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত আদি রেকর্ডের ৩২টি সিডি-র মধ্যে এ ধরনের অনেক গান বর্তমানে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের গানগুলি সাধারণতঃ দলীয়ভাবে গাওয়া হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় কোরাস্ গান। তাই যোগ্য প্রশিক্ষকের মাধ্যমে বিভিন্ন সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়তঃ সরকারী ও বেসরকারীভাবে দেশের জাতীয় অনুষ্ঠাগুলিতে বিভিন্ন সঙ্গীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন ইন্সটিটিউশনে বাধ্যতামূলক নিয়মিত পরিবেশনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা রাখতে হবে। চতুর্থতঃ দেশের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম তথা বেতার, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকাসহ বর্তমান আধুনিক

প্রযুক্তির ইন্টারনেটে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। পঞ্চমতঃ এ ধরনের গানের আদি রেকর্ড অনুসরণে আধুনিক যন্ত্রানুষঙ্গের সহযোগে নতুনভাবে সিডি প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

[পাঁচ]

সাক্ষাতদাতা ঃ বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীতশিল্পী ফেরদৌস আরা

প্রশ্ন ঃ নজরুলের গানে স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে আপনার অভিব্যক্তি কি ?

উত্তর ঃ বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছে ১৯৭১ সালে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে আমাদের আছে অনেক সৃষ্টিশীল ভান্ডার। সেই রকমই একটি ভান্ডার হচ্ছে একটি স্বাধীন দেশের সাংস্কৃতিক ভান্ডার। সেই সাংস্কৃতিক ভান্ডারকে নিয়ে আমরা বাঙ্গালীরা অনেক বেশী গর্ব অনুভব করি। কারণ, এই ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে আমাদের দেশের গুণী সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ, লেখক, শিল্পী, গবেষকগণ। যাঁদের কাছে বাঙ্গালী জাতি সবচেয়ে ঋণী, যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন সেই মানুষটি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি আমাদের সাংস্কৃতিক ভান্ডারকে করেছেন অনেক বেশী সমৃদ্ধ। তার সৃষ্টিশীলতার বিভিন্ন দিক আলোচনা করলে জানা যায় তাঁর সঙ্গীত ভান্ডারটি কত বেশী ঐশ্বর্য্যমন্ডিত। তিনি নিজেই তাই নিজের অভিভাষণে বলে গেছেন- 'আমি সাহিত্যে কতটুকু দিয়েছি বলতে পারবো না। তবে আমার সৃষ্টি 'সঙ্গীত সম্ভার' আমাকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করে তুলবে'।

আমরা সেই দিক থেকে বলতে পারি, কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের সঙ্গীতাঙ্গনকে শুধু ঐতিহ্যমন্ডিতই করেননি, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর লেখা গান, কবিতা স্বাধীনতাকামী জনগণকে উদ্দীপিত করেছে, সাহস যুগিয়েছে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শিখিয়েছে। তাঁর এই সৃষ্টি আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা রেখেছে। দেশকে পাওয়া, নারীর অধিকার পাওয়া, সর্বোপরি সামাজিক, ধর্মীয় সম্প্রীতির ক্ষেত্রে নজরুল সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি আমাদের গোটা দেশকে তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে পরাধীনতার শিকল থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য আমাদের রক্তে স্ফুলিংগ জাগিয়েছিলেন। এই চিন্তা চেতনার উদ্ভব ঘটেছে নজরুল সৃষ্ট যেসব গানগুলোতে, সেসব গানগুলোকে আমরা মোটামুটিভাবে দেশপর্যায়ের গান বলতে পারি।

তাঁর দেশ পর্যায়ের গান শুধু শিকল পরার গান নয়, শুধু মাটিকে নিয়ে নয়। সেখানে রয়েছে মা, মাটি ও মানুষ। মা এবং দেশ এই দুটোর মিশ্রণ ঘটিয়েছেন তিনি তাঁর দেশ পর্যায়ের গানে। আবার প্রকৃতি আলো, বাতাস, সবকিছু নিয়েই একজন অপূর্ব বাঙ্গালী ললনার সমস্তরূপের বর্ননা, দেশের বর্ণনার সাথে মিলিয়ে লিখে গেছেন 'তোর রূপে সই গাহন করে জুড়িয়ে গেল গা' । তাই তিনি তাঁর গানের মাধ্যমে শুধু মাত্র উদ্দীপনা জাগিয়েছেন তা নয়, উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আমাদের অধিকারের দিকটি তিনি তুলে ধরেছেন। যেমন লিখে

গেছেন- শিকল ভাঙার গান, তেমনি লিখে গেছেন 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর, ঐ নূতনের কেতন উড়ে কালবোশেখী ঝড়'। নতুন মানেই যৌবনের গান। যৌবন বলতে এখানে তিনি তরুন সমাজকে বুঝিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নতুনকে অর্থ্যাৎ তরুণদেরকে জাগ্রত করতে না পারলে একটা দেশের বা দেশের মানুষের উন্নতি সম্ভব নয়। তাইতো তরুনদেরকে তিনি তাঁর সৃষ্ট গান ও কবিতার মাধ্যমে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন। এই লক্ষ্যে তিনি অনেকগুলো গানও উপহার দিয়েছেন আমাদের তরুণ, ছাত্র, যুবাদের জন্য। কাজী নজরুলকে ইসলামকে বলা হয় বৈচিত্র্যময়তার প্রতীক। তিনি সমাজকে জাগ্রত করবার লক্ষ্যে সমাজের সমস্ত বিষয়ের উপরই নজর দিয়েছেন। তিনি সমাজ তথা মানুষকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন।

ইতিহাসের বিখ্যাত নারী চরিত্র নিয়েও তিনি গান রচনা করেছেন। যাতে ঐ সমস্ত মহিয়সী নারীদের উদাহরণ হিসাবে দেখে আমাদের নারী সমাজ জাগ্রত হতে পারে। এই সমস্ত নারীদের মধ্যে বিবি ফাতেমা, খাদিজা, রহিমা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শিরি, মমতাজ, লাইলী, নুরজাহান, চাঁদ সুলতানা ও আনারকলিকে নিয়েও তিনি গান রচনা করেছেন। তাঁর নারীজাগরনী মূলক গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গান 'জাগো নারী জাগো বহ্নি শিখা' এছাড়া বিবি ফাতেমা, খাদিজা, রহিমাকে নিয়ে রচনা করেছেন আরেক বিখ্যাত গান 'গুনে গড়িমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়'। তিনি নারীকে ঘরের মাঝে বন্দী করে রাখার, নারীকে আব্রুতে ঢেকে রাখবার, নারীর ক্ষমতায়নকে ছোট করে দেখবার মত মানসিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি পুরুষের পাশাপাশি নারীকে সমাজের চোখে একজন কর্তব্যপরায়ন মানুষ হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। নারীকে দূর্বল ভাবার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারতেন না। তাই বলা হয়- নারীর ক্ষমতায়নে, নারীর অধিকারে, নারী জাগরণে কবি নজরুল বিশ্বাসী ছিলেন। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে এসে নারীর অধিকারে সোচ্চার হতে শিখেছি। কিন্তু কাজী নজরুল এই স্বপ্ন আরো পঞ্চাশ বছর আগেই দেখে গেছেন।

এছাড়া কাজী নজরুল মুসলিম সম্প্রদায়কে জাগ্রত করবার গান যেমন লিখে গেছেন ঠিক তেমনি হিন্দু সম্প্রদায়ের দেব-দেবী নিয়ে, তাদের শক্তির মাহাত্ম নিয়ে অনেক গান রচনা করেছেন। সেখানে যেমন লিখেছেন শ্যামা সংগীত, তেমনি শিবসংগীত, তেমনি ভজন কীর্তন। তাই বলা যায়, কোন্ ক্ষেত্রে নজরুলের সৃষ্টির হাত প্রসারিত হয়নি? এর উত্তরে বলতে হবে, নজরুল ইসলামের গানে সমস্ত বিষয়ই ফুটে উঠেছে। আর নজরুলের কাছে সবচেয়ে বড় ছিল মানুষ। তাইতো তিনি বলে গেছেন, 'মানুষের চেয়ে নাহি কিছু মহিয়ান'। তিনি শুধুমাত্র মানুষকে মানুষ হিসাবেই চিন্তা করেছেন। তাঁর কাছে ধর্ম কখনোই কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি মার্চের তালে গানও(রণসঙ্গীত) রচনা ক'রে গেছেন। 'চল্ চল্ চল্ উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল' অথবা 'টলমল টলমল পদভরে বীরদল চলে সমরে'- তাঁর রচিত এই সমস্ত গানও আমাদের সঙ্গীত জগতকে অনেক সমৃদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন ঃ নজরুলের স্বদেশ চেতনামূলক গানগুলি আপনাকে কতখানি আকর্ষণ করে ?

উত্তর ঃ আসলে এর উত্তরে বলতে হবে, আমরা যারা নজরুলের গান করি তাদের কাছে নজরুলের সকল সৃষ্টিই অসাধারণ। যখন যে গানটি গাওয়া হয়, তখন সেই গানটিকে একটি সন্তানের মত মনে হয়। নজরুলের গানকে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করা মুশকিল। তার সমস্ত গানের মধ্যেই একটি বক্তব্য আছে। লয় তালের ব্যাপার আছে। মোট কথা বৈচিত্র্যময়তায় ভরা। তাই বলবো নজরুলের গানে আলাদা বিষয় বলে কিছু নেই। সব গানই মা, মাটি, মানুষকে নিয়ে এবং সকল সৃষ্টিই অসাধারণ।

প্রশ্ন ঃ নজরুলের একজন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী হিসাবে আপনি এই গানগুলির প্রচার-প্রসারে কী ভূমিকা পালন করবেন ?

উত্তর ঃ অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো এবং কিছু কাজ আমি শুরুও করে দিয়েছি। জানিনা কতটা করতে পারবো। তবে চেষ্টা করবো। ইতিমধ্যে নজরুলের সমস্ত গানগুলোকে ধারাবাহিকভাবে রেকর্ড করে মানুষের মাঝে পৌছে দেয়ার একটি বৃহৎ উদ্যোগ আমি নিয়েছি। আশাকরি ধারাবাহিকভাবে নজরুলের উদ্দীপনা, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, দেশবন্দনা মূলক গানগুলোও চলে আসবে। এর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। কাজী নজরুলের ৪০০০ এর বেশী গান পাওয়া যায় আমরা জানি কিন্তু আমরা সুর সমেত হয়তো এতগুলো গান পাচ্ছি না। তবে বানী অবশ্যই পাওয়া যায়। ইমপ্রেস অডিও ভিশনের তত্বাবধানে একটি কাজ শুরু করেছি। সেখানে "নজরুল সঙ্গীত সংগ্রাহ" নামে প্রথম খন্ডটি বেরিয়ে গেছে এই ২০১৪ এর মে মাসে। এই কাজটি অবিরাম চলবে। নজরুলের যত গান আছে এগুলোকে উদ্ধারের জন্য আমি গবেষনারত আছি। হাজার কণ্ঠে এই গানগুলোকে আমি প্রকাশের চেষ্টা করবো। পর্যায়ক্রমে এই আলোচ্যধারার চলে আসবে। আমি মনে করি, আমাদের যে নতুন প্রজন্ম আসছে তাদের কণ্ঠ শৈলী ভারী সুন্দর। তারা নিষ্ঠার সাথে চর্চা করবে, গবেষণা করবে-এটা তাদের কাছে আমার চাওয়া। তাদের জন্য আমি যতটুকু পারি সাহায্য সহযোগিতা করে যেতে চাই। কারন তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের চর্চার মাঝেই নজরুল আরও পরিপূর্ণভাবে উঠে আসবে। আমরাতো চিরকাল থাকবো না। শুধু পথ নির্দেশক হিসাবে তাদের আলোর দিশা দেখিয়ে যাব। এভাবে একটা সময় এসে আমরা সম্পূর্ন নজরুলকে পরিপূর্নভাবে পেয়ে যাবো। তবে আমি সবসময় আমার জায়গা থেকে চেষ্টা করবো নজরুলকে নিয়ে কিছু করবার। এই চেষ্টা আমার আমরন অব্যাহত থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

[ছয়]

সাক্ষাতদাতা ঃ কবি পরিবারের সদস্য, কবি-নাতনী, বিশিষ্ট নজরুল সংগীতশিল্পী খিলখিল কাজী

প্রশ্ন ঃ আপনি তো কবির নাতনী, আপনার কাছে কবির সব সৃষ্টিই অতুলনীয়। তবুও জানতে চাই, কবির স্বদেশ চেতনামূলক গানগুলিকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন ?

উত্তর ঃ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার দ্বার প্রান্তে নেয়ার জন্য, ভারতবর্ষের জনগণের জন্য সংগ্রামী-বিপ্লবী ও শৃঙ্খল মুক্তির মাধ্যম হিসাবে কাজ করেছে কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশ-চেতনামূলক গান। এ গানগুলি ভারত বর্ষের ঘুমন্ত জাতিকে অধিকার সচেতন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন-এই অঙ্গের গানগুলির প্রচার ও প্রসার কম হচ্ছে বা কম গাওয়া হচ্ছে ?

উত্তর ঃ হাঁ, বর্তমান সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার তুলনায় নজরুল ইসলামের স্বদেশ-চেতনামূলক গানগুলির প্রচার ও প্রসার তুলনামূলক কম হচ্ছে। জাতির জীবনে সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস-বিশৃঙ্খলা ও মানবিকতার বিপর্যয় রোধে নজরুলের স্বদেশ চেতনামূলক গান আরও বেশী প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

বাণী বিশ্লেষণকৃত নজরুল-সঙ্গীত

১.	আমাদের জমির মাটি	৬০
২.	আমি বিধির বিধান ভাঙ্গিয়াছি আমি এমন শক্তিমান	৬১
৩.	আমি মহাভারতী শক্তি নারী	৬৫
৪.	আসে রে ঐ ভারত আকাশে আশা অরুণ রবি	৬০
৫.	একি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী	৫৩
৬.	এসো অষ্টমী পূর্ণচাঁদ এসো	৬১
৭.	এসো বিদ্রোহী মিথ্যা সুখ	৬১
৮.	এসো যুগ সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়	৬১
৯.	ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি, আমার দেশের মাটি	৫৪
১০.	ওরে আজ ভারতের নব যাত্রা	৬২
১১.	কারা পাষাণ ভেদি' জাগো	৬২
১২.	কোন্ অতীতের আঁধার ভেদিয়া	৬৬
১৩.	গঙ্গা-সিন্ধু-নর্মদা-কাবেরী-যমুনা ঐ	৫৪
১৪.	গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়	৬৬
১৫.	চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা	৬৫
১৬.	জাগিলে পারুল কি গো 'সাত ভাই চম্পা' ডাকে	৬৬
১৭.	জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী	৬২
১৮.	দেশপ্রিয় নাই শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি'	৬২
১৯.	নবীন আশা জাগলো রে আজ	৬৩
২০.	নমঃ নমঃ নমো বাংলাদেশ মম	৫৩
২১.	নাহি ভয় নাহি ভয়	৬৩
২২.	পদ্মা মেঘনা বুড়িগঙ্গা	৬৩
২৩.	বিশাল ভারত চিত্তরঞ্জন	৬৪
২৪.	ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট	৬৪
২৫.	মৃতের দেশে নেমে এলো মাতৃনামের গঙ্গা ধারা	৬৪
২৬.	মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো মন্ত্র দিয়ে নয়	৬৪
২৭.	যেথা দেবী শক্তি নারী অপমান সহে	৬৬
২৮.	শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা আয় রে আয়	৫২
২৯.	হে পার্থ সারথী বাজাও	৬৪

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. **কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃজন ঃ** রফিকুল ইসলাম, নজরুল ইনস্টিটিউট, ফেব্রুয়ারী-২০১২।

২. **কাজী নজরুলের গান ঃ** নারায়ণ চৌধুরী, মুক্তধারা, ঢাকা, প্রকাশকাল : ১৯৮৬।

৩. **কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা**, মুজফ্ফর আহমদ, মুক্তধারা, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৫।

৪. **জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম ঃ** কল্পতরু সেনগুপ্ত, প্রকাশকাল : জানুয়ারী-১৯৯২।

৫. ধূমকেতু, ১৩ অক্টোবর, ১৯২২ সংখ্যা।

৬. **নজরুল ইসলাম কিশোর জীবনী ঃ** হায়াদ মামুদ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা।

৭. **নজরুল ইসলাম সম্পাদক-সাংবাদিক এবং পত্র পত্রিকায় ঃ** ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক : অনুরূপ কানুনগো, দম্‌দম্‌, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : জুন-১৯৯৯।

৮. **নজরুল কাব্য সমীক্ষা ঃ** আতাউর রহমান, শুভ্রা প্রকাশনী, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৮, ঢাকা।

৯. **নজরুল গীতি–অখন্ড ঃ** সম্পাদনা : আব্দুল আজীজ আল-আমান, পরিমার্জিত সম্পাদক : ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।

১০. **নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ ঃ** করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পূনর্মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারী-১৯৯৬।

১১. **নজরুল-চরিতমানস ঃ** ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল-২০০৭।

১২. **নজরুল সঙ্গীত সমগ্র ঃ** সংগ্রহ ও সম্পাদনা : রশিদুন্ নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, অক্টোবর-২০০৬।

১৩. **নজরুলের জীবনবোধ ও চিন্তাধারা ঃ** তাহা ইয়াসিন, নজরুল ইন্সটিটিউট, মে-২০১৩।

১৪. **নজরুল জীবনী ঃ** অরুণ কুমার বসু, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কাজী নজরুল ইসলামের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী-২০০০।

১৫. **নজরুল জীবনচরিত ঃ** ড. মিলন দত্ত, প্রসাদ লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭৬।

১৬. **নজরুল জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ ঃ** রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, মে-২০০০।

১৭. **নজরুল প্রভাকর ঃ** নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যয়, হসন্তিকা প্রকাশিকা, কলকাতা, ১৯৮৭।

১৮. **নজরুল রচনাবলী ঃ** প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, নতুন সংস্করণ, মে-১৯৯৩।

১৯. **নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা ঃ** ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রথম সংস্করণ, ২৫ মে-২০০৯, ঢাকা।

২০. **নজরুল সঙ্গীতে স্বদেশচেতনা ঃ** রোকসানা হোসেন, অনুপম প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী-২০০৯, ঢাকা।

২১. **নজরুল সঙ্গীত অভিধান ঃ** আবদুস সাত্তার, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢকা, প্রকাশকাল : ২৫ মে ১৯৯৩।

২২. **নজরুল রচনাবলী ঃ** দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১।

২৩. **নারী ঃ** ড. হুমায়ুন আজাদ, আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, অষ্টাদশ মুদ্রণ, ২০১১, ঢাকা।

২৪. **বাংলা সাহিত্যে নজরুল ঃ** আজহারউদ্দীন খান, সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, এপ্রিল-১৯৯৭।

২৫. **বাংলাগানের স্বরূপ ঃ** বুদ্ধদেব রায়, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯০।

২৬. **লাঙল [পত্রিকা] ঃ** প্রথম বর্ষ, প্রথম খন্ড, বিশেষ সংখ্যা, বুধবার ১লা পৌষ, ১৩৩২,১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫।

২৭. **শত কথায় নজরুল ঃ** সম্পাদনায় : কল্যাণী কাজী, সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মহালয়া-১৪০৫।

২৮. **হাজার বছরে সম্পাদিত বাংলা গান ঃ** প্রভাতকুমার গোস্বামী সম্পাদিত, প্রকাশকাল : ১৩৭৬।